১ম খণ্ড সকলের জন্য পদার্থবিদ্যা

ল. লানদাউ আ. কিতাইগারোদস্কি
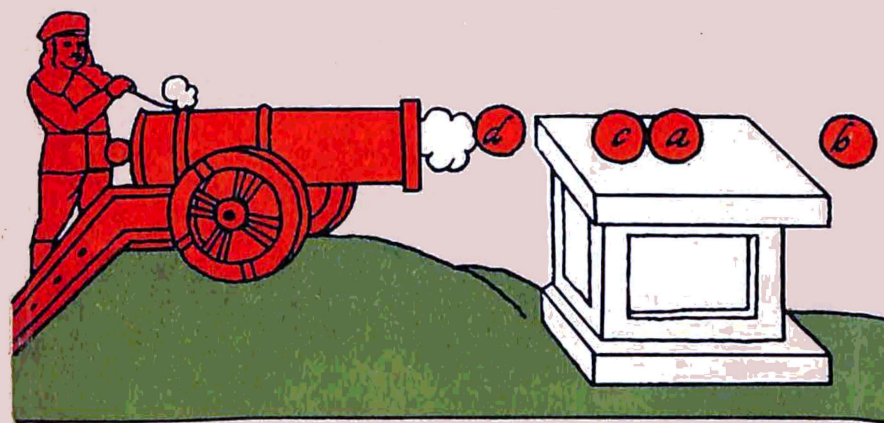
ভৌতবস্তু

ল. লানদাউ
আ. কিতাইগারোদস্কি

অনুবাদ : কে. পি. সরকার

মীর প্রকাশন মস্কো
মনীষা গ্রন্থালয় কলিকাতা

Физика для всех
Книга 1
Л. Д. Ландау
А. И. Китайгородский
Физические тела
Издательство „Наука"

На языке бенгали

চতুর্থ রাশিয়ান সংস্করণের ভূমিকা

অনেক বছর পরে আমি অসমাপ্ত একটি বই সম্পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। বইটি আমি ও ডাউ দুজনে মিলে লিখেছিলাম। মহান-হৃদয় ও প্রথিতযশা বিজ্ঞানী লেভ দাবিনোভিচ ল্যানডাউ তাঁর বন্ধুমহলে ডাউ নামেই পরিচিত। বইটির নাম **সকলের জন্য পদার্থবিদ্যা**।

বহু পাঠক বইটি শেষ না করায় চিঠি দিয়ে তিরস্কার করেছেন। কিন্তু বইটি ছিল আক্ষরিক অর্থে একটি যুক্তপ্রয়াস, তাই আমার একার পক্ষে শেষ করা কঠিন ছিল।

সে কারণে **সকলের জন্য পদার্থবিদ্যার** নতুন সংস্করণ বার করতে গিয়ে বইটিকে আমি চারটি ছোট খণ্ডে ভাগ করেছি। প্রতিটি খণ্ডই পাঠককে পদার্থের গঠনের অনুপুঙ্খতায় নিয়ে যাবে। সেইজন্য খণ্ড-গুলির নাম **ভৌতবস্তু, অণু, ইলেকট্রন** এবং **প্রোটন ও নিউক্লিয়াস** রাখা হয়েছে। এগুলিতে পদার্থ বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলিই বিধৃত। সম্ভবত **সকলের জন্য পদার্থবিদ্যার** ধারা অব্যাহত রেখে পরবর্তী খণ্ডসমূহে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আরও নানা ক্ষেত্রের মূল প্রশ্নগুলি আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রথম দুটি খণ্ডে বিষয়বস্তুর যৎসামান্যই পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু অনেক জায়গায় তথ্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্য দুটি খণ্ড আমারই লেখা।

বুঝতে পারছি, সতর্ক পাঠক পার্থক্যটি সহজেই ধরে ফেলবেন। কিন্তু উপস্থাপনার যে রীতি আমি ও ডাউ যুক্তভাবে অনুসরণ করেছিলাম, আমিও তা রক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছি। এটি, ঐতিহাসিক প্রণালীর পরিবর্তে অবরোহ প্রণালী ও তর্কশাস্ত্রসম্মত প্রণালীর অনুসরণ। আমরা এও অনুভব করেছিলাম যে প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা ব্যবহার করাই ভাল হবে এবং তার সঙ্গে থাকবে কিছু হিউমার (নির্দোষ হাস্যরস)। যদি পাঠক বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে চান তবে তাঁকে কিছু

কিছু জায়গা বারবার পড়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এবং ভাববার জন্য থামতে হবে।

মূল বইটির থেকে নতুন সংস্করণে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যাবে। যখন ডাউ আর আমি মূল বইটি লিখেছিলাম তখন পদার্থ বিজ্ঞানের এক জাতীয় প্রাথমিক পরিচিতি ঘটানোর দিকে আমাদের দৃষ্টি ছিল। এমন কি, আমরা ভেবেছিলাম, বইটি হয়তো স্কুল পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে-প্রতিযোগিতা করবে। পরিবর্তে, পাঠককুলের মতামত এবং শিক্ষক মহোদয়ের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল, পদার্থবিজ্ঞানকে যারা পেশা হিসাবে নিয়েছেন বা নিতে চান এমন শিক্ষক, প্রযুক্তিবিদ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই মূলত বইটির ব্যবহারকারী। কেউই এটিকে পাঠ্যপুস্তক বলে মনে করেননি। ভাবা হল, বিদ্যালয়ে যে জ্ঞানটুকু লাভ হয় তার পরিধি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এবং কোন কারণে পদার্থবিজ্ঞানের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এমন সব বিষয়ের উপর নানা প্রশ্নে আগ্রহ সঞ্চার করার প্রেরণাতেই বইটি লেখা হয়েছে।

তাই নতুন সংস্করণটি রচনা করতে গিয়ে আমি আমার পাঠককে পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত বলে ধরে নিয়েছি। ফলে বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা পেয়েছি এবং বিধি-বহির্ভূত লিখনশৈলী অবলম্বন করা যাবে বলে অনুভব করেছি।

ভৌতবস্তু-র আলোচ্য বিষয় যৎসামান্যই পরিবর্তন করা হয়েছে। **সকলের জন্য পদার্থবিদ্যা**-র পূর্ব সংস্করণের প্রায় অর্ধেকটা নিয়ে এই খণ্ডটি রচিত। নতুন সংস্করণের প্রথম খণ্ডটিতে যেহেতু পদার্থের গঠন বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাগে না এমন সব ঘটনার সন্নিবেশ করা হয়েছে, সে কারণে খণ্ডটিকে **ভৌতবস্তু** নাম দেওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য, **গতিবিদ্যা** (অর্থাৎ গতিবিষয়ক বিজ্ঞান) নামকরণ করা যেতে পারত। কারণ সাধারণত এরকমই করা হয়। দ্বিতীয় খণ্ড **অণু**তে তাপতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে এবং সেকথা বলতে গিয়ে অণু ও পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ গতি ছাড়া অনিবার্যভাবে অনেক গতির প্রসঙ্গ এসেছে। এই কারণে, এই খণ্ডটির **ভৌতবস্তু** নামটি সঙ্গততর নির্বাচন বলে আমার মনে হয়েছে।

ভৌতবস্তু-র অধিকাংশ বিষয়বস্তুই গতিসূত্র ও মহাকর্ষসূত্র সম্পর্কিত। এই সূত্রগুলি পদার্থবিজ্ঞান তথা সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলরূপে পরিগণিত হবে।

সেপ্টেম্বর ১৯৭৭

এ. আই. কিতাইগোরড্স্কী

সূচীপত্র

6. মহাকর্ষ

7. চাপ

1. প্রাথমিক ধারণা

সেণ্টিমিটার এবং সেকেণ্ড (The centimetre and the second)

দৈর্ঘ্য, সময় এবং বিভিন্ন বস্তুর ওজনের পরিমাপ সকলকেই করতে হয়। সে কারণে, এক সেণ্টিমিটার, এক সেকেণ্ড এবং এক গ্রাম বলতে কী বোঝায় তা সকলেই জানেন। পদার্থবিদের কাছে এই মাপজোকের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে—প্রায় প্রতিটি প্রাকৃতিক ঘটনার বিচার বিশ্লেষণে এই সব পরিমাপ অপরিহার্য। দূরত্ব, সময়-অবকাশ ও ভর যথা সম্ভব নিখুঁতভাবে পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। এগুলিকে পদার্থ বিজ্ঞানে প্রাথমিক ধারণা বলে।

পদার্থ বিজ্ঞানের আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে দুটি মিটার দণ্ডের মধ্যে মিটারের দশলক্ষ ভাগের এক ভাগ পার্থক্যকেও নিখুঁত ভাবে মাপা সম্ভব। সময় পার্থক্য এক সেকেণ্ডের লক্ষ ভাগের এক ভাগ হলেও তাকে বার করা অসম্ভব নয়। সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডের সাহায্যে পোস্তর একটি ক্ষুদ্র দানার ভর অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা যায়।

মাত্র কয়েক শ বছর আগে পরিমাপের কলাকৌশল বার হয়েছে। কিন্তু দৈর্ঘ্যের কতটুকু অংশ এবং বস্তুর কিরকম ভরকে একক হিসাবে গ্রহণ করা হবে সে ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছানোর ঘটনা তুলনামূলক-ভাবে সাম্প্রতিক।

সেণ্টিমিটার এবং সেকেণ্ড বলতে আমরা এখন যা বুঝি সেভাবে তাদের নির্বাচন করার কারণ কি? বস্তুত, এটা পরিষ্কার বোঝা যায়, আরও বড় মানের সেণ্টিমিটার ব্যবহার করলে কিছু ক্ষতি ছিল না।

পরিমাপের একক সুবিধাজনক হওয়া চাই—এর বেশী আর কিছু দরকার পড়ে না। হাতের নাগালে পরিমাপের একক থাকলেই ভালো হয় এবং সবচেয়ে সহজ হল হাতকেই একক হিসাবে ব্যবহার করা। প্রাচীনকালে তাই করা হত, মাপের নামগুলো শুনলে অন্তত সেকথাই মনে হবে। যেমন, প্রসারিত হাতের কনুই থেকে নখের ডগা পর্যন্ত দূরত্বকে 'এল' (ell) বা 'কিউবিট' (cubit) বলা হতো, এক 'ইঞ্চি' বলতে বুড়ো আঙুলের গোড়ার মাপকে বোঝানো হত।

পা-কেও মাপের কাজে ব্যবহার করা হত—সেখান থেকেই দৈর্ঘ্যের মাপের নামকরণ হয়েছে 'ফুট' (foot)।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অংশ বলে পরিমাপের এইসব এককের সুবিধা ছিল ঠিকই, কিন্তু অসুবিধার দিকগুলিও স্পষ্ট ঃ সকলেরই হাত পা-এর মাপে এত পার্থক্য যে ব্যক্তি বিশেষের হাত ও পা-এর দৈর্ঘ্যকে একক হিসাবে ব্যবহার করা চলে না; কারণ, এককের মধ্যে গরমিল থাকার কোন অবকাশ নেই।

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিমাপের এককের ব্যাপারে একমত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। দৈর্ঘ্য এবং ভরের প্রমাণ-মান কোন একটি বাজারে প্রথম ঠিক করা হল, পরে সেটা শহরে, ক্রমে শহর থেকে দেশে এবং অবশেষে সারা পৃথিবীতে চালু হল। প্রমাণ মান বলতে আদর্শ মানক বোঝায় ঃ একটি প্রমাণ স্কেল, একটি প্রমাণ বাটখারা। বিভিন্ন সরকার এই আদর্শ বা প্রমাণ মানকগুলি সযত্নে রক্ষা করে। সেকারণে, এই প্রমাণ মানকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অন্য স্কেল এবং বাটখারা তৈরী করার প্রয়োজন পড়ল।

1747 সালে জারশাসিত রাশিয়ায় সর্বপ্রথম ওজন এবং দৈর্ঘ্যের প্রাথমিক মাপ নির্দিষ্ট করা হয়। এগুলিকে পাউণ্ড এবং 'অর্সহিন' (orshin) বলত। উনবিংশ শতাব্দীতে পরিমাপ নির্ভুল হওয়ার প্রয়োজন বাড়ল এবং দেখা গেল তথাকথিত প্রমাণ মানকগুলি যথেষ্ট নিখুঁত নয়। 1893 থেকে 1898 সাল পর্যন্ত দিমিত্রি ইভানোভিচ মেণ্ডেলিভ (Dmitri Ivanovich Mendeleev)-এর নেতৃত্বে নিখুঁত আদর্শ মানক তৈরীর জটিল দায়িত্বপূর্ণ কাজ চলে। এই বিখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানীর কাছে যথাযথ আদর্শ মান প্রচলনের বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরই উদ্যোগে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ওজন ও অন্যান্য পরিমাপ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা (The Central Bureau of Weights and Measures) স্থাপিত হয়। এই সংস্থায় প্রমাণ মানকগুলি রাখা আছে এবং সেখান থেকে প্রয়োজন মত নকল করে নেওয়া যায়।

কিছু কিছু দূরত্ব বড় এককে এবং বাকী ছোট এককে প্রকাশ করা হয়। সত্যি কথা বলতে কী, মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদের দূরত্ব সেণ্টিমিটারে বা রেলগাড়ীর ভরকে গ্রামে প্রকাশ করার কথা ভাবাই যায় না। সেকারণে বড় এবং ছোট এককের সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের ব্যাপারে সকলেই একমত হলেন। প্রত্যেকেই জানেন, যে একক পদ্ধতি

আমরা ব্যবহার করে থাকি সেখানে বড় এককগুলি ছোট এককের 10, 100, 1000 ইত্যাদি বা সাধারণভাবে দশের ঘাত হিসাবে বড়। এই পদ্ধতি বেশ সুবিধাজনক। এতে সব ধরনের হিসাবনিকাশ সহজ হয়। কিন্তু এই সুবিধাদায়ক পদ্ধতি সব দেশে প্রচলিত নয়। মেট্রিক পদ্ধতির প্রত্যক্ষ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকায় মিটার, সেণ্টিমিটার, কিলোমিটার এবং গ্রাম, কিলোগ্রাম এখনও খুব কম ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। *

1790 সালে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিমাপ-পদ্ধতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ফরাসী এ্যাসেম্বলী (French Assembly) প্রখ্যাত পদার্থ ও গণিত-বিদদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করে। নানাধরনের প্রস্তাব বিচার বিবেচনার পর এই কমিশন পৃথিবীর মধ্যরেখার এক চতুর্থাংশকে এককোটী ভাগ করে তার এক ভাগকে দৈর্ঘ্যের একক হিসাবে গ্রহণ করে। এই এককের নাম দেয় মিটার (Metre)। 1799 সালে এই প্রমাণ মানটি গ্রহণ করা হয় এবং সরকারী রেকর্ড সংগ্রহশালায় (Archives of the Republic) নিরাপদে দলিলটি রাখা হয়।

অবশ্য, অচিরেই বোঝা গেল, প্রকৃতির বিষয়বস্তুকে পরিমাপের প্রতিরূপ বলে গ্রহণ করার মধ্যে যত নির্ভুল তাত্ত্বিক ধারণাই থাক না কেন, বাস্তবে যথাযথ প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে আরও নির্ভুলভাবে পরিমাপ করে দেখা গেল, প্রমাণ মান হিসাবে যে মিটার ব্যবহার করা হচ্ছে তা পৃথিবীর মধ্যরেখার চারকোটি ভাগের এক ভাগ থেকে প্রায় 0·08 মিলিমিটার কম। ফলে, পরিমাপের কলা কৌশলের উন্নতির সঙ্গে এই মিটারের প্রয়োজনীয় সংশোধন অপরিহার্য হয়ে পড়ল। পৃথিবীর মধ্যরেখার দৈর্ঘ্য থেকে পাওয়া মিটারের সংজ্ঞা যদি বজায় রাখতেই হয় তাহলে অন্য একটি মানকে প্রমাণ ধরে মাপজোক করতে হয় এবং তার পরে পৃথিবীর মধ্যরেখার নতুন করে মান বার করে তার সাপেক্ষে প্রাপ্ত দৈর্ঘ্যের পুনর্গণনা করা দরকার।

---

* ইংল্যাণ্ডে সরকারীভাবে নিম্নলিখিত পরিমাপগুলি গ্রহণ করা হয়ঃ নটিক্যাল মাইল (1852 মিটার), সাধারণ মাইল (1609 মিটার), ফুট (30·48 সে. মি.), এক ফুট 12 ইঞ্চির সমান, এক ইঞ্চি 2·54 সে. মির সমান, এক গজ 0·9144 মিটার। সুটের কাপড়ের পরিমাপ নির্দেশ করার জন্য এই একককে 'দর্জির মাপ' বলে।

অ্যাংলো-স্যাকসন দেশগুলিতে ভর পাউণ্ডে (454 গ্রাম) মাপা হয়। পাউণ্ডের ভগ্নাংশকে আউন্স (1/16 পাউণ্ড) এবং গ্রেণ (1/7000 পাউণ্ড) বলে। শেষোক্ত একক দুটি ওষুধ ওজনের কাজে ব্যবহার করা হয়।

একারণে 1870, 1872 এবং 1875 সালে আন্তর্জাতিক কংগ্রেস মিটারের প্রমাণ দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে অনেক আলাপ আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত 1799 সালে গৃহীত পৃথিবীর মধ্যরেখার চার কোটী ভাগের এক ভাগের পরিবর্তে অন্য একটি প্রমাণ মান গ্রহণ করেন। এই মানটি প্যারিসের কাছে সাভ্রে-তে ওজন ও অন্যান্য পরিমাপ সংক্রান্ত কার্যালয়ে রাখা আছে।

মিটারের সঙ্গে তার ভগ্নাংশগুলিও ঠিক হল ঃ এক সহস্রাংশ হল **মিলিমিটার** (millimetre), দশ লক্ষ ভাগের একভাগ হল **মাইক্রন** (micron) এবং সবচেয়ে বেশী যেটি আমরা ব্যবহার করি সেটি মিটারের একশ ভাগের এক ভাগ—**সেণ্টিমিটার** (centimetre)। এবারে **সেকেণ্ড** (second) এর কথায় আসা যাক। সেণ্টিমিটারের তুলনায় সেকেণ্ডের ধারণা অনেক পুরোনো। সময় পরিমাপের একক নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন মত পার্থক্য ঘটেনি। কারণটা সহজবোধ্য ঃ দিনরাতের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন ও সূর্যের চিরন্তন আবর্তনের মধ্যে সময়ের প্রাকৃতিক একক নির্বাচনের ইঙ্গিত রয়েছে। 'সূর্য দেখে সময় ঠিক কর' — কথাটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। সূর্য যখন মধ্যগগনে, সময়কে তখন মধ্যাহ্ন বলা হয়। খুঁটির ছায়া দেখে সূর্য কখন ঠিক তার সর্বোচ্চ বিন্দুতে আসে তা বার করা কঠিন নয়। একই ভাবে পরের দিন আবার এই মুহূর্তটি বার করা যায়। এই দুই অবস্থায় সময়ের ব্যবধানে একটি সৌরদিন। দিনের মাপ পাওয়া গেলে তাকে ঘণ্টা মিনিট এবং সেকেণ্ডে ভাগ করতে কতক্ষণই আর লাগে।

বছর এবং দিনের মত বড় এককগুলি প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া গেল। কিন্তু ঘণ্টা, মিনিট এবং সেকেণ্ডের একক মানুষের তৈরী।

দিনকে এইভাবে বিভাজন করার পদ্ধতি কিন্তু খুব প্রাচীন। ব্যাবিলনে বর্তমান দশমিক পদ্ধতির পরিবর্তে 'ষষ্টিক' পদ্ধতির প্রচলন ছিল। যেহেতু 60 কে 12 দিয়ে ভাগ করলে কোন অবশেষ থাকে না, ব্যাবিলনের লোকেরা দিনকে 12 টি সমান ভাগ করেছিল।

প্রাচীন ঈজিপ্টবাসীরা দিনকে 24 ঘণ্টায় ভাগ করার পদ্ধতি প্রবর্তন করে। মিনিট এবং সেকেণ্ডের ধারণা তারও পরবর্তী কালে এসেছে। 60 মিনিটে এক ঘণ্টা এবং 60 সেকেণ্ডে এক মিনিটের ব্যাপারটি সম্ভবত ব্যাবিলনের ষষ্টিক পদ্ধতির উত্তরদায় হিসাবে আসে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সূর্যঘড়ি, জলঘড়ি (বৃহদাকৃতি পাত্র থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়া দেখে সময় হিসাব করা হত) ইত্যাদি মারফত এবং কয়েক

ধরনের চতুর অথচ স্থূল কৌশলের সাহায্যে সময় দেখা হত। বলাবাহুল্য, সময়ের হিসাব সবক্ষেত্রে যথাযথ হত না।

আধুনিক সময় গণকের সাহায্যে নিশ্চিত জানা গেল, বছরের সব সময় সৌরদিনের স্থিতিকাল ঠিক একই থাকে না। একারণে, একটি বছরের গড় সৌরদিনকে সময়ের একক হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়। বছরের এই গড় সময় কালের চব্বিশ ভাগের এক ভাগকে আমরা এক ঘণ্টা বলে ধরি।

দিনকে সমান ভাগে ভাগ করে ঘণ্টা, মিনিট এবং সেকেণ্ডের একক বার করার সময় ধরে নেওয়া হয় পৃথিবী সমান বেগেই ঘুরছে। চন্দ্র-সূর্যের প্রভাবে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা পৃথিবীর ঘোরার বেগকে কমিয়ে দেয়। যদিও এই মাত্রা খুবই সামান্য, তবু এর প্রভাবে আমাদের সময়ের একক—দিন ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

পৃথিবীর ঘূর্ণন বেগের হ্রাস এতই ক্ষুদ্র পরিমাণ যে মাত্র সম্প্রতি-উদ্ভাবিত পারমাণবিক ঘড়ির সাহায্যে তা সরাসরি মাপা সম্ভব হয়েছে। এই ঘড়ি অতিমাত্রায় নির্ভুল এবং এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগও সঠিক মাপা যায়। এই পারমাণবিক ঘড়ির সাহায্যেই জানা গেল, 100 বছরে দিনের স্থিতিকালের পরিবর্তন মাত্র 1-2 মিলিসেকেণ্ড।

একটি আদর্শ মানের ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি, তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, সম্ভব হলে সেটুকুও রাখা উচিত নয়। কিভাবে তা দূর করা যেতে পারে সে বিষয়ে ১০ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।

ওজন এবং ভর (Weight and Mass)

পৃথিবী যে বল দ্বারা কোন বস্তুকে নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তাই বস্তুটির ওজন। স্প্রিং তুলাদণ্ডের সাহায্যে এই বল পরিমাপ করা যায়। বস্তুর ওজন যত বেশী হয় স্প্রিং-এর প্রসারণ তত বাড়ে। ওজনের একটি নির্দিষ্ট মানকে প্রমাণ ধরে নিয়ে স্প্রিং তুলাদণ্ডটি অংশাঙ্কিত করা সম্ভব—এক্ষেত্রে এক, দুই, তিন····ইত্যাদি কিলোগ্রাম ওজন চাপানোর ফলে স্প্রিংের সূচকটি যে সব জায়গায় স্থির হয় সেখানে সেখানে দাগ কাটা হয়। এর পরে কোন বস্তুকে স্প্রিং তুলাদণ্ডে চাপিয়ে স্প্রিংের প্রসারণ থেকে বস্তুর ওজন তথা পৃথিবীর আকর্ষণ বল জানা যায় (চিত্র 1·1-a)। সরু, মোটা স্প্রিং ব্যবহার করে ভারী এবং হাল্কা

বস্তুর ওজনের উপযোগী বিভিন্ন তুলাদণ্ড তৈরী করা হয়। বাণিজ্যিক ভারী তুলাদণ্ড থেকে শুরু করে সূক্ষ্ম ভৌত পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় নিখুঁত তুলাদণ্ড একই নীতির ভিত্তিতে নির্মিত।

অংশাঙ্কিত স্প্রিঙের সাহায্যে কেবলমাত্র পৃথিবীর আকর্ষণ বল অর্থাৎ ওজন বার করা হয় তাই নয়, এর সাহায্যে অন্য বলও পরিমাপ করা
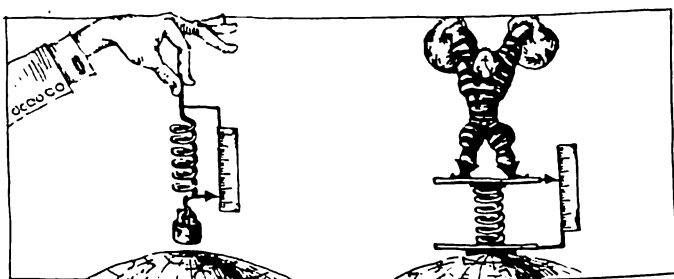
চিত্র 1.1
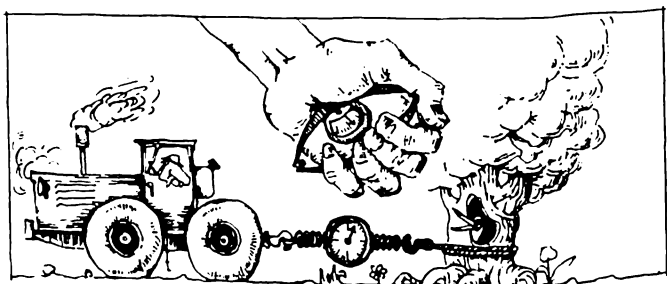
চিত্র 1.2

যায়। এই যন্ত্রকে তখন ডায়নামো-মিটার বলে—শব্দটির অর্থ বলের পরিমাপক। মানুষের পেশীর ক্ষমতা দেখতে এই ধরনের যন্ত্রের ব্যবহার বোধহয় অনেকেই দেখে থাকবেন। প্রসারণক্ষম স্প্রিঙ-এর সাহায্যে মোটরগাড়ীর টানার ক্ষমতাও খুব সহজেই বার করা যায় (চিত্র 1·2)। স্প্রিঙের প্রসারণের পরিবর্তে সংকোচন দেখেও ওজন হিসাব করা সম্ভব (চিত্র 1·1 b)।

বস্তুর গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগুলির একটি তার ওজন। অবশ্য বস্তুর ওজন কেবলমাত্র তার উপাদানের উপর নির্ভর করে না। বস্তুত পক্ষে, পৃথিবী তাকে আকর্ষণ করে। ভাবা যাক, চাঁদে থাকলে কি হত?

স্পষ্টতই, অন্যরকম হত—হিসাবে দেখা যায় প্রায় ছয় গুণ কমে যেত। এমনকি, পৃথিবীপৃষ্ঠেও ওজন বিভিন্ন অক্ষাংশে বিভিন্ন। যেমন, নিরক্ষরেখায় ওজনের তুলনায় মেরুবিন্দুতে ওজন 0·5% বেশী।

এই সব পরিবর্তনীয়তা সত্ত্বেও ওজনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে দুটি বস্তুর ওজনের অনুপাত সর্ব অবস্থায় স্থির থাকে। দুটি বিভিন্ন ভার যদি মেরুবিন্দুতে একটি স্প্রিংকে সমান পরিমাণে প্রসারিত করে তবে নিরক্ষরেখাতেও এই অভেদ বজায় থাকে।
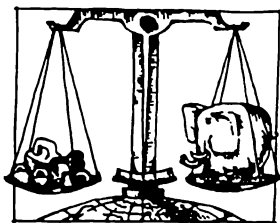
চিত্র 1·3

একটি প্রমাণ ওজনের সঙ্গে তুলনা করে আমরা বস্তুর ওজন হিসাব করি এবং এই তুলনা থেকে বস্তুর একটি নতুন ধর্মের কথা জানা যায়। ধর্মটি বস্তুর ভর।

একটু আগে ওজনের তুলনা করতে গিয়ে যে অভেদের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে আমাদের এই নতুন ধর্ম—ভরের সম্পর্ক রয়েছে। ভরের ভৌত ব্যাখ্যাও তাই।

ওজনের সঙ্গে ভরের পার্থক্য হল, ভর বস্তুর একটি অপরিবর্তনীয় ধর্ম এবং ভর বস্তুর মধ্যস্থ জড়-পদার্থ ছাড়া আর কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না।

সাধারণ তুলাদণ্ডের সাহায্যে খুব সহজেই ওজনের তুলনা তথা বস্তুর ভর নির্ণয় করা সম্ভব (চিত্র 1·3)। তুলাদণ্ডের দু পাশের পাল্লায় দুটি বস্তু চাপালে যদি দণ্ডটি সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় আসে তাহলে বস্তু দুটির ভর সমান বলা হয়। যদি নিরক্ষরেখায় কোন ভার ও বাটখারা তুলাদণ্ডে সাম্যাবস্থায় থাকে তাহলে মেরুবিন্দুতে নিয়ে গেলেও এই অবস্থার হেরফের হবে না—অর্থাৎ, ভার এবং বাটখারার ওজনের পরিবর্তন হয়ে থাকলে তা দুটির ক্ষেত্রেই সমান হয়েছে।

এমনকি, তুলাদণ্ডটিকে এইভাবে চাঁদে নিয়ে গেলেও পূর্বোক্ত সাম্যাবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। সেখানেও দুই পাল্লার বস্তু দুটির ওজনের অনুপাতের কোন পরিবর্তন হবে না—ফলে তুলাদণ্ডের অনুভূমিক সাম্য বজায় থাকবে। সুতরাং বস্তুটি যেখানেই থাকুক না কেন, ভর স্থির থাকবে।

একটি প্রমাণ ওজনের সঙ্গে তুলনা করে ভর ও ওজনের একক নির্ধারণ করা হয়। ঠিক মিটার ও সেকেণ্ডের মতই মানুষ এক্ষেত্রেও প্রকৃতির মধ্যে ভর ও ওজনের প্রামাণ মান খুঁজতে চেষ্টা করে। পূর্বোক্ত কমিশন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সংকর-ধাতুখণ্ডকে প্রমাণ ওজন হিসাবে নির্বাচন করে। এই নির্দিষ্ট ওজনের ধাতুখণ্ডটি এবং 40 সেলসিয়াস* তাপমাত্রার এক ঘন ডেসিমিটার জল তুলাদণ্ডে অনুভূমিক সাম্যাবস্থা তৈরী করে। এই প্রমাণ ওজনকে এক **কিলোগ্রাম** বলে।

পরবর্তী কালে দেখা গেল, এক ঘন ডেসিমিটার জল 'নেওয়া' খুব সহজ কাজ নয়। প্রথমত, ডেসিমিটার মিটারের অংশ, সেকারণে মিটারের সংশোধনের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে তারও পরিবর্তন হতে থাকল। দ্বিতীয়ত, কি ধরনের জল ব্যবহার করা উচিত ? রাসায়নিক দিক থেকে বিশুদ্ধ জল ? দুবার পাতিত জল ? জলে কোনও বায়ু থাকতে পারবে কি ? 'ভারী জল' মিশে থাকলে সেক্ষেত্রে কি করা হবে ? সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, আয়তন মাপার পদ্ধতি ওজন মাপার পদ্ধতি থেকে বেশী ত্রুটিপূর্ণ।

সুতরাং আবার সেই প্রাকৃতিক একককে বর্জন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ল এবং বিশেষ ভাবে প্রস্তুত একটি ওজনকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হল। প্রমাণ মিটারের সঙ্গে এই ওজনটিও প্যারিসে রাখা আছে।

ভর মাপার কাজে এক কিলোগ্রামের হাজার ভাগের এক ভাগ এবং দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগের ব্যবহার সবচেয়ে ব্যাপক—এগুলি যথাক্রমে **গ্রাম** ও **মিলিগ্রাম**। ওজন ও অন্যান্য পরিমাপ সম্পর্কিত

---

* তাপমাত্রার এই নির্বাচন আকস্মিক নয়। জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে তার আয়তনের পরিবর্তন একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে সচরাচর এরকম হয় না। বস্তুকে তাপ দিলে সাধারণত আয়তন বাড়ে, কিন্তু জলের ক্ষেত্রে 0° থেকে 4°C পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে আয়তন কমতে থাকে। 4°C-এর উপরে আবার আয়তন বাড়তে থাকে। দেখা যাচ্ছে জলের তাপমাত্রা বেড়ে 4°C-এ পৌঁছলে আয়তন হ্রাস বন্ধ হয় এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি শুরু হয়।

সংস্থা তাদের দশম ও একাদশ সম্মেলনে গৃহীত আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি (SI) ঘোষণা করলেন। এই পদ্ধতিকে তখন বিভিন্ন দেশ তাদের জাতীয় একক পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করল। এই পদ্ধতিতে 'কিলোগ্রাম' (kg) নামটি সর্বসম্মত ভাবে থেকে গেল, কিন্তু ওজন সহ প্রতিটি বলকে নিউটনে (N) প্রকাশ করা হল। এই এককের এ হেন নামকরণের ইতিহাস ও সংজ্ঞা আমরা একটু পরেই আলোচন করব। নিঃসন্দেহে এই নতুন পদ্ধতি সকলে সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ করবে না, ফলে এখনও বিভিন্ন ভৌত রাশির পরিমাপের ক্ষেত্রে ভরের কিলোগ্রাম (kg) ও বলের কিলোগ্রাম (kgf) এককগুলির শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত উপায় নেই। এই দুই ভিন্ন জাতীয় এককের উপর সাধারণ পাটীগণিতের প্রক্রিয়া চলে না, যেমন $5kg+2kgf=7$ লিখলে তা অর্থহীন, যেমন অর্থহীন মিটারের সঙ্গে সেকেণ্ড যোগ করা।

আন্তর্জাতিক একক ও পরিমাপ পদ্ধতি (The International Systems of Units and Standard of Measurements)

খুব সাধারণ জিনিস নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু হয়ে ছিল। দূরত্ব, সময় এবং ভর মাপার থেকে আর সহজ জিনিস কি আছে? সত্যি বলতে কি, পদার্থবিজ্ঞানের গোড়ার দিকে এগুলি সহজই ছিল, কিন্তু এখন দৈর্ঘ্য, সময় ও ভর পরিমাপের পদ্ধতি এত উন্নত পর্যায়ে পেঁৗছেছে যে তার জন্য পদার্থবিজ্ঞানের সব শাখার জ্ঞান প্রয়োজন। এখন আমরা যা আলোচনা করতে চলেছি সেই ফোটন ও পরমাণুকেন্দ্রকের কথা এই সিরিজের চতুর্থ বইটিতে মোটামুটি বলা হয়েছে। এটুকু মনে রেখে, আমার পরামর্শ হল, যদি এটি আপনার পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম বই হয়, তাহলে এই অনুচ্ছেদটুকু পড়া আপাতত বন্ধ রাখুন।

1960 সালে আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতির প্রবর্তন হয়। সংক্ষেপে এই একককে SI একক বলে। ফরাসী কথা "Le Systeme International d' Unites" থেকে এসেছে। ধীরে হলেও ক্রমেই পদ্ধতিটি প্রত্যয়ের সঙ্গে স্বীকৃতি পাচ্ছে। এই কথাটি লেখার সময়েও (1977 সালের প্রারম্ভে) কিন্তু সেই 'সনাতন' পরিমাপ পদ্ধতির ব্যবহার চলছে। আপনি যদি কোন গাড়ির মালিককে গাড়ির ইঞ্জিনের

কথা জিজ্ঞেস করেন তাহলে তিনি '74 কিলোওয়াট' না বলে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় উত্তর দেবেন, '100 অশ্বক্ষমতা' (ঠিক দশ বছর আগেও যেমন বলতেন)। আমি নিশ্চিত, SI পদ্ধতি দুপুরুষ পরে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পাবে এবং তখন যে সব লেখক এই পদ্ধতিকে অস্বীকার করবেন তাদের বই বাজারে ছাপা হবে না।

SI পদ্ধতি সাতটি প্রাথমিক এককের উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছে ঃ মিটার, কিলোগ্রাম, সেকেণ্ড, মোল, অ্যাম্পিয়ার, কেলভিন এবং ক্যাণ্ডেলা।

প্রথম চারটি নিয়ে শুরু করা যাক। বিভিন্ন রাশির পরিমাপ পদ্ধতির খুঁটিনাটিতে না গিয়ে তাদের সাধারণ প্রকৃতির উপর আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। বস্তুগত (অর্থাৎ মানুষের তৈরী) মানক বর্জন করে পরিবর্তে প্রাকৃতিক মানক গ্রহণ করার প্রবণতা বেশী দেখা যাবে। কারণ, অন্তত আজকের পদার্থ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যায়—এই প্রাকৃতিক মানকগুলি পরিমাপের যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে না এবং সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনও করে না।

মিটার নিয়ে শুরু হোক। ক্রিপটনের একটি সমস্থানিক Kr^{86}-এর বর্ণালীতে একটি উজ্জ্বল রেখা পাওয়া যায়। বিশ্লেষণ পদ্ধতি (পদ্ধতির কথা পরে আলোচনা করা যাবে)-এর সাহায্যে জানা যায়, প্রতিটি বর্ণালী রেখা প্রাথমিক এবং চূড়ান্ত শক্তিস্তরের বৈশিষ্ট্য বহন করে। আমাদের আলোচ্য রেখাটি $5d_5$ শক্তিস্তর থেকে $2P_{10}$ শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংক্রমণের জন্য পাওয়া যায়। সুনির্দিষ্টভাবে বললে, এক মিটার, 86 ভরসংখ্যার ক্রিপটন পরমাণুর $2P_{10}$ এবং $5d_5$ শক্তিস্তরদ্বয়ের মধ্যে শূন্যে বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের 1650 763·73 গুণ। এই নয় অংকের সংখ্যাটির সঙ্গে পরবর্তী অংশটি জুড়ে দিলে এমন কিছু গুরুত্ব বাড়বে না, কারণ, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপার ক্ষেত্রে 10^9 এর মধ্যে 4-এর বেশী ভুল হয় না। দেখা যাচ্ছে, প্রমাণ বস্তুর সঙ্গে মিটারের এই সংজ্ঞার কোন সম্পর্ক নেই। কালের প্রবাহের সঙ্গে এই বিশেষ সংক্রমণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটারও কোন কারণ নেই। সুতরাং ঈপ্সিত লক্ষ্যের কাছে আমরা পৌঁছেছি।

পাঠক বলতে পারেন, বেশ, তা না হয় হল। কিন্তু এই ধরনের অবস্তুগত প্রমাণ-মানের সাহায্যে কি করে একটি দণ্ডের গায়ে মাপার দাগ কাটা যাবে? পদার্থবিদরা জানেন, আলোকের ব্যতিচার পদ্ধতির

সাহায্যে এটা কিভাবে করা সম্ভব। আমাদের চতুর্থ বইটিতে ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখা যাবে।

অবশ্য, এই সংজ্ঞাটিও যে ভবিষ্যতে পালেট যেতে পারে, এমন মনে করার কারণও রয়েছে। কারণটি, লেসাররশ্মি (যেমন, আয়োডিন বাষ্পের সংবদ্ধ হিলিয়াম-নিয়ন লেসার) প্রয়োগ করে অতিমাত্রায় নির্ভুল মাপ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে, 10^{11} এমন কি, 10^{12}-এর মধ্যে 1-এর বেশী ভুল হয় না। এমন হতে পারে, পরবর্তী কালে অন্য একটি রেখা বর্ণালীকে প্রাকৃতিক মানক হিসাবে ধরা যুক্তিযুক্ত মনে হবে।

দ্বিতীয়টির সংজ্ঞা একই ধরনের। সিজিয়াম-133 পরমাণুর দুটি নিকটবর্তী শক্তিস্তরের মধ্যে ইলেকট্রন সংক্রমণজনিত বিকিরণকে ব্যবহার করা হয়। বিকিরণের কম্পাঙ্কের অনোন্যককে স্পন্দনের সময় বা পর্যায়কাল বলে। এক সেকেণ্ড 9 192 631 770 সংখ্যক পর্যায়-কালের সমান। এই স্পন্দন মাইক্রোতরঙ্গের পাল্লায় পড়ে। ফলে, আমরা বেতার পদ্ধতির সাহায্যে কম্পাঙ্কের ভাগ করে যে কোন ঘড়িকে মিলিয়ে নিতে পারি। 300 000 বছরে ভুলের পরিমাণ হতে পারে 1 সেকেণ্ড মাত্র।

শক্তিবিকিরণের সাহায্যে এভাবে দৈর্ঘ্যের একক (নির্দিষ্ট সংখ্যক তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিয়ে) এবং সময়ের একক (নির্দিষ্ট সংখ্যক স্পন্দনকাল নিয়ে) ঠিক করা পরিমাপ-বিজ্ঞানীদের বহুদিনের স্বপ্ন।

1973 সালে বিজ্ঞানীরা এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার কৌশল আয়ত্ত করলেন। মিথেন গ্যাস দিয়ে সংবদ্ধ করা হিলিয়াম-নিয়ন লেসার রশ্মি প্রয়োগ করে এই পরিমাপ সম্ভব হল। তরঙ্গদৈর্ঘ্য পাওয়া গেল 3·39 মিলিমাইক্রন এবং কম্পাঙ্ক 88×10^{-12} চক্র প্রতি সেকেণ্ডে। এই পদ্ধতি এত উচ্চমানের যে এই দুই সংখ্যার গুণফল থেকে শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ পাওয়া গেল সেকেণ্ডে 299792458 মিটার। ত্রুটি, 10^{9}-এর মধ্যে মাত্র 4।

এই উজ্জ্বল কৃতিত্বের (এবং এখনও যথেষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ) পাশা-পাশি কিন্তু ভর পরিমাপের পদ্ধতি তুলনামূলক ভাবে ম্লান, পদ্ধতিটি আরও নিখুঁত হবার অপেক্ষা রাখে। দুর্ভাগ্যবশত, 'বস্তুগত' কিলো-গ্রামটির এখনও ব্যবহার চলছে। একথা সত্যি, তুলাদণ্ডের পরিমার্জনা থেমে নেই, কিন্তু তাতেও দুই একটি ক্ষেত্রে মাত্র ভরের তুলনা পদ্ধতির প্রয়োগে মোটামুটি নির্ভুল মাপ পাওয়া যাচ্ছে। ত্রুটি, 10^{9}-এ 1-এর মত। গ্রামে বস্তুর ভর পরিমাপ বা মহাকর্ষ সূত্রের মহাকর্ষীয় ধ্রুবক

নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নির্ভুলতা এখনও উচ্চমাত্রার নয়—10^5-এর মধ্যে ভুলের পরিমাণ 1-এর থেকে কমানো যাচ্ছে না।

ওজন এবং অন্যান্য পরিমাপের চতুর্দশ সাধারণ কংগ্রেস (1971) SI পদ্ধতিতে পদার্থের একটি প্রাথমিক একক সংযোজন করেন—এককটি মোল (Mole)। অ্যাভোগাড্রো সংখ্যার নতুন সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ পদার্থ সম্পন্ন এই স্বতন্ত্র এককটির প্রবর্তন সম্ভব হয়েছে।

জানা গেল, অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা ঠিক 1 গ্রাম-পরমাণু পদার্থে পরমাণুর সংখ্যা নির্দেশ করে না। বস্তুত, এটি 12 গ্রাম কার্বন C^{12} (কার্বনের একটি সমস্থানিক)-এর পরমাণুর সংখ্যাকে বোঝায়। 12 গ্রাম C^{12}-এর পরমাণুর সংখ্যাকে যদি (N_A) দিয়ে সূচিত করি, তাহলে N_A সংখ্যক কণা নিয়ে গঠিত পদার্থকে 1 মোলের সংজ্ঞা বলা যায়। কণাগুলি পরমাণু, অণু, আয়ন, মূলক, ইলেকট্রন, ইত্যাদি কিম্বা এদের নির্দিষ্ট সমষ্টিও হতে পারে।

এই নতুন প্রাথমিক এককের সঙ্গে একটি নতুন ভৌত ধারণার কথাও বলা হল। কিন্তু তা বলতে গিয়ে আমরা এক্তিয়ার বহির্ভূত ভাবে মৌলকণিকার ভরের ধারণাকে প্রয়োগ করেছি, যেখানে এই ভররাশিকে তুলাদণ্ড দিয়ে মাপা ছাড়া আর কোন পদ্ধতি আমাদের হাতে নেই।

বর্তমানে মূল ভর পরিমাপের চেয়েও কম নির্ভুলভাবে এই মোল পরিমাণ পদার্থ (অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা বা সূক্ষ্মতর অর্থে পারমাণবিক ভর) মাপা হয়। ঐ পরিমাণ পদার্থ-ভরের উপর নির্ভর করে বলে তার পরিমাপ ভর পরিমাপের চেয়ে যে কম নির্ভুল হবে তা অবশ্য সহজে বোঝা যায়।

পাঠকের মনে হতে পারে, এই নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের বেশী কিছু নয়। যাই হোক, পরিমাপ পদ্ধতির সূক্ষ্মতার পার্থক্য দেখে ভরের এই দুই ধারণার স্থায়িত্বের বিচার হবে। পরমাণুর ভরের গুণিতকে যদি কোনদিন কিলোগ্রামকে প্রকাশ করা সম্ভব হয়, সেদিন বিষয়টি নিয়ে আবার নতুন করে ভাবনা চিন্তা করতে হবে এবং সেদিন কিলোগ্রাম হয়ত মিটার বা সেকেণ্ডের সমপর্যায়ের রাশি হয়ে উঠবে।

ঘনত্ব (Density)

সীসার মত ভারী এবং পালকের মত হাল্কা বলতে গিয়ে আমরা কি বোঝাতে চাই? আবার, সীসার একটি দানা বেশ হাল্কা, অন্যদিকে

পালকের বিরাট স্তূপের ভর অনেক বেশী। এই সব তুলনার ক্ষেত্রে বস্তুর ভর নয়, বস্তুগত পদার্থের ঘনত্বের কথাই মনে রেখে আমরা বিচার করে থাকি।

বস্তুর একক আয়তনের ভরকে তার ঘনত্ব বলে। স্পষ্টতই সীসার একটি টুকরো এবং বিরাট আয়তনের সীসার বুকের ঘনত্ব একই হবে। আমরা সাধারণত বস্তুর এক ঘন সেণ্টিমিটারের (cm^3) ওজন যত গ্রাম (g) সেই সংখ্যা দিয়ে বস্তুর ঘনত্ব নির্দেশ করি—সংখ্যার শেষে গ্রাম / সে.মি^{3} চিহ্নটি বসিয়ে দিই। চিহ্নের তির্যক রেখাটি বুঝিয়ে দিচ্ছে, ঘনত্ব নিরূপণ করতে গেলে গ্রাম সংখ্যাকে ঘন সেণ্টিমিটারের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে।

সমস্ত পদার্থের মধ্যে কিছু কিছু ধাতু খুব ভারী—ওসমিয়াম্, এর ঘনত্ব 22·5 গ্রাম / সে মি^{3}, ইরিডিয়াম্ (22·4), প্ল্যাটিনাম (21·5), টাংস্টেন এবং সোনা (19·3)। লোহার ঘনত্ব 7·88 এবং তামার 8·93।

হাল্কা ধাতুর মধ্যে ম্যাগনেশিয়াম (1·74), বেরিলিয়াম (1·83) এবং অ্যালুমিনিয়ামের (2·70) নাম করা যায়। এর থেকেও হাল্কা পদার্থের সন্ধান জৈব বস্তুতে পাওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন জাতের কাঠ এবং প্ল্যাস্টিকের ঘনত্ব বেশ কম, প্রায় 0·4-এর মত।

এখানে বস্তুকে নিরেট ধরে নিয়েই আলোচনা করা হচ্ছে। ঘনবস্তুর মধ্যে ছিদ্র থাকলে তা অবশ্যই কম ভারী বলে মনে হবে। কর্ক, ফোম-কাচ ইত্যাদি সছিদ্র বস্তু প্রযুক্তিবিদ্যায় প্রায়শঃ ব্যবহার করা হয়। ফোম-কাচের ঘনত্ব 0·5 থেকেও কম হতে পারে, যদিও যে ঘনবস্তু থেকে ফোম-কাচ তৈরী হয় তার ঘনত্ব 1-এর বেশী। 1-এর থেকে কম ঘনত্ব বিশিষ্ট আর সব বস্তুর মতই ফোমকাচ পুরোদস্তুর জলে ভাসতে পারে।

তরল হাইড্রোজেন সবচেয়ে হাল্কা পদার্থ। খুব নিম্ন তাপমাত্রায় এই তরল তৈরী করা হয়। 1 ঘন সেণ্টিমিটার তরল হাইড্রোজেনের ভর মাত্র 0·07 গ্রাম। জলের ঘনত্বের সঙ্গে অ্যালকোহল, বেনজিন, কেরোসিন ইত্যাদি কিছু কিছু জৈব তরলের ঘনত্বের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। পারদ বেশ ভারী—এর ঘনত্ব 13·6 গ্রাম / সে.মি^{3}।

এখন গ্যাসের ক্ষেত্রে ঘনত্ব কিভাবে স্থির করা হয়? সকলেই জানেন, গ্যাস যে কোন আয়তন অধিকার করতে পারে। গ্যাস-ব্যাগ থেকে একই পরিমাণ গ্যাস বিভিন্ন আয়তনের পাত্রে দিলে পাত্রগুলি একই ভাবে ভর্তি হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে, একই ভরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আয়তন—গ্যাসের ঘনত্ব তাহলে ঠিক করা যায় কিভাবে?

সেকারণে, একটি তথাকথিত স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ 0°c তাপ-মাত্রায় এবং এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে গ্যাসের ঘনত্বের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় বায়ুর ঘনত্ব 0·00129 গ্রাম / সে. মি^{3}, ক্লোরিনের 0·00322 গ্রাম/সে. মি^{3}। তরলের মত এখানেও কম ঘনত্বের রেকর্ড হাইড্রোজেনের দখলে। সবচেয়ে হাল্কা এই গ্যাসটির ঘনত্ব মাত্র 0·00009 গ্রাম/সে. মি^{3}।

এরপরের হাল্কা গ্যাসটি হিলিয়াম, এই গ্যাস হাইড্রোজেনের দ্বিগুণ ভারী। কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাতাসের থেকে 1·5 গুণ ভারী। ইটালীতে নেপল্‌স- এর কাছে 'ক্যানাইনকেভ' (caninecave) নামে একটি বিখ্যাত গুহা আছে। এই গুহার নীচ থেকে অনবরত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়। গ্যাসটি গুহার নীচের অংশে জমা হয় এবং খুব ধীরে গুহা থেকে অল্প অল্প করে বাইরে আসে। মানুষ কষ্ট করে এর মধ্যে ঢুকতে পারে কিন্তু কুকুরের ক্ষেত্রে গুহাটি বিপজ্জনক। একারণে গুহাটির ওইরকম নাম।

চাপ ও তাপমাত্রার মত বহিঃস্থ অবস্থার প্রভাবে গ্যাসের ঘনত্ব খুবই সংবেদনশীল। সেকারণে, বহিঃস্থ অবস্থার উল্লেখ না করে গ্যাসের ঘনত্বের কথা বলা একেবারে অর্থহীন। তরল ও কঠিন পদার্থের ঘনত্ব ও চাপও তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে, তবে তুলনায় অনেক কম।

ভরের সংরক্ষণ সূত্র (The Law of Conservation of Mass)

জলে কিছু চিনি মেশালে দ্রবণের ভর চিনি ও জলের মোট ভরের সমান হয়।

এই ধরনের অসংখ্য উদাহরণের দ্বারা প্রমাণ করা যায়, বস্তুর ভর একটি অপরিবর্তনীয় ধর্ম। বস্তুটি গুঁড়িয়ে ফেলা হোক বা দ্রবণে মিশিয়ে দেওয়া হোক, তাতে কিছু যায় আসে না—ভর একই থাকে।

যে কোন রাসায়নিক পরিবর্তনে এই জিনিস ঘটে। ধরুন, কয়লা জ্বালানো হল। সতর্কতার সঙ্গে ওজন করে দেখানো যায়, কয়লা এবং বায়ুর অক্সিজেনের দহনের ক্ষেত্রে বিক্রিয়াপূর্ব-পদার্থের ভর ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের ভর সমান।

সূক্ষ্মভাবে ওজনের কলাকৌশল ও পদ্ধতি উন্নত হবার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে শেষবারের মত এইভরের সংরক্ষণ সূত্র

মিখাইল লোমোনোসভ (1711—1765)—প্রখ্যাত রাশিয়ান বিজ্ঞানী, রাশিয়ায় বিজ্ঞান চর্চার উদ্গাতা এবং একজন মহান শিক্ষাবিদ। পদার্থবিজ্ঞানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈদ্যুতিক এবং তাপীয় 'পদার্থের' প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে লোমোনোসভ যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করেন এবং পদার্থের অনুগতিতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনিই প্রথম পরীক্ষামূলক ভাবে রাসায়নিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভরের নিত্যতা সূত্র প্রমাণ করেন। তিনি বায়ুমণ্ডলীয় বিদ্যুৎ এবং আবহাওয়া-বিজ্ঞানের উপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোকযন্ত্র নির্মাণ এবং শুক্রগ্রহের আবহাওয়া-মণ্ডল আবিষ্কার করেন। ল্যাটিন থেকে প্রাথমিক ভৌত ও রাসায়নিক শব্দসমূহের রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদের ব্যাপারে তাঁকে পথিকৃৎ বলা যেতে পারে।

পরীক্ষামূলকভাবে প্রদর্শন করা হয়। দেখা গেল, রাসায়নিক রূপান্তরের ফলে ভরের সামান্যতম পরিবর্তনও হচ্ছে না।

প্রাচীন কালেও ভরকে অপরিবর্তনীয় বা নিত্য বলে ধরা হত। 1756 সালে সর্বপ্রথম পরীক্ষার মাধ্যমে ভরের নিত্যতা সূত্র প্রমাণ করা হয়। পরীক্ষা করেন বিজ্ঞানী মিখাইল লোমোনোসভ (Mikhail Lomonosov)। তাপপ্রয়োগে ধাতুচূর্ণকে কঠিনে পরিণত করে তিনি দেখান, ভর অপরিবর্তিত রয়েছে। এই সূত্রের বৈজ্ঞানিক গুরুত্বও তিনি পরীক্ষা করে দেখান।

ভর বস্তুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিত্য বৈশিষ্ট্য। বলতে গেলে, বস্তুর অধিকাংশ ধর্মই মানুষের হাতে পাল্টাতে পারে। যে লোহার দণ্ডকে সহজে বাঁকানো যায় তাকে কায়দা করে শক্ত এবং ভঙ্গুরও করে দেওয়া যায়। শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে-ঘোলাটে দ্রবণকে স্বচ্ছ করাও কঠিন নয়। বাহ্যিক ক্রিয়ায় পদার্থের যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক এবং তাপীয় ধর্মের পরিবর্তন করা সম্ভব। বাহ্যিকক্রিয়া যে ধরনেরই হোক না কেন, বস্তুতে বাইরে থেকে কোনও পদার্থ-যোগ না করে বা বস্তুর কোন কণাকে বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন না করে তার ভরের পরিবর্তন করা একেবারেই অসম্ভব।*

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া (Action and Reaction)

প্রত্যেক বলের ক্রিয়ারই একটি প্রতিক্রিয়া আছে। ব্যাপারটি অনেক সময় আমরা খেয়ালই করি না। স্প্রিঙ-এর গদীমোড়া বিছানায় সুটকেস রাখলে জায়গাটি একটু বসে যায়। সুটকেসটির ওজন বিছানার উপরে ক্রিয়া করছে, এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। যাই হোক, অনেক সময় ভুলে যাই, বিছানাটিও সুটকেসের উপরে বল প্রয়োগ করছে। বস্তুত, সুটকেসটি নীচে পড়ে যাচ্ছে না—এর অর্থ, সুটকেসটির ওজনের সমান একটি বল লম্বভাবে উপর দিকে ক্রিয়া করছে।

অভিকর্ষের বিপরীতমুখী বলকে সাধারণভাবে অবলম্বনের প্রতিক্রিয়া বলে। 'প্রতিক্রিয়া' শব্দটির অর্থ 'বিপরীত ক্রিয়া'। টেবিলে রাখা বই-এর উপর টেবিলের ক্রিয়া এবং বিছানায় রাখা সুটকেসের উপর বিছানার ক্রিয়াকে অবলম্বন দুটির প্রতিক্রিয়া বলা হবে।

* এই উক্তির কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। পাঠক পরে তা আবিষ্কার করবেন।

একটু আগেই বলা হয়েছে, বস্তুর ওজন স্প্রিঙ তুলার সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। স্প্রিঙ-এর উপর বস্তুটি চাপালে স্প্রিঙ-এ বস্তুটির চাপ বা স্প্রিঙ থেকে বস্তুটিকে ঝুলিয়ে দিলে স্প্রিঙ-এর প্রসারণের বল বস্তুটির ওজনের সমান। পক্ষান্তরে, স্প্রিঙ-এর সংকোচন বা প্রসারণ হিসাব করে অবলম্বনের প্রতিক্রিয়া জানা যেতে পারে। দেখা যাচ্ছে, স্প্রিঙ-এর সাহায্যে কোনও বলের মান পরিমাপ করতে গিয়ে আমরা শুধু একটি বল নয়, একই সঙ্গে দুটি বিপরীতমুখী বলের পরিমাণ পাই। স্প্রিঙ তুলার সাহায্যে তুলাপাত্রের উপর বস্তুর চাপ বার করি, সেইসঙ্গে অবলম্বনের প্রতিক্রিয়াও জানা হয়—এই প্রতিক্রিয়া আসলে বস্তুর উপর তুলাপাত্রের ক্রিয়া। স্প্রিঙ-এর একপ্রান্ত দেওয়ালের হুকে আটকে অন্য প্রান্ত হাত দিয়ে টানলে হাত কতটা বলে স্প্রিঙকে টানে তা জানা যায়, একই সঙ্গে স্প্রিঙ কত জোরে হাতকে টানছে তাও বোঝা যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বলের একটি উল্লেখযোগ্য ধর্ম হল, বল সর্বদা জোড়বদ্ধ অবস্থায় থাকে। আরও এই যুগ্ম বল মানে সমান কিন্তু বিপরীত-মুখী। এই যুগ্ম বলের একটিকে ক্রিয়া ও অন্যটিকে প্রতিক্রিয়া বলে।

একটি 'বিচ্ছিন্ন' বল প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না—বস্তুসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ারই কেবল প্রকৃত অস্তিত্ব সম্ভব। অধিকন্তু, বলের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সর্বদা সমান। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একটি বস্তু ও তার দর্পণ-প্রতিবিম্বের মধ্যে যে সম্পর্ক, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্কও সেই রকম।

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত হওয়ায় পরস্পরকে প্রশমিত করে—এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়া উচিত নয়। একই বস্তুর উপরে একাধিক বল ক্রিয়াশীল হলে সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা আসতে পারে। যেমন টেবিলের উপর রাখা বই-এর ওজনকে (বই-এর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল) টেবিলের প্রতিক্রিয়া (বই-এর উপর টেবিলের ক্রিয়াবল) প্রশমিত করে।

দুটি ভিন্ন পারস্পরিক ক্রিয়ার সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সব বলের প্রসঙ্গ আসে তাদের সঙ্গে তুলনায় বলা যায়, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি জোড় একটি পারস্পরিক ক্রিয়াকে নির্দেশ করে। আমাদের টেবিল ও বই-এর উদাহরণ, ক্রিয়া হল 'টেবিল-বই' এবং প্রতিক্রিয়া 'বই-টেবিল'। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, বলা বাহুল্য দুটি ভিন্ন বস্তুর উপর প্রযুক্ত হয়।

এবার দীর্ঘদিনের একটি ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করার চেষ্টা করা যাক। বলা হয়, "ঘোড়া যে বলে ওয়াগনকে টানে, ওয়াগনটিও সেই

বলে ঘোড়াকে টানে ; তাহলে উভয়ে চলে কি করে ?” প্রথমত, আমাদের মনে রাখতে হবে, রাস্তা পিচ্ছিল হলে ঘোড়া ওয়াগনকে নড়াতে পারবে না। সে কারণে, এই ক্ষেত্রে গতির কারণ খুঁজতে একটির পরিবর্তে দুটি পারস্পরিক ক্রিয়ার কথা ভাবতে হবে—শুধু ‘ওয়াগন-ঘোড়া’ নয়, সেইসঙ্গে ‘ঘোড়া-রাস্তা’-ও। যে মুহূর্তে ‘ঘোড়া-রাস্তার’ পারস্পরিক ক্রিয়াজনিত বল (ঘোড়া রাস্তার উপর যে বল প্রয়োগ করে) ‘ওয়াগন-ঘোড়ার’ পারস্পরিক ক্রিয়াজনিত বলকে (যে বলে ওয়াগন ঘোড়াকে টানে) অতিক্রম করে, সেই মুহূর্তে গতি শুরু হয়। ‘ওয়াগনের ঘোড়াকে টানার বল’ এবং ‘ঘোড়ার ওয়াগনকে টানার বল’ দুটি একটি মাত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জোড়কে নির্দেশ করে ; সে কারণে তাদের মান স্থির অবস্থাতে এবং গতির যে কোন মুহূর্তে একই থাকবে।

কিভাবে বেগের যোগ করা হয় (How velocities are added)

আমি যদি আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করি এবং তারপরেও একঘণ্টা, তাহলে মোট দেড়ঘণ্টা সময় খরচ হয়। আমাকে যদি প্রথমে এক রুবল এবং পরে আরও দু’রুবল দেওয়া হয়, আমার মোট তিন রুবল জমবে। যদি আমি 200 গ্রাম আঙুর কিনে পরে আরও 400 গ্রাম কিনি, তবে আমার মোট 600 গ্রাম আঙুর কেনা হবে। বলা হবে, সময়, ভর এবং অন্যান্য একজাতীয় রাশির যোগ পাটীগণিতের নিয়মে করা হয়েছে।

প্রতিটি রাশির যোগ বা বিয়োগ কিন্তু এত সহজে করা যায় না। যদি বলি, মস্কো থেকে কোলম্না 100 কিলোমিটার আর কোলমনা থেকে কাশিরা 40 কিলোমিটার দূরে, তাহলে কাশিরা মস্কো থেকে 140 কিলোমিটার দূরে নাও বোঝাতে পারে। কারণ, দূরত্ব পাটীগণিতের নিয়মে যোগ করা যায় না।

তাহলে কোন নিয়মে এইসব রাশির যোগ করা যায় ? আমাদের উদাহরণটি থেকে প্রয়োজনীয় নিয়মটি সহজে পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক। আলোচ্য তিনটি স্থানের আপেক্ষিক অবস্থান একখণ্ড কাগজের উপর তিনটি বিন্দু দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে (চিত্র 1·4)। বিন্দু তিনটিকে একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু ধরে ত্রিভুজটি গঠন করা হল। ত্রিভুজের দুটি বাহু জানা থাকলে তৃতীয় বাহুটি বার করা যায়। এরজন্য অবশ্য বাহু দুটির অন্তর্ভুক্ত কোণটি জানা দরকার।

মস্কো থেকে কোলম্‌না পর্যন্ত যাত্রাপথকে একটি তীরের সাহায্যে দেখান হয়েছে এবং তীরের অগ্রভাগ গতিপথের অভিমুখ নির্দেশ করছে।
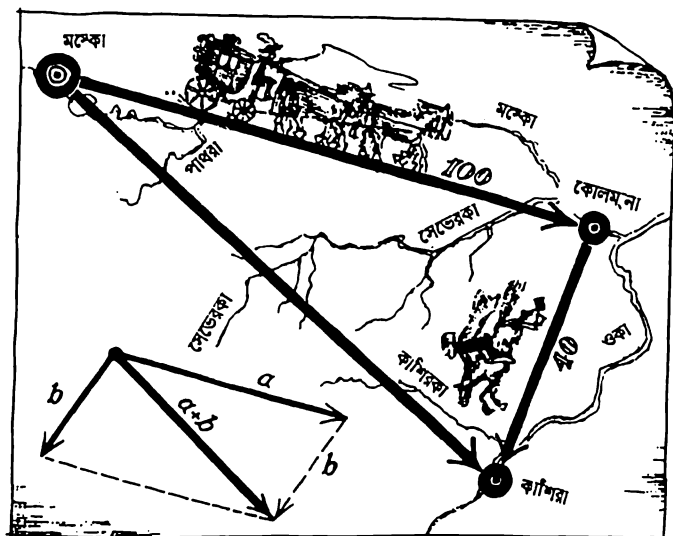
চিত্র 1.4

এই ধরনের তীর চিহ্নকে ভেক্টর বলে। একইভাবে কোলম্‌না থেকে কাশিরার পথ অন্য একটি ভেক্টর দিয়ে সূচিত হয়েছে।

এখন, মস্কো থেকে কাশিরার পথকে কিভাবে দেখানো হবে? প্রথম ভেক্টরের সূচনাবিন্দু থেকে এই ভেক্টরের শুরু হবে এবং ভেক্টরটি দ্বিতীয় ভেক্টরের সমাপ্তিবিন্দুতে শেষ হবে। এই নতুন পথরেখা ত্রিভুজটির গঠন সম্পূর্ণ করে।

যে যোগের কথা বলা হল তাকে জ্যামিতিক যোগ বলে এবং যে সমস্ত রাশির যোগ এই পদ্ধতিতে করা হয় তাদের ভেক্টর রাশি বা সংক্ষেপে ভেক্টর বলে।

যে কোন রেখাখণ্ডে সূচনাবিন্দু ও সমাপ্তিবিন্দুর পার্থক্য বোঝাতে রেখার গায়ে তীরচিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই রেখাখণ্ডকে **ভেক্টর** বলে—এর দিক ও মান দুই-ই থাকে।

অনেকগুলি ভেক্টরকে যোগ করার ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রয়োগ করা যায়। প্রথম বিন্দু থেকে দ্বিতীয় একটি বিন্দুতে, দ্বিতীয় বিন্দু থেকে তৃতীয়

একটি বিন্দুতে····এইভাবে যেতে থাকলে যাত্রাপথটি একটি ভাঙ্গা রেখার চেহারা নেয়। আবার, সরাসরি যাত্রাপথের সূচনাবিন্দু থেকে সমাপ্তি-বিন্দুতেও যাওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে, শেষোক্ত রেখাটি বহুভুজটির গঠন সমাপ্ত করে এবং সেইসঙ্গে ভেক্টরগুলির যোগ নির্দেশ করে।

অন্যদিকে, ভেক্টর ত্রিভুজের সাহায্যে দুটি ভেক্টরের বিয়োগফল বার করা যায়। বিয়োগ করার সময় ভেক্টর দুটি একই বিন্দু থেকে আঁকতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় ভেক্টরের প্রান্তবিন্দুদ্বয় একটি রেখা দিয়ে যোগ করলে রেখাটি বিয়োগ ভেক্টর নির্দেশ করে।

ত্রিভুজ-নিয়ম ছাড়াও সামান্তরিক নিয়মের সাহায্যেও ভেক্টরের যোগ-বিয়োগ সম্ভব (1·4 চিত্রের নীচে বাঁদিকের কোণে)। এই নিয়ম অনুযায়ী যে ভেক্টর দুটি যোগ করতে হবে তাদের একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত দুটি বাহুদ্বারা দিকে ও মানে প্রকাশ করতে হয় এবং ভেক্টর-দ্বয়ের ছেদবিন্দু থেকে সামান্তরিকের কর্ণটি আঁকতে হয়। চিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে, কর্ণটি ত্রিভুজ-নিয়মের পরিচিত অবস্থা তৈরী করেছে। কর্ণটি দ্বারা ভেক্টর দুটির যোগফল বা লব্ধি দিকে ও মানে সূচিত হয়। দেখা যাচ্ছে দুটি নিয়মের কার্যকারিতা একই।

শুধুমাত্র সরণ পরিমাপের জন্য ভেক্টরের ধারণা ব্যবহার করা হয় না। পদার্থবিজ্ঞানে ভেক্টর রাশির সংখ্যা অজস্র।

উদাহরণ হিসাবে গতিবেগের কথা বলা যায়। একক সময়ে সরণের পরিমাণকে বেগ বলে। সরণ একটি ভেক্টর রাশি, সুতরাং বেগও একটি ভেক্টর এবং এর দিক ও সরণের দিক অভিন্ন। বক্র-গতিতে প্রতিমুহূর্তে সরণের অভিমুখ পাল্টে যায়। সেক্ষেত্রে বেগের দিকটি কি হবে ? বক্রপথের একটি অতিক্ষুদ্র অংশের উপর অঙ্কিত স্পর্শক গতির অভিমুখ নির্দেশ করে। সে কারণে, যে কোন মুহূর্তে সরণ এবং বেগের অভিমুখ সেই মুহূর্তের অবস্থানে অঙ্কিত স্পর্শক বরাবর।

অনেকক্ষেত্রে ভেক্টর-নিয়মের সাহায্যে বেগের যোগ-বিয়োগ করার দরকার পড়ে। একটি বস্তু একই সঙ্গে দুটি গতির অধীন হলে ভেক্টর-যোগ অপরিহার্য। এধরনের ঘটনা অনেক পাওয়া যায়ঃ যেমন, গতিশীল ট্রেনের মধ্যে কোন ব্যক্তি পদচারণা করছেন ; একটি জলবিন্দু অভিকর্ষের টানে ট্রেনের জানালার কাচে গড়িয়ে পড়ছে, একই সঙ্গে বিন্দুটি ট্রেনের সঙ্গেও গতিশীল ; পৃথিবী সূর্যের চার পাশে ঘুরছে এবং সেই সঙ্গে সূর্য এবং পৃথিবীর জোড় অন্যান্য নক্ষত্রের সাপেক্ষে গতিশীল।

উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে এবং এই ধরনের অনেক ঘটনায় ভেক্টর-যোগের নিয়মে বেগের লব্ধি নির্ণয় করা হয়।

একই সরলরেখা বরাবর সমমুখী দুটি বেগের যোগ বা বিপরীত-মুখী হলে বিয়োগ পাটীগণিতের সাধারণ যোগ-বিয়োগের নিয়মে পড়ে।

কিন্তু বেগ দুটি পরস্পর একটি নির্দিষ্ট কোণে থাকলে কিভাবে যোগ করা যাবে ? সেক্ষেত্রে জ্যামিতিক অঙ্কনের সাহায্য নিতে হবে।

আপনি যদি বেগবান নদী সরাসরি পার হবার জন্য স্রোতের লম্বা-দিকে নৌকা চালনা করেন তবে দেখা যাবে, আপনি স্রোতের অভিমুখে কিছুটা সরে গেছেন। এখানে নৌকাটি দুটি বেগের অধীন একটি নদীর স্রোত বরাবর এবং অন্যটি স্রোতের লম্বদিকে। নৌকার লব্ধি বেগটি 1·5 চিত্রে দেখানো হয়েছে।
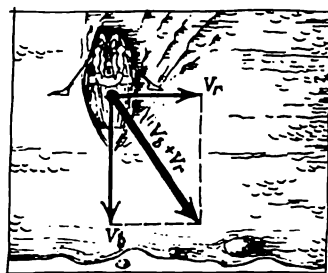
চিত্র 1.5

আরেকটি উদাহরণ। চলমান ট্রেনের জানালা দিয়ে বৃষ্টিপতন কেমন দেখায় ? এ অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে। যদি বায়ু-প্রবাহ নাও থাকে, তাহলেও এই বৃষ্টি তির্যকভাবে পড়ে। মনে হয়, ট্রেনের সামনের দিক থেকে বায়ুপ্রবাহের জন্য বৃষ্টির ফোঁটাগুলি যেন বিক্ষিপ্ত হচ্ছে (চিত্র 1·6)।

বায়ুপ্রবাহহীন আবহাওয়ায় বৃষ্টির ফোঁটা খাড়াভাবে নীচে পড়ে। কিন্তু এখানে যে সময়ে বৃষ্টির ফোঁটা ট্রেনের জানালার কাছে আসে সেই সময়-অবকাশে ট্রেনটি খানিকটা এগিয়ে যায়, ফলে বৃষ্টিপতনের উল্লম্ব রেখাটি পিছনে পড়ে যায়। সেকারণেই বৃষ্টিপতন তির্যক লাগে।

ট্রেনের বেগ v_t এবং বৃষ্টিপাতের বেগ v_r হলে আরোহীর কাছে বৃষ্টিপতনের প্রতীয়মান বা আপেক্ষিক বেগ হবে v_t এবং V_r*-

* এখানে এবং পর থেকে মোটা হরফের সাহায্যে ভেক্টর বোঝানো হবে। মান ছাড়াও দিকের ধারণা এতে নিহিত থাকছে।

এর ভেক্টর-বিয়োগফল। 1·6 চিত্রে সংশ্লিষ্ট বেগ-ত্রিভুজটি দেখানো হয়েছে। তির্যক ভেক্টরটি বৃষ্টিপতনের অভিমুখ নির্দেশ করছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কেন বৃষ্টিধারা তির্যকভাবে পড়ছে বলে মনে
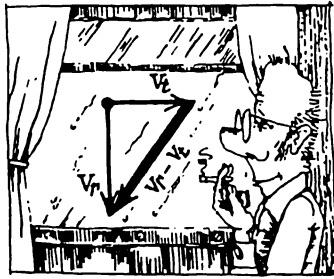
চিত্র 1,6

হয়। তির্যকতীরটির দৈর্ঘ্য আমাদের অঙ্কনের স্কেল অনুযায়ী বৃষ্টিপতনের বেগের মান নির্দেশ করে। ট্রেনের গতিবেগ বাড়লে এবং বৃষ্টির ফোঁটা অপেক্ষাকৃত ধীরে পড়লে বৃষ্টির ধারা আরও তির্যক বলে মনে হবে।

বল একটি ভেক্টর (Force is a vector)

বেগের মতই বলও একটি ভেক্টর রাশি। কারণ, বলের ক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট অভিমুখে ঘটে। সুতরাং আগের নিয়মেই বলের যোগ করা যাবে।

বাস্তবজীবনে অনেক ঘটনায় এই যোগের উদাহরণ দেখা যায়। 1·7 চিত্রে দেখা যাচ্ছে, মোটা দড়িতে একটা বড় গাঁট ঝোলানো রয়েছে। এক ব্যক্তি দড়ি বেঁধে গাঁটটি এক পাশে টানছেন। দড়িটির উপর দুটি টান কাজ করছে—একটি গাঁটের ওজন এবং অন্যটি ব্যক্তিটির প্রদত্ত বল।

ভেক্টর-যোগের নিয়মে আমরা দড়ির উপর টান এবং লব্ধিক্রিয়া-রেখা নির্ণয় করতে পারি। গাঁটটি স্থির অবস্থায় রয়েছে, সুতরাং তার উপর ক্রিয়ারত বলগুলির লব্ধি নিশ্চয়ই শূন্য। এভাবেও বলা যায়—দড়িবরাবর ক্রিয়াশীল টান অবশ্যই গাঁটের ওজন এবং দড়ি বরাবর ব্যক্তিটির প্রদত্ত বলের যোগের সমান। শেষোক্ত বলদুটির যোগফল সামান্তরিক নিয়মে কর্ণের সমান এবং দড়ির দৈর্ঘ্য বরাবর কাজ করে (নাহলে দড়ির টান একে 'নষ্ট' করতে পারত না)। গাঁটের উপর

ক্রিয়াশীল দুটি বলের পরিবর্তে একটি বল পাওয়া যাচ্ছে। ভেক্টর যোগে এই ফলকে সময়-সময় লব্ধিও বলা হয়।
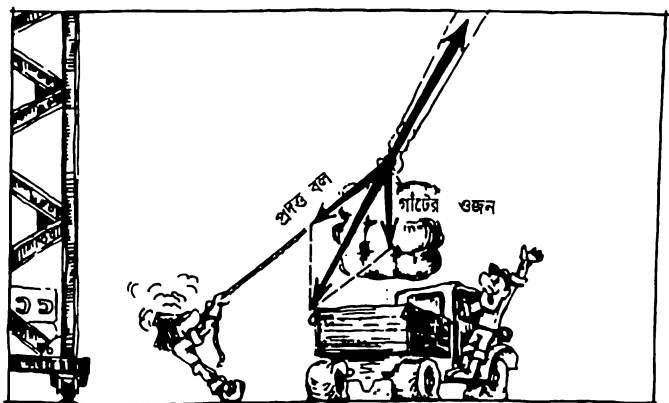
চিত্র 1.7

বলের যোগের বিপরীত ঘটনা মাঝে মাঝে আমাদের বিব্রতও করে। দুটি দড়ির সাহায্যে একটি লণ্ঠন ঝোলানো রয়েছে। দড়ি দুটিতে টানের হিসাব করার জন্য লণ্ঠনটির ওজনকে দড়িবরাবর দুটি উপাংশে বিশ্লেষণ করতে হবে।
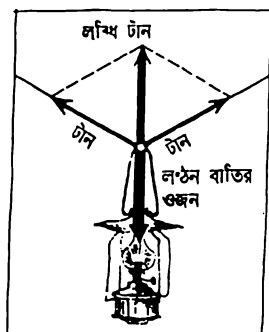
চিত্র 1.8

লব্ধি ভেক্টরের (চিত্র 1·8) শেষবিন্দু থেকে দড়ি দুটির সমান্তরাল দুটি রেখা দড়ি পর্যন্ত টানা হল। এভাবে বলের সামান্তরিকটি তৈরী

হল। সামান্তরিকের বাহু দুটি মেপে (যে স্কেলে ওজন নির্দেশ করা হয়েছে) দড়ি বরাবর টানের পরিমাণ পাওয়া যাবে।

এইভাবে বলের বিশ্লেষ করা সম্ভব। দুই বা ততোধিক সংখ্যার যোগফল রূপে যে কোন সংখ্যাকে অনেকভাবে দেখানো যায়। বল ভেক্টরের ক্ষেত্রে একই জিনিস করা সম্ভব। একটি বলকে যে কোন দুটি উপাংশে সামান্তরিকের নিয়ম অনুযায়ী বিভাজন করা যায়—সামান্তরিকের একটি বাহুকে ইচ্ছামত যে কোন দিকে নিলেই হবে। এটাও বোঝা যায়, প্রতিটি ভেক্টরকে একটি বহুভুজেও পরিণত করা সম্ভব।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বলকে প্রয়োজন মত একটি দিকে এবং তার লম্বদিকে দুটি উপাংশে বিভাজন করলে সুবিধা পাওয়া যায়। এগুলিকে বলের স্পর্শক এবং অভিলম্ব (লম্ব বরাবর) উপাংশ বলা হয়।

একটি আয়তক্ষেত্রে সন্নিহিত দুই বাহু বরাবর বলকে বিশ্লেষ করলে যে কোনও বিশ্লেষিত উপাংশকে সেই দিকে বলের প্রক্ষেপ বলা হয়।
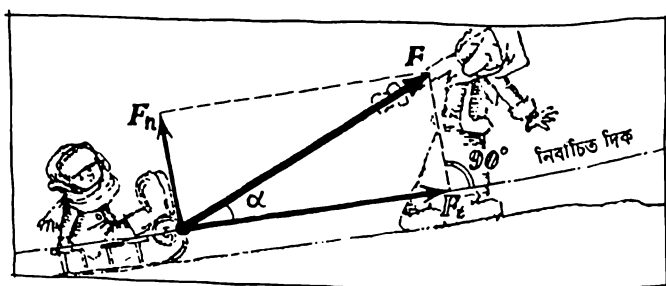
চিত্র 1.9

1·9 চিত্রে দেখা যাচ্ছে

$$F^2 = F_t^2 + F_n^2$$

এখানে F_t এবং F_n নির্বাচিত দিকে ও তার অভিলম্বদিকে বলের প্রক্ষেপ।

ত্রিকোণমিতি জানা থাকলে নিচের স্পর্শকটি সহজে বোঝা যায়

$$F_t = F \cos \alpha$$

এখানে α বল ভেক্টর ও নির্বাচিত দিকের অন্তর্গত কোণ।

পালতোলা নৌকার গতি বলের বিশ্লেষের একটি মজার উদাহরণ। বায়ুপ্রবাহের বিপরীতে নৌকাচালনার কায়দাটা কি? লক্ষ্য করলে

দেখবেন, নৌকা সোজা পথে না গিয়ে আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে চলে। এই ধরনের গতিকে মাঝিরা 'উজান বাওয়া' (tacking) বলে।

অবশ্য বায়ুপ্রবাহের বিপরীতে নৌকো চালনা প্রায় অসম্ভবই বলা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে একটা কোণ করে চললে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, কিন্তু কেন ?
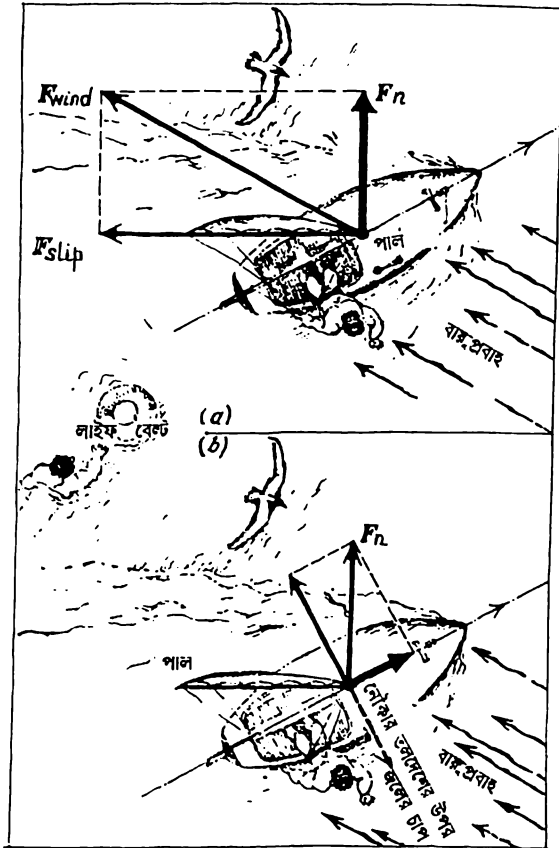
চিত্র 1.10

বায়ুপ্রবাহের বিরুদ্ধে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হলে দুটি পরিস্থিতি বিচার করতে হবে। বাতাস পালের তলের লম্বদিকে সর্বদা চাপ দিচ্ছে। 1·10*a*- চিত্রটি দেখুন, বায়ুর বেগকে দুটি উপাংশে ভাগ

করা হয়েছে—একটি F_{slip} পালের গা ঘেঁষে রয়েছে, এতে পালে কোন চাপ পড়ছে না ; কিন্তু লম্ব উপাংশটি পালের উপর চাপ দিচ্ছে।

তাহলে বায়ুপ্রবাহের অভিমুখে না চলে সামনের দিকে নৌকার এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কি করে ? ঘটনাটি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ নৌকার অগ্রভাগে কোন চাপ দিলে জলের প্রতিক্রিয়া খুব বেশী হয়। সেকারণে, পালের উপর প্রযুক্ত বলের কোন উপাংশ নৌকার দৈর্ঘ্য বরাবর কাজ করলে নৌকা সামনের দিকে গতিশীল হতে পারে। অবস্থাটি $1 \cdot 10a$ চিত্রে দেখানো হয়েছে।

এখন কোন্ বলের প্রভাবে নৌকাটি সামনের দিকে এগিয়ে চলে তা জানতে হলে বায়ুপ্রদত্ত বলকে দ্বিতীয়বার বিভাজন করা দরকার। অভিলম্ব উপাংশটিকে এজন্য নৌকার দৈর্ঘ্য বরাবর ও তার লম্বদিকে বিশ্লেষ করতে হবে। স্পর্শক উপাংশটির জন্যই নৌকা বায়ুপ্রবাহের অভিমুখের সঙ্গে একটি কোণ করে এগিয়ে চলে আর অভিলম্ব উপাংশটি নৌকার উপর জলের চাপে প্রশমিত হয়। পালটি এমন অবস্থানে রাখা হয় যাতে পালটির তল নৌকার গতিপথ ও বায়ুপ্রবাহের অন্তর্গত কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

নততল (Inclined planes)

ঢালু পথের চেয়ে খাড়াপথে ওঠা কঠিন। বস্তুকে সোজাসুজি উপরে তোলার চেয়ে নততলে গড়িয়ে তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ। এটা কেন হয় আর কতটুকু সুবিধা তাতে ? বলের যোগের নিয়ম উপরোক্ত ঘটনাবলি বুঝতে সাহায্য করে।
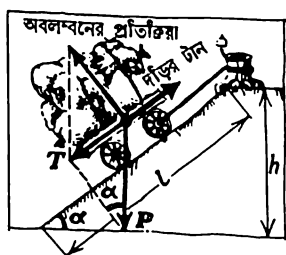
চিত্র 1,11

$1 \cdot 11$ চিত্রে একটি ওয়াগনকে নততল বরাবর দড়ি দিয়ে টেনে তোলার ঘটনা দেখানো হয়েছে। দড়ি দিয়ে টানা ছাড়া আরও দুটি

বল ওয়াগনের উপর ক্রিয়া করছে—এদের একটি ওয়াগনের ওজন এবং অন্যটি অবলম্বনের প্রতিক্রিয়া বল। অবলম্বনটি অনুভূমিক বা আনত, যাই হোক না কেন, এই প্রতিক্রিয়া সর্বদা তলের লম্ববরাবর ক্রিয়া করে আর সেকারণে এই বলকে লম্বপ্রতিক্রিয়া বলে।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে, কোন একটি বস্তু যখন কোন অবলম্বনের উপর থাকে, তখন অবলম্বন বস্তুর চাপকে প্রতিহত করে। এটাকেই আমরা প্রতিক্রিয়া বল বলি।

এখন আমরা জানতে চাইছি, ওয়াগনটি খাড়াভাবে তোলার চেয়ে নততল বরাবর টেনে তুললে ঠিক কতখানি সুবিধা পাওয়া যাবে ?

আমরা এমনভাবে বলগুলি বিভাজিত করব যাতে একটি উপাংশ তল বরাবর এবং অন্য উপাংশটি তলের লম্ববরাবর হয়। নততলে বস্তুর সাম্যাবস্থার ক্ষেত্রে দড়িবরাবর টান কেবলমাত্র স্পর্শক উপাংশকে প্রশমিত করে। দ্বিতীয় উপাংশটি তলের লম্বপ্রতিক্রিয়ায় প্রশমিত হয়।

আমাদের দড়িবরাবর টান T-এর মান বার করা দরকার। জ্যামিতিক অঙ্কন বা ত্রিকোণমিতি—যে কোন একটির সাহায্যেই তা করা যায়। জ্যামিতিক অঙ্কনের সাহায্যে করতে হলে ওজন ভেক্টর P-এর প্রান্তবিন্দু থেকে তলের উপর লম্ব টানতে হবে।

এই অঙ্কন থেকে দুটি সদৃশ ত্রিভুজ পাওয়া যাচ্ছে। নততলের দৈর্ঘ্য l এবং নততলের উচ্চতা h-এর অনুপাত বল-ত্রিভুজের সদৃশ বাহুদ্বয়ের অনুপাতের সমান। সুতরাং,

$$\frac{T}{P}=\frac{h}{l}$$

তলের নতি যত কম হবে (h/l-এর মান যত কম হবে) তত সহজে বস্তুকে উপরে টেনে তোলা যাবে।

ত্রিকোণমিতির সঙ্গে পরিচয় থাকলে নীচের আলোচনাটি সহজে বোঝা যাবে ঃ

যেহেতু বলের লম্ব-উপাংশ এবং ওজন ভেক্টরের অন্তর্গত কোণটি তলটির আনত কোণ বা নতির সমান, আমরা লিখতে পারি,

$$\frac{T}{P} = \text{Sin}\ \alpha, \quad \text{অর্থাৎ}, \ T = P\ \text{Sin}\ \alpha$$

সুতরাং, ওয়াগনটি খাড়াভাবে তোলার চেয়ে α-নতিসম্পন্ন তল বরাবর টেনে তুললে $1/\text{Sin}\ \alpha$ গুণ সুবিধা পাওয়া যায়।

30, 45 এবং 60 ডিগ্রী কোণের ক্ষেত্রে ত্রিকোণমিতিক কোণানু-

পাতগুলি মনে রাখার সুবিধা আছে। সাইন-এর ক্ষেত্রে মানগুলি জেনে (Sin $30° = \frac{1}{2}$; Sin $45° = \sqrt{\frac{2}{2}}$; Sin $60° = \sqrt{\frac{3}{2}}$) নততলে কতটা বলের সাশ্রয় হয়, তার পরিষ্কার হিসাব পাওয়া যায়।

আমাদের সূত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, 30° নতির জন্য বস্তুর ওজনের অর্ধেক বলের প্রয়োজন ঃ $T = P/2$। 45° এবং 60° কোণের ক্ষেত্রে, ওয়াগনের ওজনের যথাক্রমে 0·7 এবং 0·9 অংশ বলে টানতে হবে। দেখা যাচ্ছে, নততলের খাড়াই বাড়তে থাকলে সুবিধা কমতে থাকে (খুব বেশী খাড়াই তল দিয়ে আমাদের কাজের খুব একটা সুবিধা হবে না)।

2. গতিসূত্র

গতি সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ (Various points of view about motion)

মালপত্রের তাকে ছোট্ট চামড়ার ব্যাগটা রয়েছে। ট্রেনের সঙ্গে এটাও গতিশীল। মাটির উপরে বাড়ীটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, পৃথিবীর সঙ্গে এটাও গতিশীল। কোন বস্তু সরলরেখায় গতিশীল, না স্থির অবস্থায় রয়েছে, নাকি ঘুরছে—তার যে কোন একটি সত্যি হতে পারে। আবার সমস্ত উক্তিই সত্যি—যদি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে কেবলমাত্র বস্তুর গতিলেখই নয়, এর ধর্মগুলিও সম্পূর্ণ পৃথক বলে মনে হবে।

উত্তাল সমুদ্রে একটি জাহাজের অভ্যন্তরে জিনিসপত্রের কি হাল হয়, তা মানসচক্ষে দেখা যাক। বস্তুগুলির আচার-আচরণ ছন্নছাড়া অবাধ্যের মত মনে হবে। টেবিলের উপরে রাখা ছাইদানীটা উল্টে বিছানার নীচে মুখ গুঁজে রয়েছে। বোতলের জল চল্‌কে চল্‌কে উপচিয়ে পড়ছে, বাতিটা পেণ্ডুলামের মত দুলতে আরম্ভ করেছে। আপাতদৃষ্ট কারণ ছাড়াই কিছু বস্তু গতিশীল হয়েছে, অন্যেরা থেমে রয়েছে। এই জাহাজের কোন আরোহী হয়ত একথা বলতে পারেন—গতির মূল সূত্র হল, যে কোন মুহূর্তে লাগাম ছাড়া একটি বস্তু যে কোন দিকে যে কোন গতিবেগ নিয়ে চলতে শুরু করতে পারে।

এই উদাহরণের সাহায্যে বোঝা যায়, গতি সম্পর্কে যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ রয়েছে, তার মধ্যে এগুলি সবচেয়ে বিসদৃশ ও বিপজ্জনক।

তাহলে কোন্ দৃষ্টিকোণটি সবচেয়ে 'যুক্তি সঙ্গত' ?

কোন রকম কারণ ছাড়াই যদি হঠাৎ টেবিলের উপর রাখা বাতিটা ঝুঁকে পড়ে বা কাগজ-চাপাটা লাফ দেয়, তাহলে আপনার প্রথম প্রতিক্রিয়া হবে, আপনি যেন কল্পরাজ্যে রয়েছেন। এই সব বিচিত্র কাণ্ড-কারখানা আবার ঘটলে আপনি নিশ্চয়ই ব্যস্ত হয়ে এই সমস্ত বস্তুর স্থিতিশীলতা নষ্ট হওয়ার কারণ খুঁজতে শুরু করবেন।

বলের ক্রিয়া ব্যতিরেকে একটি স্থিতিশীল বস্তু সামান্যতম নড়াচড়াও করবে না—এই দৃষ্টিকোণ থেকে যখন গতির বিচার করা হয়, তখন স্বাভাবিক অর্থে তাকে যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ বলা হয়। দৃষ্টিকোণ

এরকম হলেই ভালো, কারণ এই দৃষ্টিকোণ অনুসারে বলা যায়, বস্তু যখন স্থির অবস্থায় রয়েছে তখন তার উপর ক্রিয়ারত বলসমূহের লব্ধি শূন্য আর বস্তুটি যখন গতিশীল হয় তখন বলের কারণেই তা ঘটে।

দৃষ্টিকোণটি একজন দর্শকের পূর্ব-উপস্থিতির ইঙ্গিত বহন করছে। যাইহোক, দর্শকটি সম্পর্কে আমাদের কোন কৌতূহল নেই, কিন্তু তার অবস্থানটি অবশ্যই জানা দরকার। সুতরাং 'গতি সম্পর্কে দৃষ্টিকোণ'-এর পরিবর্তে 'গতির ক্ষেত্রে নির্দেশতন্ত্র' বা সংক্ষেপে 'নির্দেশতন্ত্র'-র কথা এসে পড়ে।

পৃথিবীর উপরে আছি বলে আমাদের ক্ষেত্রে পৃথিবী একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশতন্ত্র। অবশ্য ভূপৃষ্ঠে গতিশীল বস্তু, যেমন, একটি জাহাজ বা ট্রেন, সময় বিশেষে আমাদের কাছে নির্দেশতন্ত্র হতে পারে।

গতির যুক্তিসঙ্গত 'দৃষ্টিকোণ' বলতে ইতিপূর্বে কি বলা হয়েছে সে কথায় ফিরে আসা যাক। এই নির্দেশতন্ত্রের একটি বিশেষ নাম আছে —একে জড়ত্বীয় (inertial) নির্দেশতন্ত্র বলে।

এই শব্দটি কোত্থেকে এল, আমরা একটু পরেই বুঝতে পারব।

সংজ্ঞানুযায়ী, একটি জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্রের ধর্মগুলি এই রকম : স্থিরবস্তু এই রকম একটি কাঠামো বা নির্দেশতন্ত্র সাপেক্ষে বলের কোনরূপ ক্রিয়া অনুভব করে না। সুতরাং বলের ক্রিয়া ব্যতিরেকে এই নির্দেশতন্ত্রে সামান্যতম গতিরও সৃষ্টি হবে না। এই সরল নির্দেশতন্ত্রের সুবিধা স্পষ্টই প্রতিয়মান। কোন গতির পর্যালোচনা সহজেই এর সাহায্যে করা যায়।

মনে রাখা দরকার, যে কোন জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্র থেকে পৃথিবীর সংশ্লিষ্ট কোন নির্দেশতন্ত্রের পার্থক্য খুব বেশী নয়। সুতরাং, পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা গতির প্রাথমিক নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু করতে পারি। তৎসত্ত্বেও, আমাদের মনে রাখতে হবে, পরবর্তী অনুচ্ছেদে প্রতিটি বিষয়ই সত্যিকারের জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্র অনুসারে আলোচনা করা হবে।

জড়তাসূত্র (The law of inertia)

জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্র অপরিসীম সুবিধা-সমন্বিত এবং উপযুক্ত— এ ব্যাপারে মত পার্থক্য নেই।

কিন্তু এরূপ নির্দেশতন্ত্র কি একমেবাদ্বিতীয়ম্, না সম্ভবত আরও অনেক জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্র রয়েছে? উদাহরণ স্বরূপ, প্রাচীন

গ্রীকেরা প্রথমোক্ত দৃষ্টিকোণকেই ব্যবহার করতেন। তাদের লেখাতে গতির কারণ সম্বন্ধে এর অনেক সরল প্রতিফলন দেখা যায়। অ্যারিস্টোটলের মধ্যে এই সমস্ত ধারণার পূর্ণতা দেখতে পাই। এই দার্শনিকের মতে, স্থির অবস্থা হল একটি বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থা, অবশ্যই পৃথিবীসাপেক্ষে। পৃথিবীসাপেক্ষে প্রতিটি সরণেরই একটি কারণ আছে—কারণটি একটি বল। একটি বস্তুকে গতিশীল রাখার পিছনে যদি কোন কারণই না কাজ করে তা হলে বস্তুটি অবশ্যই থেমে যাবে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। পৃথিবীসাপেক্ষে স্থির বলতে মোটামুটি এই বোঝায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী, পৃথিবীই একমাত্র জড়ত্বী নির্দেশতন্ত্র।

এই ভ্রান্ত অথচ সাদাসিধে ধ্যানধারণার অপ্রমাণ ঘটিয়ে সঠিক সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মহান ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি (1564-1642)-র কাছে আমরা ঋণী।

আসুন, আমরা গতি সম্পর্কে অ্যারিস্টোটল প্রদত্ত ব্যাখ্যা একটু বিচার করে দেখি এবং পৃথিবীতে বস্তুরাজির স্থিতিশীলতার কারণ গ্রহণ বা বর্জনের জন্য একই ধরনের ঘটনাবলী অনুসন্ধান করি।

কল্পনা করা যাক, কোনও এক প্রত্যুষে বিমানবন্দর থেকে আমরা এরোপ্লেনে চেপে আকাশে পাড়ি জমালাম। সূর্য তখনও বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করেনি, সুতরাং যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ঘটতে পারে এমন কোন ‘বাতাবকাশ’ নেই। প্লেনটি সাবলীল ভঙ্গিতে উড়ে চলেছে, এর গতি অনুভব করা যাচ্ছে না। জানালা দিয়ে বাইরে না তাকালে আপনি খেয়ালই করতে পারবেন না যে, আপনি উড়ে চলেছেন। খালি আসনের উপর একটি বই পড়ে আছে, টেবিলের উপর পরিত্যক্ত একটি আপেলও স্থির হয়ে রয়েছে। প্লেনের মধ্যে যাবতীয় বস্তুই গতিহীন। অ্যারিস্টোটল যদি সঠিক বলে থাকেন তাহলে কি বস্তুগুলি ইদৃশ আচরণ করত? অবশ্যই না। বস্তুতপক্ষে অ্যারিস্টোটলের মত অনুযায়ী পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থিতিশীলতাই হল বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থা। তাহলে এক্ষেত্রেই বা কেন সমস্ত জিনিসপত্র পিছনের দেওয়ালের দিকে সরে গিয়ে প্লেনের গতির বিরুদ্ধে স্তূপীকৃত হয়ে উঠবে না, কেনই বা ‘সত্যি-কারের’ স্থির অবস্থায় তারা ফিরে যেতে ‘চাইবে’ না? যে আপেলটি টেবিলের তলকে নামমাত্র স্পর্শ করে কয়েকশো কিলোমিটারের প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে—তার ক্ষেত্রেই বা ব্যাখ্যাটা কি দাঁড়াচ্ছে?

তাহলে গতির কারণ সম্পর্কে এবম্বিধ প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি? গতিশীল বস্তু কেমন করে স্থির অবস্থায় আসে—সে প্রশ্নেরই প্রথম বিচার
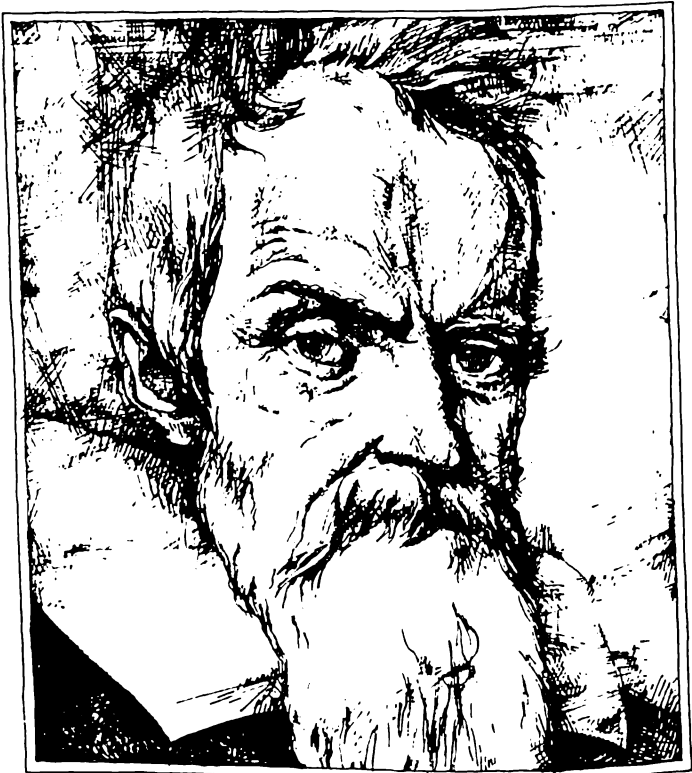
গ্যালিলিও গ্যালিলি (1564-1642)—প্রখ্যাত ইতালীয় বিজ্ঞানী, জ্যোতিবিদ এবং পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান পদ্ধতির জনক। তিনি জড়তা-ধর্মের প্রবর্তন, গতির আপেক্ষিকতা প্রতিষ্ঠা, অবাধ পতনের নিয়ম অনুসন্ধান, নততলে এবং অনুভূমিকের সঙ্গে নির্দিষ্ট কোণে নিক্ষিপ্ত বস্তুর গতির পর্যালোচনা করেন এবং সময়-হিসাবের জন্য পেণ্ডুলাম ব্যবহার করেন। মানবজাতির ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম দূরবীক্ষণের সাহায্যে মহাকাশ নিরীক্ষণ করেন, অনেক নক্ষত্র আবিষ্কার করেন আর সেই সঙ্গে প্রমাণ করেন, ছায়াপথ আসলে অসংখ্য নক্ষত্রের সমষ্টি মাত্র। তিনি বৃহস্পতির উপগ্রহ-সমূহ, সৌরকলঙ্ক এবং সূর্যের আবর্তনও আবিষ্কার করেন; চন্দ্রপৃষ্ঠের গঠন তিনিই প্রথম অনুসন্ধান করেন। কোপানিকাসের সৌরজগৎ সম্বন্ধীয় যে মতবাদ ক্যাথলিক চার্চ ভ্রান্ত অজুহাত দেখিয়ে নিষিদ্ধ বলে জারী করে, গ্যালিলিও সে মতবাদের সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। এজন্য বিচারকদের রায়ে এই মহান বিজ্ঞানীকে জীবনের শেষ দশটি বছর অসীম অত্যাচারের ক্লেশ বরণ করতে হয়।

করা যাক। যেমন; ভূপৃষ্ঠে গড়ানো একটি বল কেন থেমে যায়? ঠিক ঠিক উত্তর পেতে হলে বিচার করতে হবে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বলটি দ্রুত স্থির হয় আর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দেরীতে। এটি জানার জন্য বিশেষ কোন পরীক্ষা-ব্যবস্থার দরকার নেই। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, যে তলের উপর দিয়ে বলটি গড়িয়ে চলেছে তার মসৃণতা যত বেশী হবে, বলটি তত বেশীদূর পর্যন্ত গড়াবে। এটি এবং এজাতীয় অজস্র অভিজ্ঞতা থেকে গতির বাধাস্বরূপ ঘর্ষণ বলের সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই ধারণা জন্মে। বিভিন্ন উপায়ে এই ঘর্ষণ কমানো যেতে পারে। গতির যে কোন রোধকে নির্মূল করতে আমরা যত চেষ্টা করব (যেমন মসৃণতর রাস্তা নির্মাণ করে, ইঞ্জিনকে তৈলসিক্ত করে, বল বেয়ারিং ব্যবস্থা আরও উন্নত করে), তত বাহ্য-বলের প্রভাব কাটিয়ে বস্তু আরও স্বচ্ছন্দে বেশী দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে।

এই প্রশ্ন উঠতে পারে: কোন বাধা না থাকলে, ঘর্ষণ বল শূন্য করলে, কি হত? স্পষ্টতই, এরূপক্ষেত্রে গতি অনির্দিষ্ট কাল বজায় থাকত এবং এই গতি একই রেখা বরাবর সমদ্রুতিসম্পন্ন হত।

সর্বপ্রথম গ্যালিলিও যেভাবে জড়তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা প্রায় সেই ভঙ্গীতেই জড়তার সূত্র ব্যাখ্যা করলাম। কোন বাহ্য কারণ ছাড়াই কোন বস্তুর সরলরেখায় সমহারে গতিশীল........ হওয়ার সামর্থ্যকে এক কথায় জড়তা নাম দেওয়া যায়। এটি অ্যারিস্টোটলের সংজ্ঞার বিপরীত। এই মহাবিশ্বে প্রতিটি কণার হস্তান্তর-অযোগ্য একটি ধর্ম হল তার জড়তা।

এই গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটির সত্যতা আমরা কিভাবে প্রমাণ করতে পারি? বস্তুত, সর্বপ্রকার বলের প্রভাবশূন্য কোন গতি কার্যত সৃষ্টি করা অসম্ভব। যদি এটা সত্যিই করা সম্ভব হত তাহলে এর বিপরীত অবস্থাও দেখতে পেতাম। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, যখনই কোন বস্তুর গতিবেগের মান ও অভিমুখ পাল্টাবে, তখনই কোন না কোন বলকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

কোন বস্তু নীচের দিকে পড়তে থাকলে তার গতিবেগ বাড়তে থাকে, এর কারণ পৃথিবীর অভিকর্ষ। দড়ির এক প্রান্তে ঢিল বেঁধে ঢিলকে বৃত্তপথে ঘোরালে দড়ি বরাবর টান প্রতি মুহূর্তে ঢিলটিকে সরলরৈখিক পথ থেকে বিচ্যুত করে বৃত্তপথে চালনা করে। দড়িটা ছিঁড়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে ঢিলটা সেই মুহূর্তে যেদিকে গতিশীল থাকে সেদিক বরাবর

ছুটে যাবে। কোন অটোমোবাইলের ইঞ্জিন বিগড়ে গেলে তার গতি মন্দীভূত হয়ে যায়—তার কারণ বাতাসের বাধা, টায়ার এবং রাস্তার মধ্যে ঘর্ষণ এবং বল বেয়ারিং-এর ত্রুটি।

বস্তুর গতি সংক্রান্ত যাবতীয় পাঠের ক্ষেত্রে জড়তার সূত্র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান নেয়—একারণে জড়তার সূত্রকে গতিবিদ্যার স্তম্ভ বলা যেতে পারে।

গতি আপেক্ষিক (Motion is relative)

জড়তার সূত্র থেকে অনেক ধরনের জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্রের সৃষ্টি করা যেতে পারে।

কেবলমাত্র একটিই নয়, অসংখ্য জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্র 'কারণ বিহীন' গতির সম্ভাব্যতা বর্জন করে।

'কারণবিহীন' গতি যদি কোন নির্দেশতন্ত্রে পাওয়া যায়, তাহলে আমরা তখনই এরূপ অন্য একটি নির্দেশতন্ত্র তৈরী করতে পারি এবং এই দ্বিতীয় নির্দেশতন্ত্রটি প্রথম নির্দেশতন্ত্র সাপেক্ষে সমহারে সরলরেখায় (ঘূর্ণন ব্যতিরেকে) গতিশীল হবে। অধিকন্তু, একটি নির্দেশতন্ত্র অন্য আর একটি নির্দেশতন্ত্র থেকে যে একটু বেশী ভাল, তা নয়। অর্থাৎ অসংখ্য জড়ত্বীয় কাঠামোর মধ্য থেকে সবচেয়ে ভাল কাঠামো খুঁজে পাবার ব্যাপারটি আদৌ সম্ভব নয়। বস্তুর গতির নিয়মাবলী সমস্ত জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্রে অভিন্ন : একমাত্র বলের ক্রিয়াতেই বস্তু গতিশীল হতে পারে, বলের ক্রিয়াতেই তার গতি মন্দীভূত হয় এবং বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল কোন বল না থাকলে বস্তু স্থির থাকবে নতুবা সরলরেখায় সমহারে চলতে থাকবে।

কোন রকম পরীক্ষা করে কোন বিশেষ জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্রকে অন্য সব নির্দেশতন্ত্র থেকে আলোচনা করে চেনা সম্ভব নয়। সত্যটি গ্যালিলিওর আপেক্ষিকতা তত্ত্বকেই নির্দেশ করে এবং এই তত্ত্ব পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য সূত্র।

দুটি জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্রে দুজন পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ সদৃশ হলেও একই ঘটনার বিশ্লেষণে তাদের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যাবে। যেমন, একজন বললেন, তিনি চলমান ট্রেনের যে আসনটিতে বসে আছেন, তা সব সময়ই একই জায়গায় স্থির রয়েছে। প্ল্যাটফরমে দাঁড়ানো অন্য পর্যবেক্ষক তখন জোর দিয়ে বলবেন যে, আসনটি ক্রমাগত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় এগিয়ে চলেছে। কিংবা, কোন ব্যক্তি

রাইফেল দিয়ে গুলি ছুঁড়ে বললেন যে, গুলিটা 500 মিটার/সেকেণ্ড বেগে ছুটে চলেছে। সেখানে একই দিকে 200 মিটার/সেকেণ্ড বেগে ধাবমান অন্য একটি নির্দেশতন্ত্রের ব্যক্তির কাছে এই গতি কম বলে মনে হবে এবং সেক্ষেত্রে গতির মান হবে 300 মিটার/সেকেণ্ড।

দুজনের মধ্যে কোন্‌জন সঠিক ? দু জনেই। গতির আপেক্ষিকতা নীতি কোন একটি জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্রের প্রতি কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখায় না।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে, কোন স্থানের নির্দিষ্ট অংশ বা গতির বেগ সম্পর্কে কোনও শর্তহীন সত্যের (যেটাকে চরম সত্য বলা যেতে পারে) বর্ণনা করা যায় না।

দেশমাত্রার কোন বিশেষ অঞ্চল বা গতির বেগ সম্পর্কে ধারণা আপেক্ষিক। এরূপ আপেক্ষিক ধারণার কথা বলতে গেলে কোন্‌ জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্র সাপেক্ষে বলা হচ্ছে, তা খেয়াল রাখতে হবে।

যেহেতু একমাত্র 'সঠিক' দৃষ্টিকোণ বলে কিছু হতে পারে না, স্বভাবতই আপেক্ষিকতার ধারণাটি তার থেকেই জন্ম নেয়। কোন স্থানকে আমরা চরম স্থান বলতে পারতাম যদি আমরা তার মধ্যে কোন স্থির বস্তুর সন্ধান পেতাম—স্থির বলতে সকল পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকেই বস্তুকে স্থির হতে হবে। মোট কথা, এই অবস্থা পাওয়া সম্ভব নয়।

বস্তুসমন্বিত কোন স্থানের চিত্রটি সব সময় অবিকৃত নাও থাকতে পারে—দেশমাত্রা বা স্থানের আপেক্ষিকতা বলতে এটাই বোঝায়।

বিজ্ঞানে কিন্তু এই আপেক্ষিকতাবাদকে সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। নিউটনের মত অনন্যসাধারণ মেধার বিজ্ঞানীও স্থানকে চরম বলে মনে করতেন, যদিও তিনি জানতেন, তাঁর বিশ্বাসকে প্রমাণ করা শক্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্তও এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী বেশ কিছু সংখ্যক পদার্থবিজ্ঞানীর মধ্যে দেখা গেছে। আপাতদৃষ্টিতে এর কারণ মানসিক ছাড়া আর কি। আমাদের চারপাশে একই জায়গাকে নিয়ত নিশ্চল দেখতেই আমরা যে অভ্যস্ত।

গতির প্রকৃতি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণটি কি দাঁড়ায় তা এবার একটু হিসাবনিকাশ করে দেখা যাক।

কোন একটি নির্দেশতন্ত্রে দুটি বস্তু যদি V_1 এবং V_2 বেগে চলতে শুরু করে তাহলে তাদের বেগের পার্থক্য $V_1 - V_2$ নির্দেশতন্ত্র-এর পর্যবেক্ষকের কাছে সব সময় একই মনে হবে। কারণ, নির্দেশতন্ত্রের গতি পরিবর্তিত হলে V_1 এবং V_2-র মধ্যেও একই পরিবর্তন ঘটবে।

সুতরাং দুটি গতিবেগের ভেক্টর পার্থক্য চরম বলে ধরা যায়। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় অবকাশে বস্তুর বেগ ভেক্টরের বৃদ্ধিও চরম অর্থাৎ নির্দেশতন্ত্রের সকল পর্যবেক্ষকের কাছে এই বৃদ্ধি সমান।

নভোমণ্ডলের পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ (The point of view of a celestial observer)

গতির পর্যালোচনা জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্র সাপেক্ষে করা হবে বলে ঠিক করেছি। সেক্ষেত্রে নভোমণ্ডলের পর্যবেক্ষকের তথ্যসমূহ-এর কি কোন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে? বস্তুতপক্ষে, পৃথিবী তার আপন অক্ষের চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে আর সেই সঙ্গে সূর্যকেও প্রদক্ষিণ করছে। তথ্যটি উদ্ঘাটন করেন নিকোলাস কোপানিকাস (Nicolaus Copernicus) (1473-1543)। কোপানিকাসের আবিষ্কৃত এই যুগান্তকারী তত্ত্বের সত্যতা প্রচার করার জন্য কিভাবে জিওর্দানো ব্রুনোকে কাঠের আগুনে পুড়ে মরতে হয়েছিল, কিভাবে গ্যালিলিও-কে চরম অত্যাচার এবং নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল—সে সব ঘটনা আজকের দিনে পাঠকের উপলব্ধি করা বেশ কঠিন।

শেষ পর্যন্ত কিভাবে কোপানিকাসের প্রতিভা স্বীকৃত ও বন্দিত হয়েছিল? কেন আমরা পৃথিবীর আবর্তন ও পরিক্রমণের আবিষ্কার-কে আর মানবিক ন্যায়-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল মানুষের স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গের আদর্শকে পাশাপাশি রেখে বিচার করি?

জগতের দুটি প্রধান পদ্ধতির উপর কথোপকথন (*Dialogue on the Two Chief Systems of the World*) (টলেমিয় এবং কোপানিকাসীয়) গ্রন্থে গ্যালিলিও কোপানিকাসীয় পদ্ধতির বিরুদ্ধচারীর নাম দিয়েছেন 'সিমপ্লিসিও (Simplicio), সোজা কথায় যার অর্থ 'নির্বোধ ভালমানুষ'। অবশ্য বইখানি লেখার জন্য গ্যালিলিওকে সরকারী তদন্তকারীদের হাতে নিগৃহীত হতে হয়েছিল।

বাস্তবিকই, জগৎকে যদি একটা সহজ, সরাসরি পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষাপটে বিচার করা হয়, তাহলে কোপানিকাসীয় তত্ত্বকে পাগলামীই বলতে হয়। অবশ্য, এই পর্যবেক্ষণ সঠিক অর্থে 'সাধারণ জ্ঞান'-এর আলোকে করা হয়েছে—একথা বলা চলে না। পৃথিবী কি করে আবর্তন করতে পারে? এই তো, আমি দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবী নিশ্চল রয়েছে; বরং, সূর্য এবং নক্ষত্রাদি সত্যিকারেই গতিশীল।

কোপানিকাসের আবিষ্কারের প্রতি ধর্মবেত্তাদের মনোভাব কি রকম ছিল তা তাদের সম্মেলনের (1616) সিদ্ধান্ত থেকে জানা যায়ঃ

"সূর্য যে জগতের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এবং তা নিশ্চল, এই মতবাদ ভ্রান্ত, অসম্ভব, নীতিগতভাবে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী এবং বাইবেলের পরিপন্থী। এছাড়া পৃথিবী জগতের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত নয় এবং গতিশীল, অধিকন্তু এই গতির সঙ্গে দৈনিক আবর্তনও রয়েছে—এই মতবাদও মিথ্যা, দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভট এবং সর্বোপরি ধর্মশাস্ত্রের বিচারে অলীক কল্পনা।"

প্রকৃতির নিয়ম বোঝার মত জ্ঞানের অপ্রতুলতা এবং প্রচলিত ধর্মমতের অলঙ্ঘনীয় বাণীর প্রতি অবিচল বিশ্বাস আর তার সঙ্গে ভ্রান্ত 'সাধারণ জ্ঞান' যোগ হওয়ার ফলে যে সিদ্ধান্ত ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌গণ নিয়েছিলেন, তা অন্য যে কোন জিনিসকে বাগে আনতে পারে, কিন্তু কোপার্নিকাসের মানসিকতা ও আত্মবিশ্বাসের শক্তিকে বশ মানাতে পারে নি। সেই সঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মগুরুদের তথাকথিত 'সত্য'-কে চুরমার করতে এগিয়ে এসেছিলেন কোপার্নিকাসের দৃঢ়প্রত্যয়ী শিষ্যকুল ও উত্তরসূরীগণ।

আসুন, আমরা আবার আমাদের আগের প্রশ্নে ফিরে যাই।

পর্যবেক্ষকের গতিবেগ যদি পাল্টায় বা পর্যবেক্ষক যদি আবর্তন করে, তবে তার নাম 'সঠিক' পর্যবেক্ষকের তালিকা থেকে অবশ্যই বাদ পড়বে। সত্যি বলতে কি, পৃথিবীর উপরে যে কোন পর্যবেক্ষকই মোটামুটি এই অবস্থাতেই রয়েছে। যাই হোক, যদি পর্যবেক্ষকের গতিবেগ বা আবর্তনের তারতম্য কোন গতি-বিশ্লেষণের সময়কালে খুবই সামান্য হয়, তাহলে এই পর্যবেক্ষককে আমরা শর্তসাপেক্ষে 'সঠিক' পর্যবেক্ষক বলে গণ্য করতে পারি। ভূপৃষ্ঠে একজন পর্যবেক্ষকের ক্ষেত্রে কি এই শর্ত খাটবে ?

এক সেকেণ্ড সময়ে পৃথিবী এক ডিগ্রীর $\frac{1}{240}$ ভাগ বা প্রায় 0·00007 রেডিয়ান ঘুরে যায়। মানটি অবশ্যই বড় নয়। এজন্য বহু বড় বড় ঘটনার ক্ষেত্রে পৃথিবীকে মোটামুটি জড়ত্বীয় বলে ধরা যায়।

তথাপি, দীর্ঘকালস্থায়ী ঘটনার উল্লেখ করার সময় পৃথিবীর আবর্তন গতির কথা বিস্মৃত হলে চলবে না।

লেলিনগ্রাদে সেণ্ট আইজাক ক্যাথিড্রালের গম্বুজের ভিতরে একটা বৃহদাকৃতি পেণ্ডুলাম ঝোলানো আছে। এই পেণ্ডুলামকে দুলিয়ে দিলে অল্প ক্ষণের মধ্যেই দেখা যাবে, এর দোলনতল ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে। কয়েক ঘণ্টা পরে দোলনকাল স্পষ্টতই বেশ কিছুটা কোণে ঘুরে গেছে

বলে দেখা যায়। ফরাসী বিজ্ঞানী লিও ফুকো (Leon Foucault, 1819—1868), সর্বপ্রথম পেণ্ডুলাম নিয়ে এই ধরনের অনেক পরীক্ষা করেন। সেই সময় থেকেই, বলতে গেলে, তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।
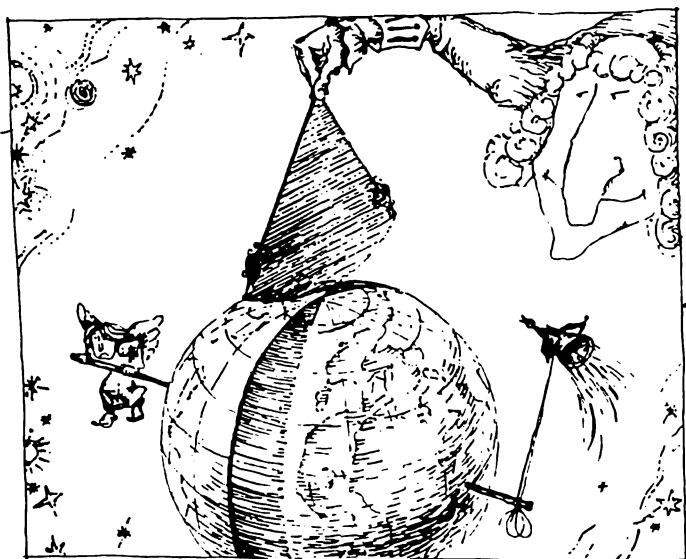
চিত্র 2.1

ফুকোর পরীক্ষাটি পৃথিবীর আবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে পরিগণিত হয় (চিত্র 2·1)।

এইভাবে পরীক্ষাধীন গতি যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে আমাদের বাধ্য হয়েই পৃথিবীর পর্যবেক্ষকের দেওয়া তথ্য বর্জন করতে হবে, আর সেই সঙ্গে ভিত্তি হিসাবে সূর্য এবং নক্ষত্রমণ্ডলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্দেশতন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। যাই হোক, বাস্তবক্ষেত্রে কোপার্নিকাসের নির্দেশতন্ত্র পুরোপুরি জড়ত্বীয় নয়।

মহাবিশ্ব অসংখ্যকোটি তারকামণ্ডল নিয়ে গঠিত—এগুলি যেন মহাবিশ্বের এক একটি দ্বীপ। এদের ছায়াপথ বলে। আমাদের সৌর-মণ্ডল যে ছায়াপথের অন্তর্গত, তার মধ্যে প্রায় এক হাজার কোটি নক্ষত্র রয়েছে। প্রায় 180 মিলিয়ন বৎসর পর্যায়কাল আর 250 কি. মি./সেকেণ্ড বেগ নিয়ে সূর্য এই ছায়াপথের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছে।

সৌর পর্যবেক্ষককে জড়ত্বীয় ধরে নিলে কতটা ভুল হবে ?

ভূ-পর্যবেক্ষক এবং সৌর-পর্যবেক্ষকের সুবিধাগুলির তুলনামূলক বিচার করতে হলে সৌরনির্দেশতন্ত্র এক সেকেণ্ডে কতটা কোণে ঘুরে যায় তার হিসাব করা দরকার। প্রতি 180×10^6 বৎসরে (6×10^{15} সেকেণ্ডে) যদি একবার পূর্ণ আবর্তন ঘটে, তবে প্রতি সেকেণ্ডে সৌর নির্দেশতন্ত্র 6×10^{-14} ডিগ্রী অর্থাৎ 10^{-15} রেডিয়ান পরিমাণ কোণে ঘুরে যায়। সুতরাং বলা যায়, ভূ-পর্যবেক্ষকের তুলনায় সৌর-পর্যবেক্ষক এক হাজার কোটিগুণ 'ভাল'।

আরও ভাল জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্রের জন্য মহাকাশচারিগণ বেশ কয়েকটি ছায়াপথকে ভিত্তি করে নির্দেশতন্ত্র গঠন করেন। সম্ভাব্য সকল প্রকার নির্দেশতন্ত্রের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বেশী জড়ত্বীয়। এর থেকেও ভাল নির্দেশতন্ত্র পাওয়া কার্যত অসম্ভব।

দুই অর্থে মহাকাশচারীদের নক্ষত্র-নিরীক্ষক বলা যায়ঃ তারা নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করেন এবং নক্ষত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে মহাকাশের বস্তুর গতি বর্ণনা করেন।

ত্বরণ ও বল (Acceleration and force)

যে সব গতিবেগ স্থিরমানের নয়, তাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পদার্থবিদেরা ত্বরণের ধারণার প্রবর্তন করেছেন।

একক সময়ে গতিবেগের পরিবর্তনকে **ত্বরণ** বলে। "একটি বস্তুর গতিবেগ এক সেকেণ্ডে a পরিমাণ পরিবর্তিত হচ্ছে", এরকম না বলে, আমরা আরও সংক্ষেপে বলি, 'বস্তুটির ত্বরণ a'।

আমরা যদি কোন সরলরৈখিক গতির প্রাথমিক বেগকে v_1 এবং তার পরের মুহূর্তের বেগকে v_2 দিয়ে সূচিত করি, তবে ত্বরণের হিসাব করার নিয়মটি আমরা নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করি,

$a = \frac{v_2 - v_1}{t}$, এখানে, t গতিবেগবৃদ্ধির সময়কাল নির্দেশ করে।

বেগ সে.মি./সেকেণ্ড (বা মিটার/সেকেণ্ড) এবং সময় সেকেণ্ডে পরিমাপ করা হয়। সুতরাং, ত্বরণ সে.মি./সেকেণ্ড প্রতি সেকেণ্ডে— এককে আসবে। প্রতি সেকেণ্ডে কয়েক সেণ্টিমিটারকে সেকেণ্ড দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে। সুতরাং ত্বরণের একক দাঁড়াচ্ছে, সে.মি./সেকেণ্ড^2 (বা মিটার/সেকেণ্ড^2)।

অবশ্য, গতিকালে ত্বরণের পরিবর্তন ঘটতে পারে। যাইহোক,

অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ টেনে এখানে জটিলতা বাড়াবো না। আপাতত, এটা ধরে নেওয়া যাক, গতিশীল বস্তুর বেগ সমহারে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই রকম গতিকে সমত্বরণযুক্ত গতি বলে।

বক্রগতির ক্ষেত্রে ত্বরণ কি রকম হবে?

যেহেতু, বেগ একটি ভেক্টর রাশি, বেগের পরিবর্তন (পার্থক্য) ও ভেক্টর রাশি, অর্থাৎ ত্বরণও একটি ভেক্টর রাশি। ত্বরণ ভেক্টর বার করতে হলে বেগ দুটির ভেক্টর পার্থক্যকে সময় দিয়ে ভাগ করতে হবে। বেগের ভেক্টর পরিবর্তন কিভাবে করতে হয় তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।
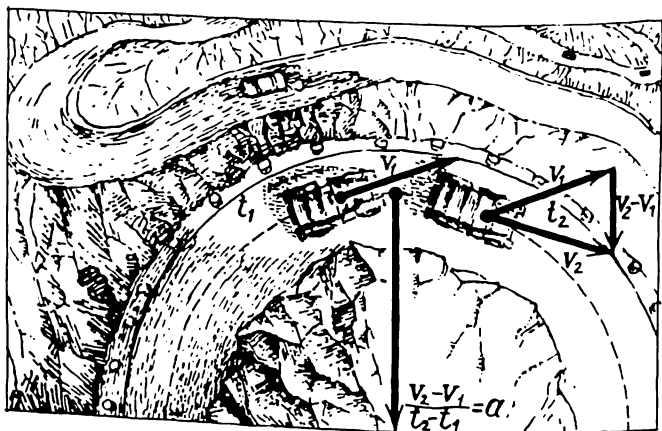
চিত্র 2.2

লম্বা রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে। একটা গাড়ীর দুটি কাছাকাছি অবস্থানের বেগকে ভেক্টর দিয়ে সূচিত করা হয়েছে (চিত্র 2·2)। ভেক্টর দুটির যে বিয়োগফল পাওয়া যাচ্ছে, তা কিন্তু কোনভাবেই শূন্য নয়। একে অতিবাহিত সময় দিয়ে ভাগ করলে ত্বরণ ভেক্টর পাওয়া যাবে। বাঁকাপথে চলার সময় দ্রুতি না পাল্টালেও কিন্তু ত্বরণ ঘটছে। দেখা যাচ্ছে, বক্রগতি সবসময়েই ত্বরণযুক্ত। কেবল সমহার সরল-রৈখিক গতি ত্বরণহীন।

এর আগে বস্তুর বেগের কথা বলতে গিয়ে গতি সম্পর্কে দৃষ্টিকোণ সবসময়ই ঠিক করে নিয়েছিলাম। বস্তুর বেগ আপেক্ষিক। একটি

জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্র সাপেক্ষে এই বেগ খুব বেশী, আবার অন্য একটি সাপেক্ষে এই বেগ খুব কম হতে পারে। ত্বরণের ক্ষেত্রেও আমরা কি একই ধরনের পরিভাষণ করে নিতে পারি না? অবশ্যই না। বেগের মত ত্বরণ আপেক্ষিক নয়, বরং চরম। সকল সম্ভাব্য এবং কল্পনীয় জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে ত্বরণ অভিন্ন হবে। বস্তুত, বস্তুর প্রথম ও দ্বিতীয় মুহূর্তের বেগ-পার্থক্যের উপর ত্বরণ নির্ভর করে এবং আমরা আগেই জেনেছি, এই পার্থক্য সকল দৃষ্টিকোণে সমান, তার অর্থ ত্বরণ চরম।

বস্তুর উপর কোন বল কাজ না করলে তখনই কেবল বস্তুটি ত্বরণ-হীন গতিবেগে চলে। উল্টোটা হল, বস্তুর উপর বলের ক্রিয়ায় বস্তুর ত্বরণ ঘটে, অধিকন্তু, বল যত বেশী হয়, ত্বরণও তত বেশী হয়। একটি বোঝাই ওয়াগনকে যত দ্রুত আমরা ছুটিয়ে নিতে চাই, তত বেশী আমাদের পেশীকে জোর খাটাতে হয়। নিয়ম হল, গতিশীল বস্তুর উপর দুটি বল কাজ করে; একটি ত্বরণসৃষ্টিকারী—টান এবং অন্যটি মন্দনসৃষ্টিকারী—ঘর্ষণ বল বা বাতাসের বাধা।

এই দুই বলের পার্থক্য, যাকে আমরা লব্ধি বলি, তার অভিমুখ গতির দিকে বা গতির বিপরীতে হতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই লব্ধি-বল গতিকে মন্দীভূত করে। এই দুই বিপরীতমুখী বল পরস্পরের সমান হলে বস্তুটি সমান বেগে চলতে থাকবে—মনে হবে কোন বলই যেন এর উপর কাজ করছে না।

বল যে পরিমাণ ত্বরণ সৃষ্টি করে তার সঙ্গে বলের সম্পর্ক কি? খুবই সহজ। ত্বরণ বলের সমানুপাতিক ঃ

$$a \propto F$$

('$\propto$' চিহ্নটি সমানুপাতিক বোঝাতে ব্যবহৃত হয়)

আর একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বাকী রয়েছে ঃ কোন একটি বলের অধীনে ত্বরিত হবার ব্যাপারে বস্তুর ধর্মগুলি কিভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে? কারণ, এটা পরিষ্কার দেখা যায়, এক এবং অভিন্ন বলের অধীনে বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন ত্বরণ ঘটে।

সকল বস্তুই একই ত্বরণে পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়—এই বিশেষ ঘটনাটির কারণ খুঁজে দেখা যাক। 'g' অক্ষরটি দ্বারা এই ত্বরণকে সূচিত করা হয়। মস্কো অঞ্চলে $g = 980$ সে.মি./সেকেণ্ড^2।

সকল বস্তুর ক্ষেত্রে ত্বরণের এই স্থির মান সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রথমেই নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যাবে না। কারণ, যখন

একটি বস্তু সাধারণ অবস্থায় নীচে পড়তে থাকে, তখন অভিকর্ষ ছাড়া আর একটি 'বাধাদানকারী' বল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে—এটি বাতাসের বাধা। হাল্কা এবং ভারী বস্তুর নীচে পড়ার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য দেখা যায় তাতে প্রাচীন দার্শনিকগণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়তেন। এক টুকরো লোহা দ্রুত নীচে পড়ে কিন্তু একটা পালক পড়ে হেলেদুলে। এক পাতা কাগজ ধীরে মাটিতে নামে, কিন্তু যদি এটাকে গোল করে পাকিয়ে নেওয়া হয় তাহলে একই পরিমাণ কাগজ বেশ তাড়াতাড়ি নীচে পড়ে। পৃথিবীর আকর্ষণে বস্তুর গতির 'যথার্থ' চিত্র বায়ুমণ্ডলের দ্বারা যে বিকৃত হয়ে যায়, সে তথ্যটি প্রাচীন গ্রীকেরা বহু আগেই বুঝেছিলেন। তা সত্ত্বেও, ডিমোক্রিটাস মনে করতেন, বাতাসকে যদি সরিয়ে দেওয়া সম্ভবও হত, তাহলেও ভারী বস্তু সব সময়ই হাল্কা বস্তুর তুলনায় আগে নীচে পড়ত। কিন্তু বাতাসের বাধায় বিপরীত ঘটনাও ঘটতে পারে, যেমন, অ্যালুমিনিয়মের একটি পাতলা চাদর (না গুটানো) একটি দলাপাকানো কাগজের বলের থেকে অনেক ধীরে নীচে পড়বে।

প্রসঙ্গত বলা যায়, এত সরু (কয়েক মাইক্রন) করে ধাতব তার তৈরী করা হচ্ছে যে, সেটা বাতাসের মধ্যে পালকের মতোই ধীরে ধীরে নামবে।

অ্যারিস্টোটল মনে করতেন, শূন্যের মধ্যে সকল বস্তুরই একই-ভাবে পড়া উচিত। যাই হোক, এই তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের দ্বারা তিনি এরূপ কূট মন্তব্যটি করেন : "একই সঙ্গে বিভিন্ন বস্তুর নীচে পড়া এতই অবাস্তব ব্যাপার যে, তা থেকে শূন্যের অস্তিত্বের অসম্ভাব্যতা প্রমাণ হয়।"

প্রাচীন বা মধ্যযুগের কোন বিজ্ঞানী তখন ভাবতেই পারেননি যে, বিভিন্ন বস্তু পৃথিবীর দিকে একই ত্বরণে না বিভিন্ন ত্বরণে পড়বে তা একদিন পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হবে। একমাত্র গ্যালিলিও তাঁর স্মরণীয় পরীক্ষার (নততলে বস্তুর গতি এবং পিসার হেলানো মিনারের শীর্ষ থেকে বিভিন্ন বস্তু ফেলে তাদের গতি তিনি পরীক্ষা করেন) সাহায্যে দেখান যে, ভূপৃষ্ঠের একই বিন্দুতে সকল বস্তু একই ত্বরণ নিয়ে নীচে পড়ে, তাদের ভর যাই হোক না কেন। বর্তমানকালে একটি লম্বা নলের সমস্ত বাতাস বার করে নিয়ে এই ধরনের পরীক্ষা সহজেই করা যায়। এই ধরনের নলের মধ্যে একটা পালক ও একটা পাথরের টুকরো একই সঙ্গে নীচে নেমে আসে। এখানে একটিই মাত্র বল কাজ করে এবং সেটি বস্তুদ্বয়ের নিজের নিজের ওজন। বাতাসের বাধা শূন্য

করে দেওয়া হয়েছে। বাতাসের বাধা যেখানে নেই সেখানে বস্তু সমত্বরণে নীচে পড়ে।

উত্থাপিত প্রশ্নটিতে এবার ফেরা যাক। গতিশীল বস্তুর ত্বরণ ঘটার বিষয়টি কিভাবে বস্তুর ধর্মের উপর নির্ভর করে ?

গ্যালিলিও-র সূত্র বলে, ভর যাই হোক না কেন, সমস্ত বস্তুই এক এবং অভিন্ন ত্বরণে নীচে পড়ে। সুতরাং F কিলোগ্র্যাম বল (kgf)-এর অধীনে m কিলোগ্র্যাম ভরসম্পন্ন বস্তুর নিম্নাভিমুখী ত্বরণ g হবে।

ধরা যাক্, এবারে পতনশীল বস্তুর কথা বলছি না এবং m কিলোগ্র্যাম ভরের উপর 1 কিলোগ্রাম বল (kgf) ক্রিয়া করছে।

যেহেতু ত্বরণ বলের সমানুপাতিক, সুতরাং এটির ত্বরণ g থেকে m-তম কম হবে।

আমরা তাহলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি, একটি নির্দিষ্ট বলের ক্ষেত্রে (আমাদের উদাহরণে 1 কিলোগ্রাম বল) কোন বস্তুর ত্বরণ a, বস্তুর ভরের ব্যস্তানুপাতিক।

দুটিকে একসঙ্গে প্রকাশ করে লেখা যায় ;

$$a \propto F/m$$

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট ভরের ক্ষেত্রে ত্বরণ বলের সমানুপাতিক এবং বল নির্দিষ্ট থাকলে ভরের ব্যস্তানুপাতিক।

নির্দিষ্ট ভরের বস্তুর ত্বরণের সঙ্গে বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বলের সম্পর্ক নিয়ে উপরোক্ত সূত্রটি প্রখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন (1643-1727) আবিষ্কার করেন এবং তাঁর নামেই সূত্রটি পরিচিত।*

ত্বরণ ক্রিয়ারত বলের সমানুপাতিক এবং বস্তুর ভরের ব্যস্তানুপাতিক, সেই সঙ্গে বস্তুর আর কোন ধর্মের উপর নির্ভর করে না। নিউটনের সূত্র থেকে বলা যায়, বস্তুর ভরই তার 'জড়তার' পরিমাপক। সমান বল প্রয়োগ করে বেশী ভরের বস্তুর ত্বরণ সৃষ্টি করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। দেখতে পাচ্ছি, যে ভরকে আমরা তুলাদণ্ডের ওজন থেকে পাওয়া 'শিষ্ট' রাশি বলে জানতাম, তা নতুন ও গভীরতর অর্থ বহন করছে : ভর বস্তুর গতীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

* নিউটন দেখিয়েছিলেন, বস্তুর গতি তিনটি সূত্র মেনে চলে। যে সূত্রটি আমরা এখানে আলোচনা করছি তা নিউটনের তালিকায় দ্বিতীয় সূত্র বলে পরিচিত। জড়তার সূত্রকে নিউটন প্রথম সূত্র এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্রকে তৃতীয় সূত্র নামে অভিহিত করেন।

নিউটনের সূত্রকে এভাবে লেখা যায় ঃ

$$kF = ma$$

এখানে k একটি ধ্রুবক। এই গুণাঙ্কের মান ব্যবহৃত এককের উপর নির্ভর করে।

ইতিপূর্বে আমরা বলের যে একক (kgf-কিলোগ্রাম বল) পেয়েছি তা ব্যবহার না করে অন্যভাবে আলোচনা করা যাক। পদার্থবিদেরা প্রায় সবক্ষেত্রেই যা করে থাকেন, আমরা এখানেও ঠিক তেমনি বলের একক এমনভাবে নির্বাচন করব যাতে ভেদের ধ্রুবকটি এককে পরিণত হয়। তাহলে নিউটনের সূত্রটি নীচের রূপ নেবে ঃ

$$F = ma$$

আগেই বলা হয়েছে, পদার্থবিজ্ঞানে ভর গ্রামে, দূরত্ব সেণ্টিমিটারে এবং সময় সেকেণ্ডে মাপা হয়। এই তিন প্রাথমিক রাশির উপর নির্ভর করে যে একক-পদ্ধতি গড়ে উঠেছে তাকে সি. জি. এস. পদ্ধতি বলে।

উপরের সূত্রবদ্ধ নীতি অনুসারে আমরা এখন বলের একক নির্বাচন করতে পারি। যে বল 1 গ্রাম ভরের উপর ক্রিয়া করে 1 সে.মি./সেকেণ্ড^2 ত্বরণ সৃষ্টি করতে পারে, তাকেই আমরা একক বলের সমান বলতে পারি। এই পদ্ধতিতে, এই পরিমাণ বলের নাম দেওয়া হয়েছে ডাইন (dyne)

নিউটনের সূত্রানুসারে $F = ma$, যদি আমরা m গ্রামকে a সে.মি./সেকেণ্ড^2 দিয়ে গুণ করি তবে বলকে ডাইনে প্রকাশ করা যাবে। যে কেউ স্বচ্ছন্দে নীচের অঙ্কপাতনটি ব্যবহার করতে পারেন।

1 ডাইন = 1 গ্রাম-সে.মি./সেকেণ্ড^2

বস্তুর ওজন সাধারণত P অক্ষর দ্বারা সূচিত করা হয়।

P পরিমাণ বল বস্তুকে g পরিমাণ ত্বরণ দেয়। সুতরাং ডাইনে আমরা অবশ্যই এভাবে লিখতে পারি

$$P = mg$$

কিন্তু এর আগেই আমরা একটি একক পেয়েছি, সেটি কিলোগ্রাম বল (kgf)। শেষের সূত্রটি থেকে সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো এবং নতুন একক দুটির সম্পর্কটি খুঁজে পাচ্ছি ঃ

1 কিলোগ্রাম বল = 981000 ডাইন।

এক ডাইন খুব ক্ষুদ্র পরিমাণ বল। এটি প্রায় এক মিলিগ্রাম বস্তুর ওজনের সমান।

স্যার আইজাক নিউটন (Sir Isaac Newton, 1643—1727)—তীক্ষ্ণধী ইংরেজ পদার্থবিদ এবং অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ, মানবজাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অন্যতম। গতিবিদ্যার নিয়ম ও প্রাথমিক নিয়মাবলী তিনি সূত্রাকারে গ্রথিত করেন ; চিরন্তন মহাকর্ষসূত্র আবিষ্কার করেন এবং এর সাহায্যে জগৎ প্রকৃতির যে চিত্র তুলে ধরেন তা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত সংপ্রশ্নের অতীত ছিল। তিনি নভোমণ্ডলীয় বস্তুরাজির গতিতত্ত্ব আবিষ্কার করেন, চন্দ্রের গতির গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগুলি ব্যাখ্যা করেন এবং সেই সঙ্গে জোয়ার-ভাটার কারণও ব্যাখ্যা করেন। আলোকবিজ্ঞানেও তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার রয়েছে, যার ফলে এই শাখার দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। গাণিতিক নিয়মে প্রকৃতির বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য তিনি একটি শক্তিশালী পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। অবকলন ও সমাকলন বিদ্যার আবিষ্কারের সম্মান তাঁরই প্রাপ্য। পরবর্তীকালে, পদার্থবিদ্যার সামগ্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে কলনবিদ্যা প্রভূত কার্যকরী বলে পরিগণিত হয়েছে এবং এর ফলেই গবেষণার ক্ষেত্রে গণিতভিত্তিক পদ্ধতির সূচনা ঘটেছে।

একক পদ্ধতির (S I) কথা আগেই বলা হয়েছে। বলের নতুন এককের নামকরণ নিউটন (N) হওয়ার দাবি যথার্থ। এককের এরূপ নির্বাচনের ফলে নিউটনের সূত্র যথাসম্ভব সরলরূপ পেয়েছে। এই নতুন এককের সংজ্ঞা এইভাবে করা যায়,

$$1\text{N} = 1 \text{ কিলোগ্রাম-মিটার/সেকেণ্ড}^2$$

অর্থাৎ, 1 কিলোগ্রাম ভরের উপর 1 মিটার/সেকেণ্ড^2 ত্বরণ সৃষ্টি করতে যে পরিমাণ বল লাগে তাকে 1N বলে। ডাইন এবং কিলোগ্রাম বলের সঙ্গে এই নতুন এককের সম্বন্ধ নির্ণয় করা কঠিন নয় ঃ

$$1\text{N} = 100000 \text{ ডাইন} = 0{\cdot}102 \text{ কিলোগ্রাম বল।}$$

স্থির ত্বরণযুক্ত সরলরৈখিক গতি (Rectilinear motion with constant acceleration)

নিউটনের সূত্রানুসারে, বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বলের লব্ধি অপরিবর্তিত থাকলে বস্তু স্থির ত্বরণ লাভ করে।

বেশীর ভাগ গতির ক্ষেত্রে এই অবস্থা দেখা যায়, অবশ্য প্রায়-কাছাকাছি অর্থে ঃ একটি গাড়ীর মোটর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মোটামুটি স্থিরমানের ঘর্ষণের জন্য গাড়ীর গতি মন্দীভূত হয়ে থাকে ঃ ভারী বস্তু উঁচু থেকে স্থির অভিকর্ষ বলের প্রভাবে নীচে নামতে থাকে।

লব্ধি-বলের পরিমাণ এবং বস্তুর ভর জানা থাকলে $a = F/m$ সূত্র থেকে আমরা ত্বরণের মান বার করতে পারি। কারণ

$$a = \frac{v - v_0}{t}$$

এখানে t গতির ব্যাপ্তিকাল, v চূড়ান্ত বেগ এবং v_0 প্রাথমিক বেগ। এই সূত্রের সাহায্যে নীচের এক রাশি প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় ঃ মন্দন সৃষ্টিকারী বল, ভর এবং প্রাথমিক বেগ জানা থাকলে একটি ট্রেন স্থির হওয়ার আগে পর্যন্ত কতদূর যাবে ? কিংবা, একটি গাড়ীর ক্ষেত্রে যদি মোটরের ক্ষমতা, বাধা, গাড়ীর ভর এবং ত্বরণের সময়কাল জানা থাকে, তাহলে গাড়ীটি কতটা বেগ সঞ্চয় করবে ?

সমত্বরণে গতির ক্ষেত্রে একটি বস্তু কতটা দূরত্ব অতিক্রম করবে তা আমাদের প্রায়ই জানার দরকার পড়ে। সুষম গতির ক্ষেত্রে, গতিবেগকে সময় দিয়ে গুণ করলে অতিক্রান্ত দূরত্ব পাওয়া যায়। সমত্বরণে গতির ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত দূরত্বের হিসাব এভাবে করা হয়—বস্তুটি যেন গতির প্রাথমিক এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের বেগের সমষ্টি অর্ধেক নিয়ে একই সময় t ধরে চলেছে ঃ

$$s = \tfrac{1}{2}(v_0 + v)t$$

সুতরাং সমত্বরণে (বা মন্দনে) গতির ক্ষেত্রে প্রাথমিক এবং চূড়ান্ত বেগের গড় মান ও সময়ের গুণফল অতিক্রান্ত দূরত্বের সমান হয়। সুষম গতির ক্ষেত্রে বেগ $(v_0+v)/2$ হলে একই সময়ে ঐ দূরত্ব অতিক্রম করা যায়। এর থেকে বলা যায়, সমত্বরণের ক্ষেত্রে গড় গতিবেগ হল $(v_0+v)/2$।

এর সাহায্যে অতিক্রান্ত দূরত্ব ত্বরণের উপর কিভাবে নির্ভর করে তার একটি সূত্র আমরা নির্ধারণ করতে পারি, সে সূত্রটিতে $v=v_0+at$ বসিয়ে পাই

$$s=v_0t+\frac{1}{2}at^2$$

অথবা, গতির প্রাথমিক বেগ শূন্য হলে

$$s=\frac{1}{2}at^2$$

যদি কোন বস্তু প্রথম সেকেণ্ডে পাঁচমিটার যায়, তাহলে দুই সেকেণ্ডে বস্তুটি (4×5) মিটার, তিন সেকেণ্ডে (9×5) মিটার—এইভাবে দূরত্ব অতিক্রম করবে। সময়ের বর্গের সমানুপাতে অতিক্রান্ত দূরত্ব বাড়ছে।

উঁচু থেকে একটি ভারী বস্তু পতনের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম খাটে। অবাধ পতনের ক্ষেত্রে ত্বরণ g-এর সমান, সেক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটি দাঁড়াচ্ছে ঃ

$$s=\frac{9\cdot81}{2}t^2,$$

যদি t-কে সেকেণ্ডে এবং g-কে সে.মি/সেকেণ্ড^2-এ প্রকাশ করা হয়।

কোন বস্তু যদি বাধাহীনভাবে নীচে 100 সেকেণ্ড ধরে পড়ে তাহলে বস্তুটি পতনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করে—প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার। বস্তুটি প্রথম দশ সেকেণ্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তার পরিমাণ মাত্র 0·5 কিলোমিটার—এর থেকে ত্বরণ যুক্ত গতি বলতে কি বোঝায় তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে পড়ার সময় কোন বস্তু কতটা গতিবেগ লাভ করে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে অতিক্রান্ত দূরত্বের সঙ্গে বস্তুর ত্বরণ ও বেগের সম্পর্কের সূত্র আমাদের জানা দরকার।

$s=\frac{1}{2}(v_0+v)t$ সমীকরণে গতির ব্যাপ্তিকাল $t=(v-v_0)/a$ বসিয়ে পাই,

$$s=\frac{1}{2a}(v^2-v_0^2)$$

বা, প্রাথমিক বেগ শূন্য হলে

$$s=\frac{v^2}{2a}, \quad v=\sqrt{2as}$$

একটি ছোট দোতলা বা তিনতলা বাড়ীর উচ্চতা দশ মিটারের মত। এইরকম নীচু বাড়ীর ছাত থেকেও নীচে মাটিতে লাফিয়ে পড়া বিপজ্জনক কেন? সহজ অঙ্ক কষে দেখা যায়, এই ক্ষেত্রে অবাধ পতনজনিত উৎপন্ন বেগ শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায়, $v=\sqrt{2\times 9{\cdot}8\times 10}$ মিটার/সেকেণ্ড $=14$ মি./সেকেণ্ড $=50$ কি.মি./ঘণ্টা, এবং মোটামুটি এই সীমার মধ্যেই শহরে গাড়ী চালানোর নির্দেশ দেওয়া থাকে।

বাতাসের বাধায় এই বেগ এমন কিছু কমবে না।

যে সমস্ত সূত্র এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, বিভিন্ন গণনার ক্ষেত্রে সেগুলি প্রায়স ব্যবহার করা হয়। এই সূত্রগুলির সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠে গতির অবস্থা কেমন হবে তা বার করা যাক।

এইচ. জি. ওয়েলসের **চাঁদে প্রথম মানব** (*The First Men in the Moon*) উপন্যাসে আমরা পড়েছি, অভিযাত্রীরা এই চমকপ্রদ অভিযানে অনেক আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। পৃথিবীর তুলনায় চন্দ্রপৃষ্ঠে ত্বরণের মান প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ। পৃথিবীতে একটি পতনশীল বস্তু যদি প্রথম সেকেণ্ডে পাঁচ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে, চাঁদে সেক্ষেত্রে বস্তুটি মাত্র 80 সে.মি. পথ যেন 'ভেসে' নামবে (সেখানে ত্বরণের মান প্রায় 1·6 মি./সেকেণ্ড^2)।

চাঁদে এই 'অদ্ভুত আচরণ'-এর তাৎপর্য আমাদের সূত্র থেকেই ব্যাখ্যা করা যায়। h মিটার উঁচু থেকে লাফ দিলে সময় লাগে, $t=\sqrt{2h/g}$ সেকেণ্ড। যেহেতু চাঁদে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান পৃথিবীর তুলনায় ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র, সেকারণে চন্দ্রপৃষ্ঠে উপরোক্ত লাফের সময় $\sqrt{6}=2{\cdot}45$ গুণ বেশী লাগবে। লাফের চূড়ান্ত বেগ কত গুণ কমে যাবে ($v=\sqrt{2gh}$)?

চাঁদের বুকে একটি দোতলা বাড়ীর ছাত থেকে যে কেউ নির্ভয়ে ও নিরাপদে লাফ দিতে পারে। উচ্চ লম্ফনের ক্ষেত্রে একই প্রাথমিক বেগ চাঁদে ছয়গুণ বেশী উচ্চতায় ($h=v^2/2g$) নিয়ে যাবে। পৃথিবীতে উচ্চ লম্ফনের যে রেকর্ড আছে একটি শিশু অনায়াসেই চাঁদের বুকে তার থেকে বেশী লাফাতে পারে।

গুলির গতিপথ (Path of a bullet)

স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ কত বেশী দূরে বস্তুকে ছুঁড়তে পারে তার কৌশল বার করার চেষ্টা করে আসছে। এ বিষয়ে ব্যবহৃত বস্তুর তালিকায় রয়েছে—ঢিল, ফিঙ্গার গুলি, তীরধনুক, বুলেট, কামানের গোলা, ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদি।

নিক্ষিপ্ত বস্তুর বক্রপথটি অধিবৃত্তীয়। নিক্ষিপ্ত বস্তুর গতিকে যদি স্বতন্ত্র ও পরস্পর নিরপেক্ষ—উলম্ব ও অনুভূমিক এই দুই দিকের গতির সমন্বয় বলে ধরা হয় তাহলে এই অধিবৃত্তাকার পথটি গঠন করা কঠিন হয় না।

অবাধ পতনের ক্ষেত্রে ত্বরণের অভিমুখ উলম্বরেখা বরাবর, সুতরাং কোন বুলেট যখন গতিজড়তার জন্য অনুভূমিক দিকে স্থির গতিবেগে ছোটে, সঙ্গে সঙ্গে স্থির ত্বরণে খাড়াভাবে পৃথিবীর দিকেও নামতে থাকে। এই দুই গতিকে কিভাবে যোগ করা যায় ?

ধরা যাক, প্রাথমিক বেগ অনুভূমিক (অনুভূমিক রাইফেল থেকে গুলি ছুটলে যেমন হয়)।
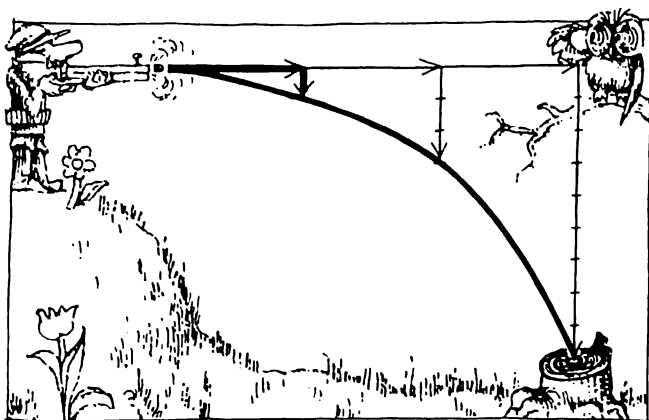
চিত্র 2.3

একটি লেখ কাগজের উপর উলম্ব ও অনুভূমিক অক্ষ দুটি নেওয়া হল (চিত্র 2.3)। যেহেতু বেগ দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ, সুতরাং t সেকেণ্ডে বস্তুটি v_0t পরিমাণ ডানদিকে এবং $gt^2/2$ পরিমাণ নীচের

দিকে সরে যাবে। অনুভূমিক অক্ষ থেকে $v_0 t$ পরিমাণ অংশ এবং এই অংশের শেষ বিন্দুটি থেকে উল্লম্ব অক্ষের উপর $gt^2/2$ অংশ কেটে নিতে হবে। উল্লম্বরেখা খণ্ডটির প্রান্তবিন্দুটি t সেকেণ্ডের পর বস্তুটির অবস্থান নির্দেশ করছে।
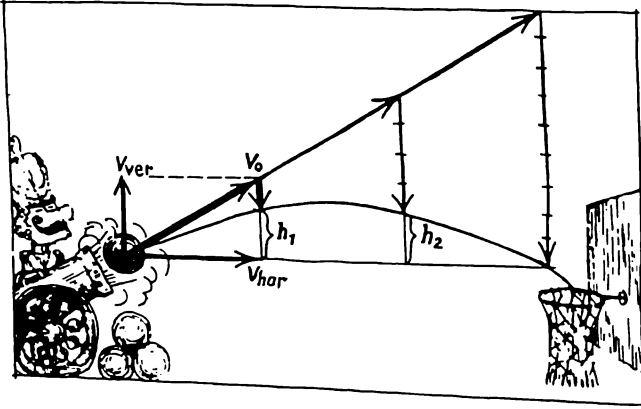
চিত্র 2.4

বিভিন্ন মুহূর্তে বস্তুর বিভিন্ন বিন্দুতে অবস্থান এইভাবে বার করা যায়। একটি মসৃণ রেখা দিয়ে এই বিন্দুগুলি যোগ করলে যে অধিবৃত্তটি পাওয়া যায় সেটাই বস্তুর গতিপথ। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে যত বেশী সংখ্যক এই রকম অবস্থান-বিন্দু নেওয়া যাবে, বুলেটটির গতিপথ তত নিখুঁতভাবে বার করা সম্ভব হবে।

প্রাথমিক বেগ অনুভূমিক না হয়ে যদি তার সঙ্গে নির্দিষ্ট কোণ করে তবে বস্তুটির গতিপথ কেমন হবে তা 2.4 চিত্রে দেখানো হয়েছে।

প্রাথমিক বেগ ভেক্টর v_0-কে প্রথমেই উল্লম্ব ও অনুভূমিক উপাংশে বিভাজন করে নেওয়া দরকার। t সেকেণ্ডে বস্তুটি অনুভূমিক দিকে যতটা যাবে, সেই পরিমাণটি অর্থাৎ $v_{hor}t$ অনুভূমিক রেখা থেকে কেটে নেওয়া হল।

কিন্তু বুলেটটির যুগপৎ উল্লম্ব দিকেও গতি রয়েছে। t সেকেণ্ডে সেটি h উচ্চতায় উঠলে, $h = v_{ver}t - gt^2/2$। সময়ের যেসব মুহূর্তে বস্তুর অবস্থান বার করতে চাই, সময়ের সেই মানগুলি এই সমীকরণে

বসালে আমরা উল্লম্ব দিকে বিভিন্ন সরণের মান পাব এবং উল্লম্ব অক্ষরেখায় এই সমস্ত সরণকে নির্দেশ করতে পারব। h-এর মান প্রথমে বাড়তে দেখা যাবে কিন্তু পরে ক্রমশ কমতে থাকবে।

এখন শুধু লেখ কাগজের উপর গতিপথের বিভিন্ন বিন্দুকে চিহ্নিত করা বাকী রয়েছে। আগের উদাহরণের মতই একটি মসৃণ বক্ররেখা দিয়ে অবস্থান-বিন্দুগুলি যোগ করা যায়।

রাইফেলের নলকে ভূমির সমান্তরালে রাখলে গুলি কিছুদূর গিয়েই মাটিতে গর্ত করে ঢুকে যাবে, আবার রাইফেলের নলটি ঊর্ধ্বমুখী করে গুলি ছুঁড়লে গুলি সোজাসুজি সেখানেই নেমে আসবে। সেকারণে সবচেয়ে বেশী দূরে গুলি পাঠাতে হলে নলকে অনুভূমিকের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট কোণে রাখতে হবে। কিন্তু কতটা কোণে ?

একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে—প্রাথমিক বেগ ভেক্টরকে দুটি উপাংশে ভাঙতে হবে, একটি উল্লম্ব ভেক্টর v_1 এবং অনুভূমিক ভেক্টর v_2। গুলি ছোঁড়ার পর সেটি তার গতিপথে সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছতে v_1/g সময় নেয়। নীচের দিকে নেমে আসতেও একই সময় লাগে। যাতায়াতে মোট সময় তাহলে $2v_1/g$ হচ্ছে।

যেহেতু অনুভূমিক গতি সুষম, দূরত্ব পাল্লা

$$s = 2v_1 v_2/g$$

(ভূমি থেকে রাইফেলের উচ্চতা আমাদের গণনায় উপেক্ষা করা হয়েছে।)

আমরা যে সূত্রটি পেলাম তাতে দেখা যাচ্ছে, দূরত্ব পাল্লা বেগের উপাংশ দুটির গুণফলের সমানুপাতিক। কোন্ অভিমুখে গুলি ছুঁড়লে এই গুণফলের মান সর্বাধিক হয় ? ভেক্টর যোগের জ্যামিতিক নিয়মের কথা মনে রেখে প্রশ্নটি অন্যভাবেও করা যায়। v_1 এবং v_2 যেন বেগ-আয়তক্ষেত্রের দুটি বাহু এবং সন্নিহিত কর্ণটি মোট বেগ v-কে নির্দেশ করে। $v_1 v_2$ গুণফলটি ঐ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান।

আমাদের প্রশ্নটি সংক্ষেপে এরকম দাঁড়াল : কর্ণের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকলে সন্নিহিত বাহুদ্বয়ের কিরকম মানের জন্য আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল সর্বাধিক হবে ? জ্যামিতি শাস্ত্র অনুযায়ী প্রমাণ করা যায়, এই শর্ত সাপেক্ষে ক্ষেত্রটি বর্গাকার হবে। তাহলে, যখন $v_1 = v_2$ তখন দূরত্ব পাল্লা সর্বাধিক, অর্থাৎ যখন বেগ আয়তক্ষেত্রটি বর্গাকার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। বর্গক্ষেত্রের কর্ণ অনুভূমিক রেখার সঙ্গে $45°$ কোণ করে, সুতরাং গুলিকে সর্বাধিক দূরত্বে পাঠাতে হলে রাইফেলটি ভূমির সঙ্গে $45°$ কোণে স্থাপিত করতে হবে।

গুলির গতিবেগ v হলে বর্গক্ষেত্র থেকে আমরা পাই, $v_1 = v_2 = v/\sqrt{2}$। এই অবস্থায় সর্বাধিক দূরত্ব পাল্লার সূত্রটি শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় ঃ $s = v^2/g$, অর্থাৎ একই প্রাথমিক বেগে গুলিটি খাড়াভাবে যে উচ্চতায় উঠত, দূরত্ব পাল্লায় এক্ষেত্রে তার দ্বিগুণ হচ্ছে।

45° কোণে গুলি ছুঁড়লে গুলির সর্বোচ্চ উচ্চতা $h = v_1^2/2g = v^2/4g$, অর্থাৎ দূরত্ব পাল্লার এক-চতুর্থাংশ মাত্র।

এখানে অবশ্যই স্বীকার করে নেওয়া ভাল, বায়ুজনিত বাধা না থাকলে তবেই আমাদের সূত্রগুলি থেকে নির্ভুল ফলাফল পাওয়া সম্ভব। অবশ্য বাস্তবে বায়ুর বাধা একেবারে শূন্য করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে বাতাসের বাধাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় এবং গতিপথের সামগ্রিক চিত্রটির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়।

বৃত্তগতি (Circular motion)

একটি বিন্দু বৃত্তপথে গতিশীল হলে তার ত্বরণ থাকে, এর একমাত্র কারণ কণাটির গতিবেগের অভিমুখ সর্বদা পাল্টে যায়। দ্রুতি একই থাকতে পারে এবং এই রকম সমদ্রুতিসম্পন্ন বৃত্তগতির মধ্যেই আমরা বর্তমান আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।
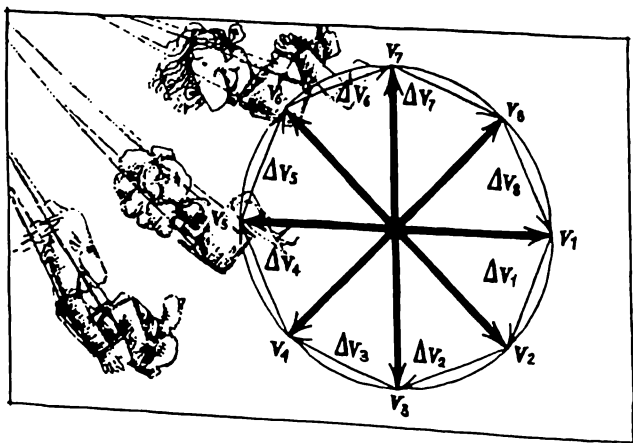
চিত্র 2.5

নির্দিষ্ট সময় পর পর আমরা বেগ ভেক্টরগুলি অঙ্কন করলাম এবং তাদের প্রয়োগ বিন্দু একটিমাত্র বিন্দুতে নিয়ে আসা হল (এরকম করার

ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই)। যদি কোন বেগ ভেক্টর কিছু কোণে ঘুরে যায় তাহলে, আমরা জানি, একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি বেগের এই পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। বস্তুকণাটির পূর্ণ আবর্তনের ফলে যে বিভিন্ন বেগ-পরিবর্তন ঘটেছে তাদের এইভাবে আঁকা হল (চিত্র 2.5)। পরিবর্তনগুলির মানের সমষ্টিকে আমরা একটি বহুভুজের ভূমিগুলির সমষ্টির সমান বলতে পারি। প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রিভুজ অঙ্কন করতে গিয়ে আমরা যেন ধরেই নিয়েছি, বেগ ভেক্টরের পরিবর্তন স্তরে স্তরে ঘটেছে, কিন্তু বাস্তবে এর পরিবর্তন অবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে। অবশ্য এটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ক্ষুদ্র ত্রিভুজগুলির শীর্ষকোণ যত ক্ষুদ্র হবে তত আমাদের ত্রুটিও কম হবে। আবার বহুভুজটির বাহুগুলি যত ছোট হবে, তত বহুভুজটি v-ব্যাসার্ধের বৃত্তের আকার নেবে। সুতরাং একবার পূর্ণ আবর্তনের জন্য মোট বেগ-পরিবর্তন বৃত্তটির পরিধি $2\pi v$-এর সমান হবে। একে একবার পূর্ণ আবর্তনের সময় T দিয়ে ভাগ করলে ত্বরণের পরিমাণ পাওয়া যাবে: $a = 2\pi v/T$।
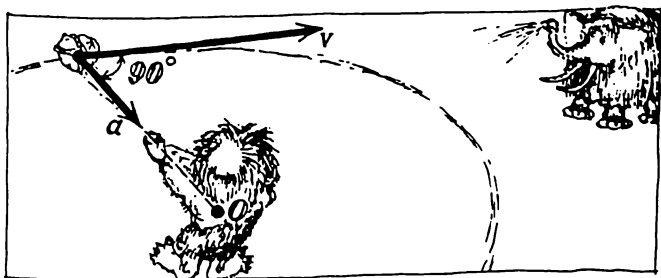
চিত্র 2.6

R ব্যাসার্ধের বৃত্তপথে আবর্তনের পর্যায়কাল T-কে এইভাবে প্রকাশ করা যায়, $T = 2\pi R/v$। আগের সূত্রে T-এর এই মান বসিয়ে আমরা ত্বরণ $a = v^2/R$ পাই।

স্থির ব্যাসার্ধের বৃত্তপথে ঘূর্ণনের ক্ষেত্রে ত্বরণ গতিবেগের বর্গের সমানুপাতিক। গতিবেগ স্থির থাকলে, ত্বরণ ব্যাসার্ধের ব্যাস্তানুপাতিক।

বৃত্তগতির ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে ত্বরণের অভিমুখ কোন্‌দিকে তা আগের যুক্তি থেকেই বোঝা যায়। আগে যেসব সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের কথা বলা হয়েছে তাদের শীর্ষকোণগুলি যত ছোট হয় তত বেগ এবং বেগের বৃদ্ধির অন্তর্গত কোণ $90°$-এর কাছাকাছি আসে।

সুতরাং সমহার বৃত্তগতির ত্বরণের অভিমুখ বেগের লম্ব দিকে। তাহলে বস্তুর গতিপথের সঙ্গে তার বেগ ও ত্বরণের অভিমুখের সম্পর্ক কি? যেহেতু যে কোন মুহূর্তে বেগ গতিপথের স্পর্শক বরাবর, ত্বরণ সেই মুহূর্তের অবস্থানে ব্যাসার্ধ বরাবর কেন্দ্রাভিমুখী। 2.6 চিত্রে এইসব সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

দড়িতে একটা ঢিল বেঁধে বন্‌বন্‌ করে ঘোরাতে গেলে পেশীর উপর বেশ চাপ অনুভব করা যায়। এই বলের প্রয়োজন কি? বস্তুটি কি সমহার বেগে গতিশীল নয়? বস্তুটি সমদ্রুতিতে চলছে, কিন্তু বেগের অভিমুখ সর্বদা পরিবর্তিত হওয়ায় ত্বরণ উৎপন্ন হচ্ছে। জড়ত্বজনিত ঋজু পথ থেকে বস্তুটিকে বিচ্যুত করতে অবশ্যই বলের দরকার। এই বল v^2/R ত্বরণ উৎপন্ন করে—মানটির হিসাব আমরা আগেই পেয়েছি।

নিউটনের সূত্রানুসারে, বলের অভিমুখেই ত্বরণ ঘটে। সুতরাং, বৃত্তপথে সমদ্রুতিতে ঘূর্ণমান বস্তুর উপর ক্রিয়ারত বল ব্যাসার্ধ বরাবর কেন্দ্রাভিমুখী। ঢিলের উপর দড়ি-বরাবর ক্রিয়াশীল এই বলকে অভিকেন্দ্র বল বলা হয়। এই বলই v^2/R মানের প্রয়োজনীয় ত্বরণ উৎপন্ন করে। সুতরাং এই বলের মান mv^2/R।

দড়ি ঢিলকে টানছে, আবার ঢিল দড়িকে। এই দুই বলকে 'একটি বস্তু ও তার দর্পণ-প্রতিবিম্ব'—ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হিসাবে চিনতে পারি। ঢিলটি দড়ি বরাবর যে টান প্রয়োগ করে তাকে অপকেন্দ্র বল নামে সাধারণত অভিহিত করা হয়। বলা বাহুল্য, এই অপকেন্দ্র বলের মানও mv^2/R এবং এটা ব্যাসার্ধ বরাবর কেন্দ্র থেকে বহির্মুখী। ঘূর্ণমান বস্তুর সরলরৈখিক পথে গতিশীল হবার প্রবণতাকে এই অপকেন্দ্র বল প্রতিমিত করে।

এই ধরনের অন্য ঘটনায়, যেখানে অভিকর্ষ দড়ির ভূমিকা নেয়, সেখানেও একই ব্যাপার ঘটে। চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। আমাদের এই উপগ্রহটিকে তার কক্ষপথে ধরে রেখেছে কে? আন্ত-গ্রহরাজ্যে চলাচলের সময় কোন উপগ্রহ কেন জড়তার নিয়মে ছিট্‌কে সরে পড়ে না? পৃথিবী চাঁদকে একটা 'অদৃশ্য দড়ি' দিয়ে বেঁধে রেখেছে—একে অভিকর্ষ বল বলে। এই বলের মান mv^2/R, এখানে v_1 কক্ষপথে চাঁদের বেগ এবং R, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব। এখানে অপকেন্দ্র প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর উপর ক্রিয়াশীল, কিন্তু পৃথিবীর ভর অনেক বেশী বলে এই প্রতিক্রিয়া আমাদের পৃথিবীর উপর অতি নগণ্যই প্রভাব ফেলতে পারে।

মনে করা যাক, ভূপৃষ্ঠ থেকে 300 কিলোমিটার উচ্চতায় বৃত্তাকার কক্ষপথে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা দরকার। এই উপগ্রহের বেগ কতটা হওয়া উচিত? 300 কিলোমিটার উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ভূপৃষ্ঠের মানের কিছু কম এবং প্রায় 8·9 মি./সেকেণ্ড^2-এর সমান। বৃত্তপথে পরিক্রমণরত উপগ্রহটির ত্বরণ v^2/R, এখানে R পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে কক্ষপথের দূরত্ব এবং সে মানটি প্রায় 6600 কি.মি. $= 6{\cdot}6\times10^6$ মিটার। আবার ত্বরণের এই মানটি উপগ্রহটির অবাধ পতনের ত্বরণ g-এর সমান হবে। কাজেই, $g = v^2/R$ ধরে আমরা উপগ্রহের কক্ষীয় বেগ v বার করতে পারি :

$$v = \sqrt{gR} = \sqrt{8{\cdot}9\times6{\cdot}6\times10^6} = 7700 \text{ মি./সেকেণ্ড} = 7{\cdot}7$$

কি.মি./সেকেণ্ড।

যে সর্বনিম্ন বেগে কোন বস্তুকে অনুভূমিক দিকে ছুঁড়ে দিলে বস্তুটি পৃথিবীর উপগ্রহ হতে পারে, সেই বেগকে উপগ্রহটির কক্ষীয় বেগ বলে। আমাদের গণনা থেকে দেখা যাচ্ছে, সর্বনিম্ন বেগটি 8 কি.মি./সেকেণ্ড-এর কাছাকাছি।

g-শূন্য অবস্থায় (Life at g zero)

ইতিপূর্বে আমরা একটি 'যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিকোণ' খুঁজে পেয়েছি। একথা সত্যি, যে জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্রকে আমরা 'যুক্তিসঙ্গত' বলছি, তার সংখ্যা অগণ্য হতে পারে।

এখন, গতির নিয়ম-কানুন বিশদভাবে জানার পর আমরা একটি 'যুক্তিহীন' দৃষ্টিকোণথেকে গতির বিচার করতে কৌতূহল প্রকাশ করতে পারি।

জড়তাহীন নির্দেশতন্ত্রে প্রাণীকূল কিভাবে থাকে সে বিষয়ে কৌতূহল একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়—আমাদেরই যদি কোনদিন এরকম অবস্থায় চলাফেরা করতে হয়!

কল্পনা করা যাক, আমরা যেন মাপজোকের যাবতীয় যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে গ্রহান্তরের মহাকাশযানে চড়ে সুদূর নক্ষত্রময় জগতে পাড়ি জমালাম।

সময় দ্রুত বয়ে চলেছে। সূর্যকে ইতিমধ্যে একটি সুদূর নক্ষত্রের মতো দেখাচ্ছে। অভিকর্ষ সৃষ্টিকারী বস্তুরাজি থেকে অনেক—অনেক দূরে চলে এসেছি। এঞ্জিন বন্ধ করা হল।

এবারে আমাদের ভাসমান পরীক্ষাগারটির খবর নেওয়া যাক। এ কি? আমাদের থার্মোমিটারটি যে পেরেক থেকে খুলে বাতাসে

ভাসছে! কিন্তু মেঝেয় পড়ছে না কেন? দেওয়াল থেকে 'খাড়াভাবে' যে পেণ্ডুলামটি ঝুলছিল সেটা কিরকম অদ্ভুত অবস্থায় ঘুরে গিয়ে দেওয়ালে আটকে গেছে? হঠাৎ কারণটা খেয়াল হল: আরে! মহাকাশযানটা তো পৃথিবীতে নেই—আন্তর্গ্রহরাজ্যে চলে এসেছে। ফলে বস্তুর তো ওজন থাকার কথা নয়।

এই অভূতপূর্ব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের গতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলাম। বোতাম টিপে জেট এঞ্জিনটি চালু করা হল এবং হঠাৎ....চারপাশের জিনিসপত্র যেন আবার নিজের নিজের পূর্বাবস্থা ফিরে পাচ্ছে। যে সব জিনিস মোটামুটি স্থির হয়েছিল, তাদের মধ্যে গতির সঞ্চার হল। থার্মোমিটার নীচে পড়ে গেল, পেণ্ডুলাম দুলতে শুরু করল এবং ধীরে ধীরে খাড়া অবস্থায় ফিরে এল। মাথার বালিশ তার উপর রাখা চামড়ার ব্যাগের নীচে আবার বাধ্য ছেলের মত চুপসিয়ে পড়ে রইল। আমাদের মহাকাশযান কোন্ দিকে জোরে ছুটতে শুরু করেছে তা দেখার জন্য দিক্ নির্দেশক যন্ত্রের কাছে গেলাম। বলা বাহুল্য, উপরদিকে! যন্ত্রে দেখা যাচ্ছে, আমরা 9·8 মি./সেকেণ্ড^{2} ত্বরণ নিয়ে চলেছি। আমাদের মহাকাশযানে এই ত্বরণ তৈরী করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। পৃথিবীতে থাকলে যেমনটি লাগে, এখন ঠিক সেরকম অনুভূতিই লাগছে। কিন্তু কেন? আমরা তো অভিকর্ষদায়ী বস্তুসমূহ থেকে অকল্পনীয় দূরত্বে রয়েছি। ফলে, কোন অভিকর্ষ বল থাকার কথা নয়। কিন্তু সব জিনিসের যে ওজন পাচ্ছি!

একটা মার্বেল মহাকাশযানের মেঝেতে ফেলে তার ত্বরণ মাপা হল। ত্বরণের মান 9·8 মি./সেকেণ্ড^{2}-এর সমান দেখা গেল। ঠিক এই সংখ্যাটাই রকেটের ত্বরণমাপক যন্ত্রে একটু আগে দেখলাম। আমাদের ভাসমান পরীক্ষাগারে যে ত্বরণে বস্তু নীচে পড়ছে সেই ত্বরণ নিয়েই মহাকাশযান উপর দিকে চলেছে।

মহাশূন্যে 'উপর' আর 'নীচ' বলতে কি বোঝায়? যখন পৃথিবীর বুকে ছিলাম, সব ঘটনা কেমন সুন্দর বোঝা যেত। আর এখানে? মহাকাশযানের একটি মাত্র বিষয়ে আমাদের সংশয়ের অবকাশ নেই—সেটি হল, কোন্ দিকে তার ত্বরণ ঘটছে।

আমাদের পর্যবেক্ষণের ফলাফল ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন ব্যাপার নয়: যে মার্বেলটি ফেলা হয়েছিল তার উপর কোন বলই ক্রিয়াশীল নয়। রকেট মার্বেল সাপেক্ষে ত্বরণ নিয়ে চলেছে বলেই মার্বেলটি জড়তা-ধর্মে গতিশীল হয়েছে। রকেটের অভ্যন্তরে থেকে আমরা

দেখছি, যেদিকে রকেটটির ত্বরণ তার ঠিক উল্টোদিকে মার্বেলটি পড়ছে। ফলত, এই পতনজনিত ত্বরণ রকেটের সত্যিকারের ত্বরণের সমান। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, রকেটের মধ্যে সব জিনিসই এই 'ত্বরণ' নিয়ে পড়তে পারে।

আমাদের আলোচনা থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করা যায়। যে মুহূর্তে রকেটের ত্বরণ ঘটে, সেই মুহূর্তে বস্তুগুলি 'ওজন' পেতে থাকে। অধিকন্তু, এই 'অভিকর্ষ বলের' অভিমুখ, রকেটের ত্বরণের বিপরীত মুখে এবং অবাধ 'পতন'-এর ত্বরণ আমাদের মহাকাশযানের ত্বরণের সমান। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়, নির্দেশতন্ত্রের ত্বরণযুক্ত গতির সঙ্গে সঙ্গে অভিকর্ষ বলের অধীন বস্তুর গতির কোন পার্থক্য বুঝতে পারছি না।* আমরা যদি এই রকম একটা রকেটে সমস্ত জানালা বন্ধ করে থাকি তবে আমরা বুঝতেই পারব না যে, পৃথিবীতে স্থির অবস্থায় আছি, না 9·8 মি./সেকেণ্ড^2 ত্বরণ নিয়ে ছুটছি। অভিকর্ষ বলের ত্বরণ এবং এই জাতীয় ত্বরণের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না বলে এই ঘটনাকে পদার্থবিজ্ঞানে **সমতুল্যতা নীতি** (equivalence principle) বলে।

এবারে বেশ কিছু উদাহরণের সাহায্যে এই নীতিকে ব্যাখ্যা করা হবে। এই নীতির সাহায্যে ত্বরিত নির্দেশতন্ত্রে উদ্ভূত কাল্পনিক বা

চিত্র 2.7

*অবশ্য এটা এরকমই মনে হয় মাত্র। তত্ত্বগতভাবে পার্থক্য রয়েছে। পৃথিবীতে অভিকর্ষ বল পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বরাবর কেন্দ্রাভিমুখী। এর অর্থ, দুটি বিভিন্ন স্থানে অভিমুখদ্বয়ের মধ্যে একটা কোণ তৈরী হয়। রকেট ত্বরণ নিয়ে উপরে উঠলে, সমস্ত বস্তুর ওজনের অভিমুখ পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমান্তরাল। পৃথিবীর ক্ষেত্রে ত্বরণ উচ্চতার সঙ্গে পরিবর্তন করে, কিন্তু রকেটে এই পরিবর্তন দেখা যায় না।

অলীক বলের সঙ্গে বাস্তব বলের সংযোগ ঘটিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

লিফ্‌ট-কে আমাদের প্রথম উদাহরণ করা যাক। স্প্রিং-তুলাদণ্ডে কিছু ওজন ঝুলিয়ে লিফ্‌টে তোলা হল। মনে করি, এক কিলোগ্রাম সবজি স্প্রিং তুলায় টাঙানো হয়েছে (চিত্র 2.7)। এবারে স্প্রিং-এর সূচকটি পর্যবেক্ষণ করে যাব। লিফ্‌ট উপরে উঠতে শুরু করল। সূচক ক্রমশ বেশী পাঠ নির্দেশ করছে। অর্থাৎ ওজন এক কিলো-গ্রামের বেশী হয়েছে। সমতুল্যতা নীতি থেকে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করা যায়। a ত্বরণ নিয়ে লিফ্‌টের উর্ধ্বমুখী গতির জন্য নিচের দিকে একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ বল ক্রিয়া করছে। এই নিম্নমুখী বলের জন্য ত্বরণ যেহেতু a-ই হবে, সুতরাং এই অতিরিক্ত ওজন ma-এর সমান। সেকারণে, স্কেলে $mg+ma$ ওজনের পাঠ পাওয়া যাচ্ছে। ত্বরণ শেষ হল, এবার লিফ্‌ট সমান বেগ নিয়ে উঠছে—সূচকটি তার প্রাথমিক অবস্থানে ফিরে আসল অর্থাৎ 1 কিলোগ্রাম ওজন নির্দেশ করল। আমরা এতক্ষণে সর্বোচ্চ তলের কাছাকাছি এসে পড়েছি। লিফ্‌টের গতি কমে আসছে। স্প্রিং-তুলাতে এখন কি দেখা যাবে? ঠিক, যা ভাবা গেছে। বোঝার ওজন এক কিলোগ্রাম থেকে কম দেখাচ্ছে। লিফ্‌টের গতি যখন কমতে শুরু করে, ত্বরণ ভেক্টরের অভিমুখ তখন নীচের দিকে হয়। ফলে, অতিরিক্ত অলীক অভিকর্ষ বলের অভিমুখ খাড়া উপর দিকে, পৃথিবীর অভিকর্ষের বিপরীতে। এক্ষেত্রে, a-এর মান ঋণাত্মক, সুতরাং স্কেলে mg-র থেকে কম মান পাওয়া যাবে। লিফ্‌টটি থেমে গেল, সূচকটিও প্রাথমিক অবস্থানে ফিরে এল। এবার নামার পালা। লিফ্‌টের বেগ বাড়ছে, ত্বরণ ভেক্টরের অভিমুখ নীচের দিকে। ফলত, অতিরিক্ত অভিকর্ষ বলটি উর্ধ্বমুখী। বোঝার ওজন এক কিলোগ্রাম থেকে কমে যাচ্ছে। লিফ্‌টের গতি আবার সুষম হয়ে এল, অতিরিক্ত ওজনও অন্তর্ধান করল। যাত্রাপথের শেষভাগে লিফ্‌টের গতি কমতে লাগল। বোঝার ওজন আবার এক কিলোগ্রামের বেশী হয়ে পড়ল।

দেখা যাচ্ছে, লিফ্‌টে দ্রুত ত্বরণ বা মন্দনের সময় যে অস্বস্তিকর অনুভূতি ঘটে তার সঙ্গে ঐ অতিরিক্ত ওজনের সম্পর্ক রয়েছে।

ত্বরণ নিয়ে লিফ্‌টে নীচে নামতে থাকলে লিফ্‌টের মধ্যে বস্তুকে হাল্কা বলে মনে হবে। ত্বরণ যত বেশী হবে, বস্তুর ওজন হ্রাসও তত বেশী হবে। কিন্তু নির্দেশতন্ত্র অবাধে পড়তে থাকলে কি হবে? উত্তর

সহজ, বস্তু তুলাদণ্ডে কোন চাপই দেবে না—ফলে ওজন থাকবে না। অবাধে পতনশীল নির্দেশতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত অভিকর্ষীয় বল পৃথিবীর আকর্ষণ বলকে প্রশমিত করে দেবে। এরকম 'লিফ্‌ট'-এ নির্দ্বিধায় কাঁধের উপর একটন বোঝা নেওয়া যায়।

অভিকর্ষের সীমা ছাড়িয়ে মহাকাশের সুদূর পাড়ে মহাকাশযানের ভিতরে বস্তুর অবস্থা ত্বরণ শূন্যতায় কিরকম হয়, তা এই অনুচ্ছেদের প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে। মহাকাশযানের গতি স্থির থাকলে বস্তুর কোন ওজন থাকবে না। নির্দেশতন্ত্রের অবাধ পতনের ক্ষেত্রেও একই জিনিস পরিলক্ষিত হয়। এই অবস্থার অভিজ্ঞতার জন্য তাহলে অভিকর্ষের সীমা পেরোনোর দরকার নেই। ইঞ্জিন বন্ধ-করা অবস্থায় গ্রহরাজ্যের বাইরে কোন মহাকাশযানের অভ্যন্তরেই বস্তুর ওজন পাওয়া যাবে না। অবাধ পতনের সময়ও বস্তুর ওজন সম্পূর্ণ শূন্য হয়। সমতুল্যতা নীতি থেকে তাহলে জানা যাচ্ছে। অভিকর্ষ বলের বাইরে সুষমবেগে ঋজুগতিসম্পন্ন নির্দেশতন্ত্রের সঙ্গে (৫৭ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য) অভিকর্ষ বলের অধীনে অবাধে পতনশীল নির্দেশতন্ত্রের প্রায় সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে, কোন ওজন নেই এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'নিম্নমুখী ওজন', 'উর্ধ্বমুখী ওজন'-এর দ্বারা প্রতিমিত। এই দুই পদ্ধতির মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে বার করা যাবে না।

যে মুহূর্তে রকেটের আলিঙ্গন ছাড়িয়ে পার্থিব উপগ্রহ কক্ষপথে ঘুরতে শুরু করে, সেই মুহূর্তে অভিকর্ষহীন অবস্থার জীবন শুরু হয়।

প্রথম মহাকাশচারী লাইকা—একটি সারমেয়। এর অল্প পরে মহাকাশযানের কেবিনে এই অবস্থায় মানুষকে পাঠানো হয়। সোভিয়েতের ইউরি গ্যাগারিন হলেন প্রথম মানব মহাকাশচারী।

মহাকাশের কেবিনের মধ্যে জীবনযাত্রাকে কোনভাবেই স্বাভাবিক বলা যাবে না। সেখানে বস্তুকে অভিকর্ষক্ষেত্রের মতো আচরণ করাতে অনেক উদ্ভাবনীশক্তি ও কৌশলের দরকার হয়। যেমন, সেখানে কি বোতল থেকে গ্লাসে জল ঢালা সম্ভব? কারণ জল তো অভিকর্ষের টানে নীচে পড়ে। স্টোভে জল ফোটান সম্ভব নয় (কারণ, গরম জল ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে মিশবে না), তাহলে সেখানে কি রান্নাবান্না করা যাবে? পেন্সিল দিয়ে কাগজের উপর চাপ দিতে গেলেই পতনের হাত থেকে নিজেকে সামলানো যাবে না; তাহলে সেখানে লেখালিখি করা যাবে কেমন করে? কোন দেশলাই, বাতি বা গ্যাস-বার্নার সেখানে জ্বালানো যাবে না, কারণ জ্বলে-যাওয়া গ্যাস অক্সিজেনের জন্য জায়গা

ছেড়ে দিতে উপরে (অবশ্য, উপর বলে কিছু নেই) উঠে যাবে না। পৃথিবীতে শরীরের যে সব জৈবিক প্রক্রিয়ায় আমরা 'অভ্যস্ত', সেখানে যে সেগুলি স্বাভাবিকভাবে ঘটবে তার কোন নিশ্চয়তা আছে কি না, তাও ভাববার কথা।

'যুক্তিহীন' দৃষ্টিকোণ থেকে গতি (Motion from an 'unreasonable' point of view)

ত্বরণে গতিশীল বাস বা গাড়ীতে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায়, তা এখন আলোচনা করা যাক। আগের উদাহরণ থেকে এর বৈশিষ্ট্য হল : লিফ্‌টের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ওজন এবং অভিকর্ষ বল একই রেখায় ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু মন্দন বা ত্বরণের সময় গাড়ীতে উদ্ভূত এই অতিরিক্ত বল বা ওজন পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের অভিমুখের লম্বদিকে ক্রিয়া করে। এর ফলে আরোহীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট অথচ পরিচিত অনুভূতির সঞ্চার হয়। গাড়ীর ত্বরণ ঘটলে একটি অতিরিক্ত বল গতির বিপরীতমুখে ক্রিয়া
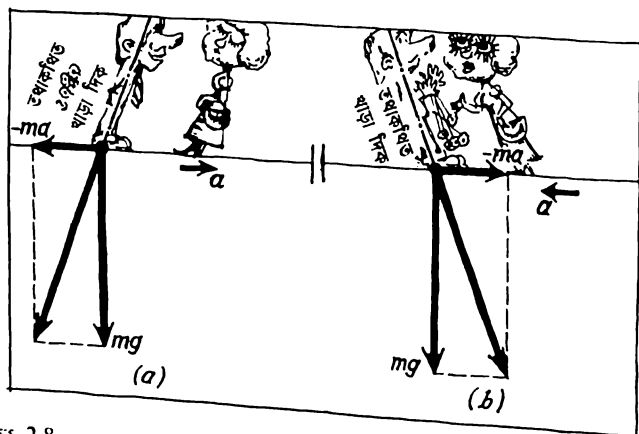
চিত্র 2.8

করে। পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের সঙ্গে এই বলের যোগ ঘটিয়ে দেখা যাক। গাড়ীর আরোহীর উপর এই দুই বলের লব্ধি গাড়ীর গতির অভিমুখের সঙ্গে একটি স্থূলকোণে ক্রিয়াশীল হবে। গাড়ীর সামনের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা আরোহীর শরীরের উর্ধ্বাংশের গতি ঘটতে চাইবে। পাছে পড়ে যান, একারণে আরোহী 'খাড়া'-হয়ে দাঁড়াতে

চাইবেন—$2.8a$ চিত্রে যেরকম দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে, 'খাড়া'-টি আসলে তির্যক অবস্থা। গতির অভিমুখের সঙ্গে কিছুটা কোণ করে দাঁড়াতে হবে। কোন কিছু না ধরে এই সময় গতির অভিমুখের সমকোণে দাঁড়িয়ে থাকলে নিশ্চিত পিছনে হেলে পড়তে হবে।

কিছুক্ষণ পর গাড়ির গতি সুষম হয়ে এলে আরোহী নিশ্চিন্তে দাঁড়াতে পারেন। এর মধ্যেই আবার পরবর্তী স্টপের কাছাকাছি গাড়ী চলে এসেছে। চালক ব্রেক কষল এবং........আরোহীর খাড়া-হয়ে দাঁড়ানো পাল্টাতে হল। এই তথাকথিত খাড়া দিক গতির অভিমুখের সঙ্গে একটি স্থূলকোণ করেছে, $2.8b$ চিত্রে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। যাই হোক, এই অবস্থায় আরোহীকে বেশীক্ষণ থাকতে হচ্ছে না। গাড়ী থেমে গেল এবং মন্দনও শেষ হল। ফলে 'খাড়া' অবস্থা আবার পৃথিবীপৃষ্ঠ সাপেক্ষে লম্বদিকে ফিরে এল। ফলে শরীরের অবস্থানের আবার পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। একটু অনুভব করলেই বোঝা যায়। এটা কি মনে হয় না, যখন গাড়ীর মন্দন ছিল তখন যেন কেউ পিছন থেকে ঠেলা দিচ্ছিল আর গাড়ী যখন থেমে গেল তখন ঠেলাটা আসছিল সামনের দিক থেকে একেবারে বুকের উপরে?

গাড়ী যখন রাস্তায় বাঁক নেয়, তখনও ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটে। বৃত্তগতির ক্ষেত্রে, সমদ্রুতি থাকলেও, একটি ত্বরণ থাকে। বেগ যত বেশী এবং বক্রতাব্যাসার্ধ যত কম হয়, তত এই ত্বরণ v^2/R-এর মান বাড়ে। এই গতির সময় ত্বরণ ব্যাসার্ধ বরাবর কেন্দ্রাভিমুখী। এটি ব্যাসার্ধ বরাবর কেন্দ্রবহির্মুখী একটি অতিরিক্ত বলের সমার্থক। সুতরাং, mv^2/R মানের একটি অতিরিক্ত বল আরোহীর উপর ক্রিয়া করে এবং এর ফলে আরোহী বাঁকের ব্যাসার্ধ বরাবর বাইরের দিকে ছিটকে পড়তে চায়। এই ব্যাসার্ধ বরাবর বহির্মুখী বল mv^2/R-কে অপকেন্দ্র বল বলে। এই বলের কথা আমরা ৫৪ পৃষ্ঠায় বলেছি (যদিও, অন্য দৃষ্টি-কোণ থেকে এই প্রসঙ্গ উঠেছিল)।

গাড়ী বা বাসের বাঁক নেওয়ার সময় উদ্ভূত এই অপকেন্দ্র বলের জন্য কিছুটা অস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি হয়। mv^2/R মানের এই বলটি অবশ্য বড় নয়। তা সত্ত্বেও, বাঁকের মুখে গতি খুব দ্রুত হলে নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটাও অসম্ভব নয়। প্লেনের পাক খাওয়ার ফলে বিমানচালকের উপর mv^2/R-এর মান অনেক বেড়ে যায়। প্লেনটি চক্রাকারে উড়তে থাকলে এই অপকেন্দ্র বল চালককে তার আসনে ঠেসে ধরে। পাকের পরিধি যত ছোট হয়, এই অতিরিক্ত বলের পরিমাণ তত বাড়তে থাকে।

তাতে চালকের উপর চাপ বেশী পড়ে। এই 'ওজন' খুব বেশী হলে, শরীর 'ছিন্নভিন্ন' হতে পারে, কারণ প্রাণীর শক্তি সীমিত আর যে কোন ওজনের বোঝা বহন করা তো আর সম্ভব নয়।

এখন, জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে একজন কত বেশী ওজন নিতে পারে ? ঘাড়ের উপর এই বাড়তি বোঝার স্থিতিকালের উপর তা নির্ভর করে। স্থিতিকাল যদি সেকেণ্ডের এক-ভগ্নাংশমাত্র হয় তাহলে একজনের পক্ষে $7g$ থেকে $9g$ পর্যন্ত অতিরিক্ত বোঝা সহ্য করা সম্ভব। একজন বিমানচালক $3g$ থেকে $5g$ পর্যন্ত অতিরিক্ত বোঝা দশ সেকেণ্ড পর্যন্ত নিতে পারে। দশ মিনিট থেকে শুরু করে কয়েকঘণ্টা পর্যন্ত বাড়তি কতটা বোঝা একজনের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব, তার হিসাবনিকাশ মহাকাশচারীদের কাছে খুবই জরুরী। স্পষ্টত, বাড়তি বোঝার পরিমাণ তাদের ক্ষেত্রে বেশ কম হওয়া উচিত।

বিমানচালক কোন রকম ঝুঁকি না নিয়ে বিভিন্ন বেগে পাক খেতে থাকলে পাকের ব্যাসার্ধ কি রকম হওয়া উচিত, তার হিসাব করা যেতে পারে। $v^2/R=4g$ সম্পর্কটি ধরে এগোন যাক। সেক্ষেত্রে, $R=v^2/4g$ এবং বেগের মান 300 কি. মি./ঘণ্টা বা 100 মি./সেকেণ্ড হলে, পাকের ব্যাসার্ধ হবে 250 মিটার। বেগ চারগুণ অর্থাৎ 1440 কি. মি./ঘণ্টা (আধুনিক জেট প্লেন ইতিমধ্যে এই গতিসীমা ছাড়িয়ে গেছে) হলে ব্যাসার্ধ 16-এর গুণিতকে বেড়ে যাবে। পাকের সর্বনিম্ন ব্যাসার্ধ দাঁড়াবে 4 কিলোমিটার।

আমাদের নিরীহ দ্বিচক্রযান বাহন—সাইকেলের প্রসঙ্গ না তোলা সমীচীন হবে না। বাঁকের মুখে সাইকেল আরোহী কিভাবে কাত হয়, তা অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। আসুন, v বেগে R ব্যাসার্ধের বৃত্তপথে চলমান সাইকেল আরোহীকে পরামর্শ দেওয়া যাক। এক্ষেত্রে, কেন্দ্রের দিকে তার v^2/R মানের একটি ত্বরণ ঘটে। পৃথিবীর অভিকর্ষ তো আছেই, তাছাড়াও ব্যাসার্ধ বরাবর কেন্দ্রবহির্মুখী অপকেন্দ্র বলটিও আরোহীর উপর ক্রিয়া করে। বলদুটি এবং এদের লব্ধি 2.9 চিত্রে দেখান হয়েছে। এটা পরিষ্কার, আরোহী নিজেকে 'খাড়া' অবস্থায় না রাখলে নির্ঘাৎ পড়ে যাবে। কিন্তু....তার 'খাড়া' অবস্থাটি পৃথিবী সাপেক্ষে স্বাভাবিক খাড়া অবস্থার সঙ্গে মেলে না। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, mv^2/R এবং mg ভেক্টর দুটি একটি সমকোণী ত্রিভুজের দুটি বাহু তৈরী করেছে। α কোণের বিপরীত বাহু ও কোণ সংলগ্ন অন্য বাহুটির অনুপাতকে ত্রিকোণমিতিতে α কোণের ট্যানজেণ্ট বলে। সমতুল্যতা
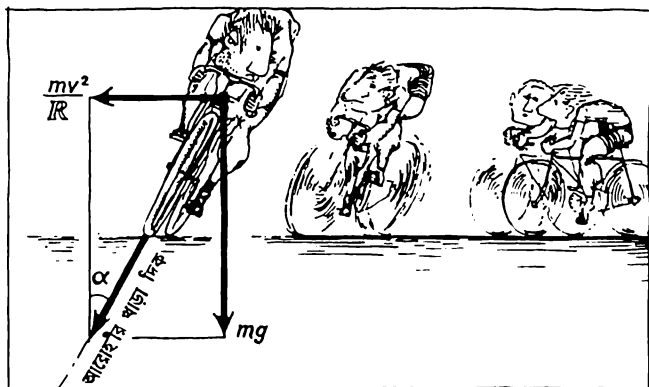
চিত্র 2.9

নীতি থেকে আমরা পাই, $\tan \alpha = v^2/Rg$। দেখা যাচ্ছে, নতির মান আরোহীর ভরের উপর নির্ভর করছে না। সুতরাং শক্ত-সমর্থ বা রোগা-পটকা—সব আরোহীকে একইভাবে কাত হতে হবে। চিত্রের ত্রিভুজ এবং সূত্র দুটো থেকে ব্যাসার্ধ-এর উপর নতি কিভাবে নির্ভর করে (গতি বাড়লে এবং ব্যাসার্ধ কমলে নতি বাড়ে), তা বোঝা যায়।

আরোহীর খাড়া অবস্থা কেন পৃথিবী সাপেক্ষে খাড়া অবস্থার সঙ্গে মেলে না তা আমরা ব্যাখ্যা করেছি। এখানে আরোহীর অনুভূতি কেমন হবে? 'সেটা বোঝার জন্য 2.9 চিত্রকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। রাস্তার চেহারা পাহাড়ের ঢালের মতো দেখাচ্ছে (চিত্রে 2.10*a*), পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, যদি সাইকেলের টায়ার ও পিচরাস্তার মধ্যে ঘর্ষণ খুব কম হয় (রাস্তা ভিজে থাকলে যেমনটি হয়) তাহলে চাকা পিছলে যাবে এবং হঠাৎ বাঁক নিতে গেলে ছিটকে গর্তে পড়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

এসব সম্ভাবনার কথা মনে রেখে রাজপথ এমনভাবে তৈরী করা হয় যাতে বাঁকের মুখে রাস্তা একদিকে নীচু থাকে—এতে সাইকেল-আরোহীর পক্ষে রাস্তাটি 'অনুভূমিক' হয়। 2.10*b* চিত্রে তা দেখান হয়েছে। এই ব্যবস্থায় পিছলে পড়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়
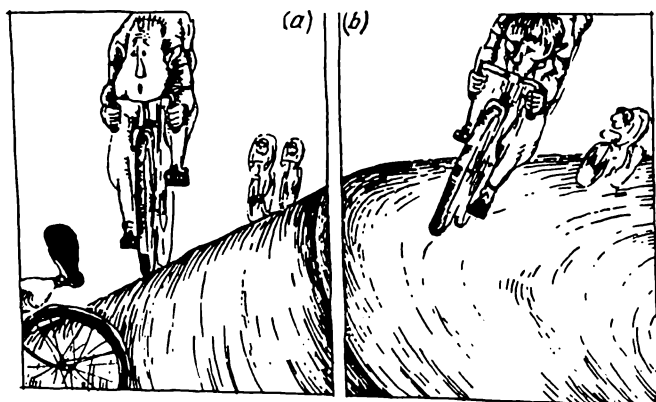
চিত্র 2.10

বা একেবারেই থাকে না। উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী, সাইকেলের রাস্তা বা অতি দীর্ঘ রাজপথ নির্মাণের সময় বাঁকের মুখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

অপকেন্দ্র বল (Centrifugal forces)

ঘূর্ণন বা আবর্তগতির কথা এবার আলোচনা করা যাক। অক্ষের চারপাশে সেকেণ্ডে ঘূর্ণন সংখ্যাটি এই গতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। সেই সঙ্গে অবশ্য ঘূর্ণাক্ষের অভিমুখ জানাও খুব জরুরী।

ঘূর্ণনতন্ত্রে বস্তুর অবস্থা কেমন দাঁড়ায় তা উপলব্ধি করার জন্য 'হাসির চাকা'-য় চড়বার মজা স্মরণ করা যেতে পারে। চাকাটির গঠন-প্রকৃতি খুবই সাধারণ। কয়েক মিটার ব্যাসের একটি মসৃণ চাকা খুব জোরে ঘুরতে থাকে। আগ্রহী ব্যক্তিদের ডেকে এর উপর চড়ান হয় এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে বলা হয়। যে কেউ খুব তাড়াতাড়ি রহস্যটির সমাধান করে ফেলতে পারে—এমনকি, পদার্থবিজ্ঞানের অ, আ, ক, খ জানা না থাকলেও। রহস্যটি হল : চাকার কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, নইলে চাকার কেন্দ্র থেকে যত বেশী দূরে থাকা যাবে তত শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা বেশী কঠিন হবে।

এরূপ একটি চাকা অজড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্রের উদাহরণ। এর কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। চাকা সংলগ্ন প্রতিটি বস্তুই v' বেগে

R ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তপথে অর্থাৎ v^2/R ত্বরণ নিয়ে গতিশীল। আগেই দেখা গেছে, অজড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্রে পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিকোণে এই গতির অর্থ একটি mv^2/R মানের অতিরিক্ত বল—এবং এই বল ব্যাসার্ধ বরাবর কেন্দ্রবহির্মুখী। ব্যাসার্ধ বরাবর বলটি 'ভুতুরে চাকা'-র প্রতিটি বিন্দুতেই কাজ করে আর তার জন্য v^2/R ত্বরণের সৃষ্টি হয়। একই বৃত্তের পরিধিস্থ সকল বিন্দুতে ত্বরণের মান সমান। বিভিন্ন বৃত্তের পরিধিতে ত্বরণ কত হবে ? v^2/R সূত্র অনুসারে, কেন্দ্র থেকে দূরত্ব যত কম হবে ত্বরণ তত বাড়বে—এ জাতীয় সহজ-সরল উত্তর তাড়াহুড়ো করে দিলে কিন্তু উত্তরটি সঠিক হবে না। কারণ, চাকার কেন্দ্র থেকে যত দূরে যাওয়া যাবে, তত দ্রুতি বাড়ে। বস্তুত, প্রতি সেকেণ্ডে চাকাটি যদি n বার আবর্তন করে, তবে চাকার বেড়ের উপরে একটি বিন্দু এক সেকেণ্ডে যে পথ (এই বিন্দুর দ্রুতি) অতিক্রম করে তার পরিমাণ $2\pi Rn$।

দেখা যাচ্ছে, কোন বিন্দুর দ্রুতি কেন্দ্র থেকে দূরত্বের সমানুপাতিক। সুতরাং, এবারে ত্বরণের সূত্রটি এভাবে লেখা যায় $a=4\pi^2n^2R$।

যেহেতু, চাকার প্রতিটি বিন্দুতে প্রতি সেকেণ্ডে আবর্তন সংখ্যা একই, আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তটি করতে পারি : ঘূর্ণমান চাকার উপর ক্রিয়াশীল এই 'ব্যাসার্ধ বরাবর অভিকর্ষ'-এর জন্য উৎপন্ন ত্বরণ কেন্দ্র থেকে দূরত্বের সঙ্গে একই অনুপাতে বাড়ে।

এই বিশেষ অজড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্রে উদ্ভূত বল বিভিন্ন বৃত্তে বিভিন্ন। সুতরাং কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত বস্তুর ক্ষেত্রে 'খাড়া' রেখাগুলির অভিমুখও বিভিন্ন হবে। বলা বাহুল্য, চাকার প্রতি বিন্দুতে পৃথিবীর অভিকর্ষ বল সমান। কিন্তু কেন্দ্র থেকে দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে এই ব্যাসার্ধ বরাবর (অরীয়) বল ভেক্টরের দৈর্ঘ্য বাড়ে। সে কারণে, আয়তক্ষেত্রগুলির কর্ণসমূহ খাড়া রেখা (ভূ-পৃষ্ঠ সাপেক্ষে) থেকে ক্রমশ বিচ্যুত হতে থাকে।

'হাসির চাকা' থেকে পিছলে পড়ার সময় কোন ব্যক্তির পর পর কি ধরনের অনুভূতি হতে পারে তা একটু খতিয়ে দেখা যাক। তার দৃষ্টিকোণ থেকে একথা বলা যেতে পারে, তিনি যত কেন্দ্র থেকে দূরে সরে যান তত চাকাটি যেন আরও 'হেলে' যেতে থাকে। এর ফলে একসময় দাঁড়িয়ে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঘূর্ণনচক্রে নিজের জায়গায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে নিজের ভারকেন্দ্রকে এমন এক 'উল্লম্বরেখায়' স্থাপন করতে হবে যে রেখাটি ঘূর্ণাক্ষ থেকে নিজের দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হেলতে থাকে (চিত্র 2·11)।

যাই হোক, এই জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্রের সঙ্গে ঢালু পথের সাদৃশ্য কল্পনা করা কি সম্ভব? অবশ্যই। তবে চাকাটির পরিবর্তে এমন

চিত্র 2.11

একটি তল নিতে হবে যার প্রতিটি বিন্দুতে লব্ধি অভিকর্ষ বল তলের লম্ব-বরাবর হয়। এই ধরনের একটি তল খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। তলটি অধিবৃত্তাকার হবে। নামটি আকস্মিকভাবে আসে নি। অধি-বৃত্তাকার কোন ঘনবস্তুর উল্লম্ব ছেদ একটি অধিবৃত্ত এবং নিক্ষিপ্ত বস্তু এরূপ অধিবৃত্ত পথেই নীচে পড়ে। কোন অধিবৃত্তকে তার অক্ষের চারপাশে ঘোরালে এই জাতীয় ঘনবস্তু উৎপন্ন হয়।
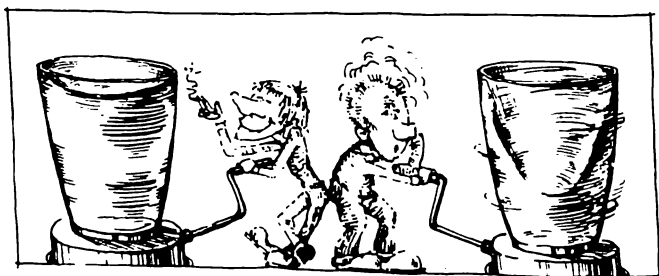
চিত্র 2.12

কোন পাত্রে জল নিয়ে অতি দ্রুত ঘুরিয়ে এই ধরনের তল তৈরী করা খুব সহজ। ঘূর্ণমান তরলের তলটি প্রায় অধিবৃত্তাকার। যে মুহূর্তে ক্রিয়াশীল বল পাত্রের দেওয়ালে জলকণাসমূহকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে

তাদের লম্ব বরাবর হবে, সেই মুহূর্তে জলকণাসমূহের সরণ বন্ধ হবে। প্রতিটি ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট অধিবৃত্তাকার তল উৎপন্ন হয় (চিত্র 2.12)।

অধিবৃত্তাকার কোন বস্তু তৈরী করে এই ধর্মের পরীক্ষামূলক প্রদর্শন সম্ভব। স্থিরবেগে ঘূর্ণমান কোন অধিবৃত্তাকার তলে একটি ছোট্ট বল ছেড়ে দিলে বলটি স্থির অবস্থায় থাকবে। এর অর্থ, বস্তুটির উপর ক্রিয়ারত লব্ধি বল তলের উল্লম্বদিকে থাকছে। অন্যভাবে বলা যায়, একটি ঘূর্ণমান অধিবৃত্ত সমতলের মত আচরণ করে। পৃথিবীর উপর হাঁটলে যেমন সুস্থির বোধ হয়, এই তলের ক্ষেত্রেও সেরকম অনুভূতি ঘটবে। অবশ্য অধিবৃত্তাকার তলে প্রতি পদক্ষেপে তলের উপর উল্লম্ব-রেখার অভিমুখ পাল্টে যাবে।

অপকেন্দ্র বলের ঘটনাকে প্রযুক্তিবিদ্যায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সেণ্ট্রিফিউজ যন্ত্রটি এই নীতির ভিত্তিতে নির্মিত।

সেণ্ট্রিফিউজ যন্ত্রটি আসলে একটি ড্রাম এবং এই ড্রামটি তার অক্ষের চারপাশে দ্রুত ঘুরতে পারে। ড্রামটি জলে ভর্তি করে যদি বিভিন্ন বস্তু এর মধ্যে ফেলা হয় তাহলে কি দেখা যাবে ?

ড্রামের জলে একটি ছোট্ট ধাতব বল ফেলা যাক। এটি পাত্রের নীচে পৌঁছবে, কিন্তু উল্লম্বরেখায় নয়। প্রতি মুহূর্তে বলটি ঘূর্ণাক্ষ থেকে সরে সরে গিয়ে একটি প্রান্তে এসে থেমে যাবে। এবার একটি কর্কের বল ড্রামের মধ্যে ফেলা যাক। এটি বিপরীত আচরণ করে সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণাক্ষের দিকে সরে যাবে এবং সেখানে স্থির হবে।

এই মডেলের একটি সেণ্ট্রিফিউজে যদি ড্রামটির ব্যাস বেশী হয় তাহলে দেখা যায় বলটি কেন্দ্র থেকে যতদূরে চলে যাচ্ছে, তত দ্রুত ত্বরণ বাড়ছে।

এই ঘটনায় আমাদের অবাক হওয়ার কিছু নেই। সেণ্ট্রিফিউজের মধ্যে একটি অতিরিক্ত অরীয় বল কাজ করছে। যদি সেণ্ট্রিফিউজটি প্রচণ্ড গতিতে ঘুরতে থাকে, তাহলে এর পার্শ্বতলই 'তলদেশ' হয়ে দাঁড়ায়। ধাতব বল জলে 'ডোবে', অন্যদিকে কর্কের বল 'ভাসে'। অক্ষ থেকে যত বেশী দূরত্বে কোন বস্তুর 'পতন' ঘটে, সে বস্তুকে তত 'ভারী' বস্তু বলা হবে।

উন্নততর সেণ্ট্রিফিউজে ঘূর্ণনবেগ 60000 আর. পি. এম. অর্থাৎ 10^3 আর. পি. এস. (আবর্তন প্রতি সেকেণ্ডে) পর্যন্ত বাড়ানো যায়।

ঘূর্ণাক্ষ থেকে 10 সে. মি. দূরত্বে অরীয় অভিকর্ষ টানের জন্য ত্বরণ মোটামুটি এরকম দাঁড়ায় ;

$$40 \times 10^6 \times 0{\cdot}1 = 4 \times 10^6 \text{ মি./সেকেণ্ড}^2$$

অর্থাৎ, পার্থিব ত্বরণের 400000 গুণ বেশী। স্পষ্টত, এইসব যন্ত্রে পৃথিবীর অভিকর্ষ বলকে উপেক্ষা করা যায় এবং সেক্ষেত্রে ড্রামের পার্শ্বতলকে 'তলদেশ' হিসাবে দাবি করতে কোন অসুবিধা হয় না।

উপরের আলোচনা থেকে সেণ্ট্রিফিউজের প্রয়োগের ক্ষেত্র বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। মিশ্রণ থেকে ভারী কণাকে হাল্কা কণা থেকে পৃথক করতে সেণ্ট্রিফিউজ ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। 'কর্দমাক্ত তরলটি থিতিয়েছে'—কথাটির অর্থ সকলেই জানেন। কর্দমাক্ত জল অনেকক্ষণ রেখে দিলে তলানি (সাধারণত জল থেকে ভারী) পড়ে, অবশ্য থিতানোর এই পদ্ধতিতে কয়েকমাস লেগে যেতে পারে, কিন্তু খুব ভাল সেণ্ট্রিফিউজের সাহায্যে জলকে পরিষ্কার করা মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার।

প্রতি মিনিটে কয়েকশ হাজার পাক ঘুরিয়ে এই সেণ্ট্রিফিউজের সাহায্যে শুধুমাত্র জলে প্রলম্বিত হাল্কা কণাকে আলাদা করা যায় তাই না, অনেক সান্দ্র তরলের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।

ভার্নিস পরিষ্কার, লবণ শুষ্ক করা, দ্রবণ থেকে কেলাস পৃথক করা —রসায়ন শিল্পের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে সেণ্ট্রিফিউজ ব্যবহার করা হয়। খাদ্যশিল্পে চিনি থেকে সিরাপ আলাদা করার জন্যও এই যন্ত্র কাজে লাগে।

বিভিন্ন ধরনের তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের কঠিন ও তরল উপাদানগুলি পৃথক করার জন্য যেসব সেণ্ট্রিফিউজ ব্যবহার করা হয় তাদের সেপারেটর বলে। দুধের প্রক্রিয়াকরণে মূলত এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে সেপারেটর-এর গতিবেগ 6000 আর. পি. এম.-এর মত, ব্যবহৃত ড্রামের ব্যাসও কম করে 5 মিটার।
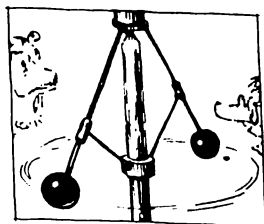
চিত্র 2.13

ধাতুবিদ্যায় সেণ্ট্রিফিউগ্যাল ঢালাই-এর বহুল প্রচলন রয়েছে। 300—500 আর. পি. এম. গতিবেগেই তরল ধাতু ঘূর্ণমান ছাঁচের বহির্গাত্রে বেশ জোরে ধাক্কা দেয়। এই পদ্ধতিতে নির্মিত ধাতব পাইপ বেশ পোক্ত ও সুষম হয়, এতে কোন ফোলা-ফাঁপা বা চিড় থাকে না।

অপকেন্দ্র বলের অন্য আর একটি প্রয়োগের কথা বলা যাক। মেসিনপত্রের ঘূর্ণমান অংশের আবর্তন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সব সরল যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তা 2.13 চিত্রে দেখান হয়েছে। এই যন্ত্রকে সেণ্ট্রিফিউগ্যাল নিয়ন্ত্রক বলে। ঘূর্ণনের বেগ বাড়লে অপকেন্দ্র বল বাড়ে। এতে নিয়ন্ত্রকের ক্ষুদ্র গোলকগুলি অক্ষ থেকে দূরে সরে যায়। ফলে গোলকের সঙ্গে যুক্ত দণ্ডগুলির বিক্ষেপ ঘটে এবং এই বিক্ষেপের ফলে প্রস্তুতকারকের নির্দিষ্ট করে দেওয়া কিছু কিছু তড়িৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যেমন, স্টীম ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে ভাল্‌ভ খুলে যায় এবং অতিরিক্ত বাষ্প বেরিয়ে যায়। এতে ঘূর্ণনবেগ কমে এবং দণ্ডগুলি স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে আসে।

আর একটা মজার পরীক্ষার কথা বলা যেতে পারে। একটি ইলেকট্রিক মোটরের অক্ষের উপর একটা কার্ডবোর্ডের চাকতি লাগান হল। তড়িৎ-সংযোগ ঘটিয়ে ঘূর্ণমান চাকতির গায়ে এক টুকরো কাঠ ছোঁয়ান হল। ইস্পাতের করাতে কাটার মতই এতে একটা মোটা কড়ি-কাঠকে সহজেই দু'টুকরো করে দেওয়া যায়।

কার্ডবোর্ডের টুকরোটি হাত-করাত হিসাবে ব্যবহার করতে গেলে নেহাতই হাস্যকর ব্যাপার হবে। তাহলে ঘূর্ণমান কার্ডবোর্ডটি কাঠ চেরাই করছে কি করে? চাকতির প্রান্তকণাগুলির উপরে প্রচণ্ড অপকেন্দ্র বল ক্রিয়াশীল হয়। যে তির্যক বলের প্রভাবে তলটি বেঁকে যেতে চায় তা এই উদ্ভূত অপকেন্দ্র বলের তুলনায় খুবই সামান্য। কার্ড-বোর্ডের তলকে স্থির রেখে কার্ডবোর্ডটি ঘোরালে তা কাঠের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে।

পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্য উদ্ভূত অপকেন্দ্র বলের প্রভাবে বিভিন্ন অক্ষাংশে বস্তুর ওজনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

মেরুপ্রদেশ অপেক্ষা নিরক্ষীয় অঞ্চলে বস্তুর ওজন যে কম হয় তার কারণ দুটি। বিভিন্ন অক্ষাংশে পৃথিবীর অক্ষ থেকে বস্তুর দূরত্ব বিভিন্ন। বলা বাহুল্য, মেরু অঞ্চল থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলে যাবার সময় এই দূরত্ব বাড়তে থাকে। অধিকন্তু, মেরুবিন্দু পৃথিবীর ঘূর্ণাক্ষের উপরেই অবস্থিত। সেখানে অপকেন্দ্র ত্বরণ, $a=4\pi^2n^2R=0$ (ঘূর্ণাক্ষ থেকে

দূরত্ব R=0)। অন্যদিকে, নিরক্ষরেখায় এই ত্বরণ সর্বাধিক। অপকেন্দ্র বল অভিকর্ষ বলকে কমিয়ে দেয়। তুলাদণ্ডে বস্তুর চাপ (বস্তুর ওজন) নিরক্ষরেখায় সর্বনিম্ন।

পৃথিবীর আকার মোটামুটি গোল ধরে নিলে মেরুপ্রদেশের 1 কি. গ্রাম ওজন নিরক্ষরেখায় আনলে 3·5 গ্রাম কমে যাবে। $4\pi^2 n^2 Rm$-এ $n=1$ আবর্তন/দিন, $R=6300$ কি. মি. এবং $m=1000$ গ্রাম বসালে সহজেই উপরোক্ত ফলটি বার করা যায়। কেবল মাপের এককগুলি সেকেণ্ড এবং সেণ্টিমিটারে প্রকাশ করতে ভুলে গেলে চলবে না।

বাস্তবে অবশ্য এক কিলোগ্রাম ওজনের ঘাটতি 5·3 গ্রাম, 3·5 গ্রাম নয়। এর কারণ, পৃথিবী একটি চাপা গোলক, জ্যামিতিতে একে উপবৃত্তাকার ঘনবস্তু বলে। পৃথিবীর নিরক্ষরেখায় ব্যাসার্ধের তুলনায় মেরুতে ব্যাসার্ধ প্রায় 1/300 ভাগ কম।

মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর এই সংকোচনের কারণও কিন্তু অপকেন্দ্র বল। তবে, এই বল পৃথিবীর সব কণার উপরই ক্রিয়াশীল। বহু বহু আগে, অপকেন্দ্র বলই আমাদের গ্রহের 'ছাঁচ' চাপা করে দিয়েছে।

করিওলী বল (Coriolis forces)

অরীয় অভিকর্ষ বলের অস্তিত্বই ঘূর্ণমান বস্তুতন্ত্রের শেষ কথা নয়। বরং আসুন আমরা আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হই। 1835 সালে ফরাসী বিজ্ঞানী গ্যাসপার্ড গুস্টাভ ডি করিওলী (Gaspard Gustave de Coriolis, 1792—1843) বিষয়টির অবতারণা করেন।
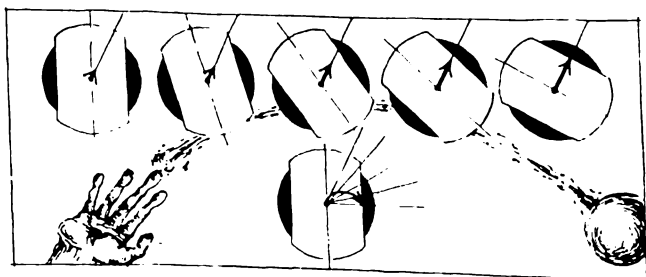
চিত্র 2.14

এমন প্রশ্ন যদি করা যায়ঃ ঘূর্ণমান পরীক্ষাগার থেকে একটি ঋজুগতি কেমন লাগে? 2.14 চিত্রে এই ধরনের একটি পরীক্ষাগারের নকশা দেখান হয়েছে। কোন বস্তুর ঋজু গতিপথকে তার কেন্দ্রগামী একটি রশ্মিচিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে। আমাদের পরীক্ষাগারটির কেন্দ্র বরাবর যখন বস্তুটি চলে তখন তার গতিপথ কেমন দেখায় তা বোঝা যাক। যে চক্রের উপরে পরীক্ষাগারটি রয়েছে তা সুষমবেগে আবর্তন করছে, ঋজুরেখ গতিপথ সাপেক্ষে পরীক্ষাগারটির পাঁচটি অবস্থান চিত্রে দেখা যাচ্ছে। এক, দুই, তিন....সেকেণ্ড পরে পরীক্ষাগার ও বস্তুটির গতিপথে পারস্পরিক অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। উপর থেকে তাকালে পরীক্ষাগারটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘুরছে বলে মনে হবে।

এক, দুই, তিন....ইত্যাদি সেকেণ্ড পরে বস্তুটি গতিপথের কতটা অংশ অগ্রসর হয়েছে তা তীরচিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। স্থির পর্যবেক্ষকের কাছে বস্তুটি সমবেগে সরলরেখায় গতিশীল, সে কারণে প্রতি সেকেণ্ডে বস্তুটি একই পথ অতিক্রম করে।

মনে করা যাক, আমাদের আলোচ্য বস্তুটি যেন একটা সদ্য-রঙ-করা বল এবং চক্রটির উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। চক্রের তলে কি ধরনের ছাপ তৈরী হবে? চিত্র থেকে তা বার করা যায়। পাঁচটি ছবিতে তীরচিহ্ন যে প্রান্তবিন্দুগুলি নির্দেশ করছে সেগুলি একটিমাত্র ছবিতে সন্নিবেশিত করা হল। এখন একটি মসৃণ রেখার সাহায্যে বিন্দুগুলি যোগ করলেই সমস্যা মেটে। এই যোগ করার ফলে যা পাচ্ছি তাতে কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু নেই; ঘূর্ণমান পর্যবেক্ষকের কাছে ঋজুগতি বক্রগতিতে পর্যবসিত হয়েছে। এর থেকে নিচের সিদ্ধান্তটি করা যায়ঃ গতিশীল বস্তু তার যাত্রাপথের সব সময়েই ডান দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। এবারে ধরা যাক চক্রটি যেন দক্ষিণাবর্তী অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরছে। পাঠকের কাছে অংকনের পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়েও বলা যায়, এবারে ঘূর্ণমান পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণে বস্তুটিকে বাম দিকে বিক্ষিপ্ত হতে দেখা যাবে।

আমরা জানি, ঘূর্ণমান বস্তুতে অপকেন্দ্র বলের উদ্ভব হয়। সেখানে অবশ্য গতিপথের এহেন বিকৃতি ঘটে না, কারণ এই বল ব্যাসার্ধ বরাবর ক্রিয়া করে। সুতরাং, অপকেন্দ্র বল ছাড়াও ঘূর্ণমান অক্ষতন্ত্রে অন্য আর একটি বল ক্রিয়া করে। একে **করিওলী বল** বলা হয়।

তাহলে, আগের উদাহরণসমূহে কেন আমরা করিওলী বলের প্রসঙ্গ না এনেই বেশ কায়দা করে আলোচনা শেষ করেছি? তার কারণ, ঘূর্ণমান অক্ষতন্ত্রের ক্ষেত্রে এ জাতীয় বল উদ্ভূত হয় আর তখনও আমরা ঘূর্ণমান পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণে গতির পর্যালোচনা করি নি। ঘূর্ণমান অক্ষতন্ত্রসাপেক্ষে স্থির বস্তুর উপরই অপকেন্দ্র বল কার্যকরী হয় মাত্র। ঘূর্ণমান পরীক্ষাগারে মেঝের সঙ্গে একটা টেবিল স্ক্রু দিয়ে এঁটে দিলে টেবিলটা অপকেন্দ্র বলের অধীন হয়। অন্যদিকে, টেবিল থেকে একটি বল যদি নীচে পড়ে মেঝের উপর গড়াতে থাকে, তার উপর অপকেন্দ্র বল এবং করিওলী বল যুগপৎ ক্রিয়া করে।

করিওলী বলের মান কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে? হিসাবপত্র করে দেখান যায়, কিন্তু হিসাবটা এত জটিল যে, এখানে আলোচনা না করলেই ভাল হয়। বরং হিসাবের ফলাফল বলা যাক।

অপকেন্দ্র বলের মান যেমন ঘূর্ণাক্ষ থেকে বস্তুর অবস্থানের উপর নির্ভর করে, করিওলী বলের ক্ষেত্রে তেমন নয়। এই বলের মান বস্তুর অবস্থান নিরপেক্ষ। বস্তুর বেগ ভেক্টর (অর্থাৎ শুধু মান নয়, ঘূর্ণাক্ষ সাপেক্ষে গতির অভিমুখ-ও)-এর সাহায্যে করিওলী বল বার করা হয়। গতির অভিমুখ ঘূর্ণাক্ষ বরাবর হলে করিওলী বল শূন্য হয়। বস্তুর বেগ ভেক্টর ও ঘূর্ণাক্ষের অন্তর্গত কোণ যত বাড়ে, করিওলী বলের মানও তত বাড়ে। ঘূর্ণাক্ষের সমকোণে গতির ক্ষেত্রে এই বল সর্বাধিক। আমরা জানি, যে কোন বেগ ভেক্টরকে একজোড়া উপাংশে বিশ্লেষ করা সম্ভব এবং যে কোন উপাংশ বরাবর বস্তুর গতি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যায়।

বস্তুর বেগকে ঘূর্ণাক্ষের সমান্তরাল ও অভিলম্বদিকে যথাক্রমে $v_{\parallel}$ এবং $v_{\perp}$ উপাংশে বিভাজন করলে প্রথম উপাংশের ক্ষেত্রে করিওলী বলের সৃষ্টি হয় না। বেগের $v_{\perp}$ উপাংশের জন্য উদ্ভূত করিওলী বলের মান F_c হলে, হিসাব করে দেখান যায়,

$$F_c = 4\pi n v_{\perp} m$$

এখানে m বস্তুর ভর এবং n একক সময়ে ঘূর্ণমান অক্ষতন্ত্রের আবর্তন সংখ্যা। সূত্র থেকে বোঝা যায়, যত দ্রুত অক্ষতন্ত্রটি ঘুরতে থাকে এবং বস্তুটি দ্রুততর বেগে চলে, করিওলী বলের মাত্রাও তত বেশী হয়।

হিসাবপত্র থেকে করিওলী বলের অভিমুখও বার করা সম্ভব হয়েছে। এই বলের অভিমুখ ঘূর্ণাক্ষ ও ঘূর্ণনের অভিমুখের অভিলম্ব। এ ছাড়া,

আগেই বলা হয়েছে, ঘূর্ণমান অক্ষতন্ত্রের বামাবর্তী গতির ক্ষেত্রে এই বল গতিপথের ডানদিকে ক্রিয়া করে।

করিওলী বলের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। পৃথিবী চক্রাকার নয়, গোলকাকৃতি। এজন্য করিওলী বলের প্রভাব বেশ জটিল। ভূপৃষ্ঠে গতির ক্ষেত্রেই শুধু নয়, পতনশীল বস্তুর উপরেও এই বলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

পতনশীল বস্তু কি ঠিক খাড়াভাবে নীচে পড়ে? পুরোপুরি নয়। কেবলমাত্র মেরুবিন্দুতে ঠিক খাড়াভাবে পড়ে। এক্ষেত্রে বস্তুর গতির অভিমুখ ও পৃথিবীর অক্ষ মিলে গেছে, ফলে কোন করিওলী বল নেই। নিরক্ষরেখায় অবস্থাটা আলাদা, এখানে গতির অভিমুখ আর পৃথিবীর ঘূর্ণাক্ষ পরস্পর-লম্ব। উত্তর মেরুতে দাঁড়ালে পৃথিবীর ঘূর্ণন বামাবর্তী মনে হবে। সুতরাং অবাধে পতনশীল বস্তুর গতিপথ ডানদিকে অর্থাৎ পূর্বদিকে সরে যাচ্ছে বলে মনে হবে। পূর্বমুখে এই বিক্ষেপের পরিমাণ নিরক্ষরেখায় সবচেয়ে বেশী এবং যত মেরুর দিকে যাওয়া যাবে, পরিমাণ তত কমতে থাকে।

নিরক্ষরেখায় এই বিক্ষেপের পরিমাণ হিসাব করা যাক। অবাধে পতনশীল বস্তুর ত্বরণ আছে। এ কারণে বস্তু যত ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি আসে, তত করিওলী বল বৃদ্ধি পায়। এ কারণে, মোটামুটি একটা হিসাবের বাইরে আমরা যাচ্ছি না। যদি ধরা যায় একটি বস্তু 80 মিটার উঁচু থেকে পড়ছে, $t=\sqrt{2h/g}$ সূত্র থেকে দেখা যায়, বস্তুটির পতনকাল 4 সেকেণ্ডের মতো। তাহলে পতনের গড় বেগ 20 মি./সেকেণ্ড।

আমাদের করিওলী ত্বরণের $4\pi nv$ সূত্রে এই বেগের মান বসাব। 24 ঘণ্টায় একবার আবর্তনকে সেকেণ্ডে আবর্তন সংখ্যায় পরিণত করলে 1/86,400 আর. পি. এম. পাওয়া যায়। ফলে, করিওলী বলের জন্য ত্বরণের মান $\pi/1080$ মিটার/সেকেণ্ড^2 হয়। এই ত্বরণের জন্য 4 সেকেণ্ডে বস্তুটির $(\frac{1}{2})\ (\pi/1080)\times 4^2=2{\cdot}3$ সে. মি. ত্বরণ ঘটে। আমাদের উদাহরণে পূর্বমুখী বিক্ষেপের পরিমাণ মোটামুটি এই। পতনের অসম বেগ ধরে যথাযথ হিসাব করলে অবশ্য এর কাছাকাছি একটা মান পাওয়া যাবে, তবে ঠিক ঐ সংখ্যাটি নয়।

উত্তর বা দক্ষিণ মেরুতে ভূপৃষ্ঠের সমতল একফালি জায়গা বেছে নিলে তা আমাদের করিওলী বলের আলোচনার শুরুতে যে চাকতিটির কথা বলা হয়েছিল তার থেকে আলাদা বলে মনে হবে না। করিওলী বলের জন্য এইরকম জায়গায় গতিশীল বস্তুর গতিপথের বিক্ষেপ উত্তর

মেরুতে ডানদিকে এবং দক্ষিণ মেরুতে বাম দিকে হবে। করিওলী ত্বরণের উপরোক্ত সূত্রটির সাহায্যে পাঠক সহজেই হিসাব করে দেখতে পাবেন, রাইফেল থেকে 500 মি./সেকেণ্ড বেগে নিক্ষিপ্ত গুলি এক সেকেণ্ডে (যে সময়ে এটি 500 মি. যায়) অনুভূমিক তলে নিশানা থেকে প্রায় 3·5 সে. মি. সরে যাবে।

কিন্তু নিরক্ষরেখায় অনুভূমিক তলে বিক্ষেপ শূন্য হয় কেন? খুব কষ্টকর প্রমাণের অবতারণা না করেও সহজে তা দেখান যেতে পারে। উত্তর মেরুতে বস্তুর যাত্রাপথের বিক্ষেপ ডানদিকে এবং দক্ষিণ মেরুতে বামদিকে। এ দুয়ের মধ্যবর্তী জায়গায় নিরক্ষরেখা, বিক্ষেপ তাই শূন্য। ফুকোর পেণ্ডুলামের কথা আর একবার উল্লেখ করা যাক। মেরুবিন্দুতে পেণ্ডুলামের দোলনতলটি পাল্টায় না। আবর্তনের জন্য পেণ্ডুলামের নীচের ভূপৃষ্ঠটি সরে সরে যায়। নক্ষত্রলোকের পর্যবেক্ষক বিষয়টি এইভাবেই ব্যাখ্যা করবে। কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে ঘূর্ণনরত পর্যবেক্ষক পরীক্ষাটি করিওলী বলের আলোকে বিচার করবে। বস্তুত, করিওলী বলের অভিমুখ পৃথিবীর অক্ষ এবং পেণ্ডুলামের গতি—উভয়েরই লম্ব-দিকে। অন্যভাবে বলা যায়, এই বল পেণ্ডুলামের দোলনতলের অভিলম্ব বরাবর ক্রিয়া করে দোলনতলকে ক্রমাগত ঘুরিয়ে দেয়। পেণ্ডুলামের গতিপথের ছাপ নিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে। 2.15 চিত্রে নকল 'গোলাপ পাপড়ি'র সাহায্যে এই বিক্ষেপ-পথের চেহারা দেখান হয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, পেণ্ডুলামের দোলনকালের মাত্র দেড়গুণ সময়ে 'পৃথিবী' পূর্ণ আবর্তনের এক-চতুর্থাংশ সম্পন্ন করছে। ফুকোর পেণ্ডুলাম আরও অনেক ধীরে ঘোরে। মেরুতে পেণ্ডুলামের দোলনতল এক মিনিটে মাত্র এক ডিগ্রীর এক-চতুর্থাংশ কোণে ঘোরে। উত্তর মেরুতে পেণ্ডুলামের পথ ডানদিকে আর দক্ষিণ মেরুতে বামদিকে মোড় নেয়।

নিরক্ষরেখার তুলনায় মধ্য ইউরোপীয় অক্ষাংশে করিওলী বলের প্রভাব কিছু কম হয়। আমাদের একটু আগের উদাহরণের বুলেটটি সেক্ষেত্রে 3.5 সে. মি.-র পরিবর্তে 2·5 সে. মি. বিক্ষিপ্ত হবে। এক মিনিটে ফুকোর পেণ্ডুলামের বিক্ষেপ কোণ দাঁড়াবে এক ডিগ্রীর ছয় ভাগের একভাগ মাত্র।

করিওলী বলের জ্ঞান কি বন্দুকধারীদের ক্ষেত্রে অপরিহার্য? প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানরা প্যারিসে বোমা বর্ষণের জন্য বিগ্ বার্থাকে ঘাঁটি হিসাবে বেছে নেয়। নিশানা থেকে এর দূরত্ব ছিল 110 কিলোমিটার।

এই দূরত্বে করিওলী বিক্ষেপের পরিমাণ কম করেও 1600 মিটার। বিক্ষেপটি কম নয়। করিওলী বলকে গ্রাহ্যের মধ্যে না ধরে উড়ন্ত প্রাস
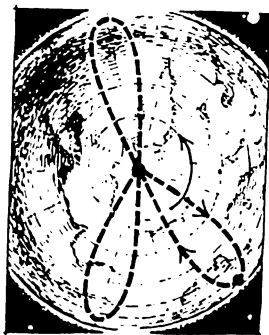
চিত্র 2.15

বহুদূরে নিক্ষেপ করতে চাইলে সেটি ঈপ্সিত গতিপথ থেকে ভালোরকম বিক্ষিপ্ত হবে। করিওলী বলের পরিমাণ (দশ টনের প্রাসের গতিবেগ 1000 কি. মি./ঘণ্টা হলে এই বল প্রায় 25 কিলোগ্রাম বলের সমান) শুধু বেশী বলেই নয়। অনেকক্ষণ ধরে একটানা কার্যকরী থাকে বলেও এইরকম বিক্ষেপ ঘটায়।

বলা বাহুল্য, রকেট-প্রাসের ক্ষেত্রে বায়ুপ্রবাহের প্রভাব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বায়ুপ্রবাহ, করিওলী বল এবং এরোপ্লেন বা উড়ন্ত বোমার ত্রুটিবিচ্যুতি সব কিছু বিচার করে বিমানচালককে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিতে হয়।

বিমানচালক, বন্দুকধারী ছাড়া আর কোন বিশেষজ্ঞকে করিওলী বল সম্পর্কে সম্যক্‌রূপে অবহিত হতে হয়? ভাবতে আশ্চর্য লাগতে পারে। কিন্তু এই বিশেষজ্ঞের দলে রেলপথ নির্মাণকারীরাও পড়েন। করিওলী বলের প্রভাবে একদিকের লাইনের ভিতর অংশ অন্য দিকের তুলনায় বেশী ক্ষয় হয়। ঠিক কোন্ দিকের লাইনে এটা ঘটে তা বলা যায়ঃ উত্তর গোলার্ধে ডানদিকের (ট্রেনের গতি সাপেক্ষে) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাঁদিকের লাইন। নিরক্ষীয় দেশগুলিতে রেলপথ নির্মাণকারীদের এ জাতীয় অসুবিধায় পড়তে হয় না।

একই কারণে রেল লাইনের ক্ষয়-ক্ষতির মত উত্তর গোলার্ধে ডান দিকের তটভূমি ভাঙ্গতে থাকে। নদীগর্ভে বড় ধরনের বিচ্যুতির কারণই করিওলী বল। এর থেকে বলা যায়, উত্তর গোলার্ধে নদীগুলি ডানদিকের বাধাই অপসারিত করতে চায়।

আমরা জানি, নিম্নচাপের অঞ্চলের দিকে প্রবল বায়ুপ্রবাহ ঘটে। এই ঝড়কে সাইক্লোন বলে কেন? আসলে, শব্দটি বৃত্তীয় (cyclic) গতির সূত্র ধরে এসেছে।

চিত্র 2.16

নিম্নচাপ অঞ্চলে বায়ুভরের বৃত্তগতির (চিত্র 2.16) কারণ করিওলী বল। উত্তর গোলার্ধে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহ ডানদিকে বেঁকে যায়। এজন্য উত্তর গোলার্ধে ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে বায়ুপ্রবাহ পশ্চিম দিকে বাঁকে। 2.17 চিত্রে তীর চিহ্নের সাহায্যে তা দেখান হয়েছে।
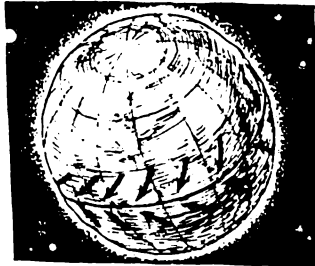
চিত্র 2.17

বায়ুপ্রবাহের ক্ষেত্রে করিওলী বলের মতো এত ক্ষুদ্র একটা বল কেমন করে এত বড় ভূমিকা নিতে পারে? ঘর্ষণ বল নগণ্য বলেই এটা সম্ভব। বায়ু অত্যন্ত সচল পদার্থ, সেই সঙ্গে অতি ক্ষুদ্র বলও যদি দীর্ঘক্ষণ ক্রিয়াশীল থাকে তবে এরকম উল্লেখযোগ্য ফলাফল ঘটাতে পারে।

3. সংরক্ষণ সূত্র

প্রতিক্ষেপ (Recoil)

যারা কোনদিন যুদ্ধে যান নি, তারাও জানেন, কামান থেকে গোলা-বর্ষণের সময় কামান হঠাৎ পিছন দিকে লাফ দেয়। রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়লেও কাঁধে ধাক্কা লাগে। আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার না করেও এই পিছু-হঠা বা প্রতিক্ষেপের সঙ্গে পরিচয় সম্ভব ; একটা টেস্ট-টিউবে কিছু জল নিয়ে কর্ক দিয়ে মুখ বন্ধ করুন। এবারে দুটি সুতোয় বেঁধে টিউবটি অনুভূমিক অবস্থায় ঝুলিয়ে দিন (চিত্র 3.1)। টিউবটির নীচে জ্বলন্ত বার্নার ধরুন, জল ফুটতে শুরু করার দু-চার মিনিটের মধ্যেই কর্ক ছিটকে বেরিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে টিউবও কর্কের বিপরীত দিকে বিক্ষিপ্ত হবে।
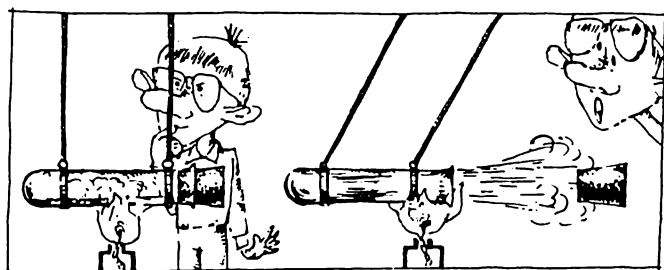
চিত্র 3.1

বাষ্পচাপের জন্য কর্কটি টেস্টটিউব থেকে খুলে যায়। টিউবটির বিক্ষেপের কারণও ঐ বাষ্পচাপ। দুটি গতিই এক এবং অভিন্ন বলের ক্রিয়ায় ঘটল। গুলি ছোঁড়ার ক্ষেত্রে একই জিনিস ঘটে। তফাত শুধু, বাষ্পের বদলে বারুদের দহনজনিত গ্যাস ধাক্কা দেয়।

এই প্রতিক্ষেপ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সমতা নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল। বাষ্প যখন কর্কের উপর ক্রিয়া করে, কর্কও বাষ্পের উপর বিপরীত মুখে ক্রিয়া করে এবং বাষ্পের ভিতর দিয়ে এই প্রতিক্রিয়া টেস্টটিউবে সঞ্চালিত হয়।

হয়ত আপত্তি উঠতে পারে : এক এবং অভিন্ন বল কি কখনও ভিন্ন ভিন্ন ফল ঘটাতে পারে ? সত্যিই তো, রাইফেল পিছন দিকে সামান্যই হঠে, কিন্তু বুলেট বহুদূর ছুটে চলে। আশা করি, পাঠকের মনে এ জাতীয় আপত্তি শেষ পর্যন্ত থাকবে না। সদৃশ বল অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন ফল ঘটাতে পারে। কারণ, বলের ক্রিয়ায় উৎপন্ন ত্বরণ (বলের কাজই ত্বরণ উৎপন্ন করা) বস্তুর ভরের ব্যস্তানুপাতিক। আমাদের আলোচ্য বস্তুগুলির (গোলা, বুলেট, কর্ক) যে কোন একটির ত্বরণের মান এই-ভাবে লেখা যায় : $a_1 = F/m_1$: অন্যদিকে, প্রতিক্ষিপ্ত বস্তুর (কামান, রাইফেল, টেস্টটিউব) ত্বরণ $a_2 = F/m_2$ হবে। যেহেতু, বলটি এক এবং অভিন্ন, আমরা নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি : 'গুলি' ছোঁড়ার মত পারস্পরিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে উৎপন্ন ত্বরণ বস্তুগুলির ভরের ব্যস্তানুপাতিক :

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{m_2}{m_1}$$

এর অর্থ, কামানের ভর গোলার চেয়ে যতগুণ বেশী, কামানের প্রতি-ক্ষেপের ত্বরণ গোলার ত্বরণের চেয়ে ততগুণ কম।

রাইফেলের নলের মধ্যে যতক্ষণ গুলি থাকে ততক্ষণই গুলির ত্বরণ বা রাইফেলের পশ্চাদ্‌গতির ত্বরণ স্থায়ী হয়। এই স্থিতিকাল t দিয়ে সূচিত করা যাক। t সময় পরে ত্বরণযুক্ত গতি সুষম গতিতে পরিণত হয়। হিসাবের সুবিধার জন্য ত্বরণের মান স্থির করা যাক। তাহলে, রাইফেলের নল থেকে গুলির নির্গমনের বেগ $v_1 = a_1 t$ এবং প্রতিক্ষিপ্ত বেগ $v_2 = a_2 t$। যেহেতু উভয় ক্ষেত্রে সময় একই, সুতরাং

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{a_1}{a_2} \quad \text{এবং} \quad \frac{v_1}{v_2} = \frac{m_2}{m_1}$$

অর্থাৎ, পারস্পরিক সংঘাতে বস্তু দুটির বিচ্ছিন্ন হওয়ার বেগ ওদের ভরের ব্যস্তানুপাতিক।

বেগের ভেক্টর প্রকৃতি ধরলে শেষোক্ত সম্পর্কটি এভাবে লেখা যায় : $m_1\mathbf{v}_1 = -m_2\mathbf{v}_2$, ঋণাত্মক চিহ্নের সাহায্যে $\mathbf{v}_1$ এবং $\mathbf{v}_2$ যে বিপরীত-মুখী তা বোঝানো হয়েছে।

পরিশেষে, ভর ও বেগের গুণফল সমীকরণের একধারে এনে লেখা যায় :

$$m_1\mathbf{v}_1 + m_2\mathbf{v}_2 = 0$$

ভরবেগ সংরক্ষণ সূত্র (Law of conservation of momentum)

ভর ও বেগের গুণফলকে বস্তুর ভরবেগ (আর একটি নাম রৈখিক ভরবেগ) বলা হয়। বেগ ভেক্টর রাশি বলে ভরবেগও একটি ভেক্টর রাশি। বলা বাহুল্য, বেগের অভিমুখই ভরবেগের অভিমুখ হবে।

ভরবেগের ধারণা থেকে নিউটনের $F=ma$ সূত্র অন্যভাবে প্রকাশ করা যায়: যেহেতু, $a=(v_2-v_1)/t$, $F=(mv_2-mv_1)/t$ বা, $Ft=mv_2-mv_1$

অর্থাৎ, বল ও বলের ক্রিয়াকালের গুণফল বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের সমান।

প্রতিক্ষেপের ঘটনাটিতে ফেরা যাক।

কামানের প্রতিক্ষেপের ফলাফল সংক্ষেপে এইভাবে লেখা যেতে পারে: গোলাবর্ষণের পরে কামান ও গোলার সামগ্রিক ভরবেগ শূন্য হবে। স্পষ্টতই, গোলাবর্ষণের আগে কামান ও গোলা যখন স্থির ছিল, তখনও এই মোট ভরবেগ শূন্য ছিল।

$m_1v_1+m_2v_2=0$ সমীকরণে গতিবেগ দুটি গোলাবর্ষণের অব্যবহিত পরের বেগ। বস্তু দুটির পরবর্তী গতিকালে, অভিকর্ষ বল এবং বাতাসের প্রতিরোধ ক্রিয়াশীল হয়, অন্যদিকে কামানের উপর ভূপৃষ্ঠের একটি অতিরিক্ত ঘর্ষণ বল কাজ করে। বায়ুশূন্য স্থানে ঝুলন্ত কামান থেকে গোলাবর্ষণ করলে v_1 এবং v_2-র মান আরও অনেক বেশী হত। কামান একদিকে এবং গোলা তার বিপরীতমুখে দ্রুত গতিশীল হত।

আধুনিক গোলাযুদ্ধে গতিশীল শকটে কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়। এরূপ গোলাবর্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য সমীকরণটির রূপ কেমন হবে? আমরা এক্ষেত্রে লিখতে পারি

$m_1u_1+m_2u_2=0,$

এখানে u_1 এবং u_2 শকটসাপেক্ষে যথাক্রমে গোলা ও কামানের বেগ। শকটের বেগ V হলে, স্থির পর্যবেক্ষকের কাছে গোলা ও কামানের প্রতীয়মান বেগ দাঁড়ায়,

$v_1=u_1+V$ এবং $v_2=u_2+V$

আমাদের আগের সমীকরণে u_1 এবং u_2-র মান বসিয়ে পাই:

$(m_1+m_2)V=m_1v_1+m_2v_2$

সমীকরণে ডানদিকের রাশিমালা গোলাবর্ষণের পরে গোলা ও কামানের মোট ভরবেগ সূচিত করে। কিন্তু বাঁদিকের রাশিমালা?

গোলাবর্ষণের আগে কামান ও গোলা মোট $m_1 + m_2$ ভর নিয়ে V বেগে গতিশীল ছিল। সুতরাং, বাঁদিকের রাশিমালা গোলাবর্ষণের আগে গোলা ও কামানের মোট ভরবেগ নির্দেশ করছে।

এখানে প্রকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা হল। একে **ভরবেগ সংরক্ষণ সূত্র** বলে। দুটি বস্তু নিয়ে সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করা হলেও যে কোন সংখ্যক বস্তুর ক্ষেত্রে সূত্রটি প্রযোজ্য হবে। সূত্রটির সারমর্ম কি দাঁড়াল? ভরবেগ সংরক্ষণ সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, আলোচ্য সংঘাতের ক্ষেত্রে বস্তুসমূহের মোট ভরবেগ অপরিবর্তিত বা সংরক্ষিত থাকে।

তবে এটা ঠিক, বাইরের কোন বল বস্তুগুলির উপর ক্রিয়া না করলে তবেই ভরবেগ সংরক্ষণ সূত্রটি খাটে। এরূপ বস্তুসংহতিকে পদার্থ-বিজ্ঞানে নিকট-সম্বন্ধযুক্ত ধরা হয়।

পৃথিবীর অভিকর্ষবল থাকা সত্ত্বেও রাইফেল ও গুলিকে এরূপ একটি নিবট সম্বন্ধের বস্তুসংহতি মনে করা যেতে পারে। বারুদনির্গত গ্যাসের চাপের তুলনায় গুলির ভর অনেক কম এবং অন্যদিকে প্রতিক্ষিপ্ত বেগও এই এক এবং অভিন্ন বলের কারণে উৎপন্ন। পৃথিবীতেই গুলিবর্ষণ ঘটুক বা মহাশূন্যে গতিশীল রকেট থেকেই হোক না কেন, প্রতিক্ষেপ সর্বত্র একই নিয়মে ঘটে।

ভরবেগ সংরক্ষণ সূত্রের সাহায্যে বস্তুসমূহের পারস্পরিক সংঘাত-জনিত অনেক প্রশ্নের সহজ সমাধান পাওয়া সম্ভব। দু-চারটি সংঘর্ষের উল্লেখ করা যেতে পারে। একটা নরম মাটির পিণ্ডকে অনুরূপ একটা পিণ্ডের দিকে জুড়ে দেওয়া হল, উভয়ে গায়েগায়ে লাগা অবস্থায় গতিশীল হবে। রাইফেল থেকে কাঠের গোলায় গুলি ছুড়লে গুলি কাঠের মধ্যে ঢুকে যাবে এবং সেই অবস্থায় বস্তুসংহতি গতিশীল হবে; কোন লোক ছুটে এসে স্থির ঠেলাগাড়ীতে লাফিয়ে উঠলে গাড়ী চলতে শুরু করবে। পদার্থবিজ্ঞানের বিচারে উপরোক্ত উদাহরণগুলি একই ধরনের। ভরবেগ সংরক্ষণ সূত্র থেকে সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহের সংঘর্ষের ক্ষেত্রে বেগের নিয়ম বার করা যায়।

সংঘর্ষের পূর্বে যে কোন জোড়ার মোট ভরবেগ $m_1 v_1 + m_2 v_2$ ধরা হল। সংঘর্ষের পরে তারা একত্রিত হল এবং মোট ভর $m_1 + m_2$ হল। জোড়বদ্ধ বস্তুর বেগ V দ্বারা নির্দেশ করলে

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 \quad (m_1 + m_2) V$$ পাওয়া যায়।

সেখান থেকে, $$V \quad \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$
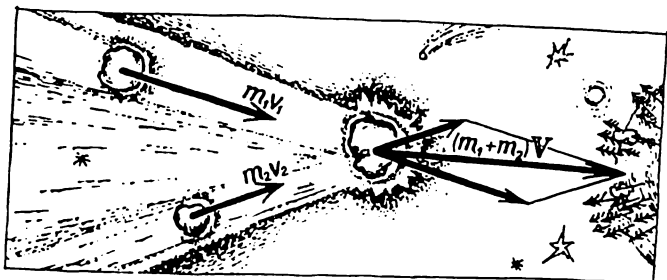
চিত্র 3.2

এবার দেখা যাক, ভরবেগ সংরক্ষণ সূত্রের ভেক্টর রূপটি কি হয়। V-এর রাশিমালায় লবের *mv* ভরবেগ দুটি ভেক্টরের নিয়মে যোগ করতে হবে।

পরস্পর নির্দিষ্ট কোণে গতিশীল দুটি বস্তুর 'জোড়-লাগা সংঘর্ষ' 3.2 চিত্রে দেখান হয়েছে। জোড়বদ্ধ বস্তুর বেগ বার করতে হলে, ভরবেগ ভেক্টরের সাহায্যে উৎপন্ন সামান্তরিকের সংশ্লিষ্ট কর্ণের দৈর্ঘ্যকে বস্তুদুটির মোট ভর দিয়ে ভাগ করতে হবে।

জেট সম্মুখচালন (Jet propulsion)

পা দিয়ে মাটিতে ঠেলা দিলে তবে এগিয়ে চলা সম্ভব হয়; মাঝি দাঁড় দিয়ে জলকে চাপ দিলে তবে নৌকা ভেসে চলে; দাঁড় ছাড়াও প্রপেলার ব্যবহার করা হয় জাহাজ চালানোর সময়; ট্রেন লাইনে চাপ দিয়ে চলে আর অটোমোবাইল রাস্তাকে। ভেবে দেখুন, বরফের রাস্তায় একটি অটোমোবাইল চালু করা কত কঠিন।.

উপরের উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে, গতিসৃষ্টির একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হল, অবলম্বনের উপর ঠেলা দিতে হবে। এমনকি, প্রোপেলারের সাহায্যে বাতাসকে ধাক্কা দিয়ে তবে এরোপ্লেনকে এগিয়ে যেতে হয়।

কিন্তু এটাই কি সব? কোন কিছুকে ধাক্কা না দিয়েও গতিশীল হবার অন্য কায়দা-কানুন থাকতে পারে। বরফের উপর স্কেটিং করার অভিজ্ঞতা থেকে আপনার উপলব্ধি হতে পারে যে, এই ধরনের কৌশল থাকা সম্ভব। ধরুন, একটা ভারী লাঠি নিয়ে স্কেটিং শুরু করলেন। এবারে লাঠিটা সামনে ছুঁড়ে দিলেন—কি ঘটবে? আপনি পিছনদিকে হঠে আসবেন। বরফের উপর চাপ দিয়ে আপনি পিছু হঠছেন—এমন কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে উদয় হচ্ছে না।

একটু আগে আমরা প্রতিক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেছি। বিনা অবলম্বনে বা বিনা ধাক্কায় যে গতি সম্ভব তা প্রতিক্ষেপের ঘটনা থেকে প্রমাণ করা যায়। বায়ুশূন্য স্থানে ধাক্কা দেওয়ার জন্য কোন বস্তুই নেই; কিন্তু সেখানেও প্রতিক্ষেপের জন্য বস্তুর ত্বরণ ঘটতে পারে।

অনেক আগে মজার খেলনা নির্মাণের জন্য একটা পাত্রের মধ্য থেকে বাষ্পধারা দ্রুত নির্গত করা হত। এতে বাষ্পধারার প্রতিক্রিয়ায় পাত্রের প্রতিক্ষেপ ঘটত। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে উদ্ভাবিত একটি বাষ্পীয় টারবাইন 3.3 চিত্রে দেখান হয়েছে। একটি গোলাকার কড়াইকে উল্লম্ব অক্ষের সাহায্যে ঝোলান হয়। বাঁকান নলের মধ্য দিয়ে নির্গত বাষ্প নলকে বিপরীতমুখে ধাক্কা দেয়, ফলে গোলকটি ঘুরতে থাকে।

চিত্র 3.3

আজকের দিনে বাষ্পীয়ধারার প্রতিক্রিয়ায় এই চালনা বা সংক্ষেপে জেট সম্মুখচালন নীতির ব্যবহার শুধু খেলনা তৈরী আর কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা পর্যবেক্ষণের গণ্ডীতে আবদ্ধ নেই। বিংশ শতাব্দীকে কখনও কখনও পারমাণবিক শক্তির শতাব্দী বলা হয়। কিন্তু একে জেটের যুগ বলার পিছনেও কম যুক্তি নেই। শক্তিশালী জেট এঞ্জিনের ফলাফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী—এ কথায় অত্যুক্তি নেই বললেই চলে। বায়ুপোত নির্মাণের কলাকৌশলে শুধুমাত্র যুগান্তর আসেনি, এর ফলে মহাবিশ্বের সঙ্গে মানবজাতির যোগাযোগ সূচিত হয়েছে।

জেট সম্মুখচালন নীতির প্রয়োগে ঘণ্টায় কয়েক হাজার কিলোমিটার বেগে গতিশীল এরোপ্লেন থেকে শুরু করে শত শত কিলোমিটার উচ্চতা

থেকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের কলাকৌশল, কৃত্রিম পাথিব উপগ্রহ আর গ্রহান্তর যাত্রার উপযোগী মহাজাগতিক রকেট নির্মাণ সম্ভব হয়েছে।

জেট এঞ্জিন যন্ত্রের ভিতর থেকে জ্বালানীর দহনে উৎপন্ন গ্যাসকে প্রচণ্ড বেগে নির্গত করার ব্যবস্থা থাকে। গ্যাসের স্রোতধারার বিপরীতে রকেটটি তখন গতিশীল হয়।

মহাকাশে রকেট উৎক্ষেপণের সময় উৎপন্ন চাপ বা ঘাত কত প্রচণ্ড হতে পারে? আমরা জানি, বল একক সময়ে ভরবেগের পরিবর্তনের সমান। আমাদের সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী, রকেটের ভরবেগ নির্গত গ্যাসের ভরবেগ mv পরিমাণ পরিবর্তিত হয়।

জেট চালনার বল এবং এই বল উৎপন্ন করতে জ্বালানী খরচের পরিমাণ আমরা প্রকৃতির এই সূত্রটির সাহায্যে হিসাব করতে পারি। এজন্য দহনজাত গ্যাসটির নির্গমনের একটি বেগ ধরে নেওয়া দরকার। মনে করা যাক, প্রতি সেকেণ্ডে 10 টন গ্যাস 2000 মিটার/সেকেণ্ড বেগে নির্গত হচ্ছে; সেক্ষেত্রে জেট চালনার বল উৎপন্ন হবে 2×10^{12} ডাইন বা প্রায় 2000 টন-বল।

এবার মহাশূন্যে ভ্রমণরত রকেটের গতিপরিবর্তনের হিসাবটা করা যাক।

ΔM ভরের নির্গত গ্যাসের বেগ u হলে ভরবেগ $u\Delta M$; সুতরাং M ভরের রকেটের ভরবেগ $M\Delta V$ পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী, এই দুই রাশি পরস্পর সমান ঃ

$$u\Delta M = M\Delta V, \text{ অর্থাৎ, } \Delta V = u\frac{\Delta M}{M}$$

অবশ্য, এক্ষেত্রে নির্গত গ্যাসের ভর রকেটের ভরের কাছাকাছি হলে উপরোক্ত সূত্রের সাহায্যে রকেটের বেগ হিসাব করা অর্থহীন হয়ে পড়ে। বস্তুত, রকেটের ভর এখানে স্থির ধরা হয়েছে। আর সেক্ষেত্রে, গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলটি হল ঃ ভরের সমান সমান পরিবর্তনের জন্য এক এবং অভিন্ন গতিপরিবর্তন হয়।

সমাকলন বিদ্যার প্রাথমিক নিয়মগুলি জানা থাকলে পাঠক সহজেই কার্যকরী সূত্রটি বার করতে পারেন। সূত্রটি এই রকম ঃ

$$V = u \ln\frac{M_{in}}{M} = 2{\cdot}3u \log\frac{M_{in}}{M}$$

স্লাইড রুলের সাহায্যে দেখা যায়, রকেটের ভর অর্ধেকে নামিয়ে আনলে রকেটের গতি $0{\cdot}7u$ পর্যন্ত হয়।

রকেটের গতি $3u$ মানে তুলতে হলে $m=(19/20)M$ ভরের জ্বালানীর দহন দরকার হবে। তার অর্থ, রকেটের গতি $3u$ বা 6-8 কি. মি./সেকেণ্ড-এ তুলতে রকেটের ভর প্রাথমিক ভরের $\frac{1}{20}$ অংশে নামিয়ে আনা দরকার।

বেগের মান $7u$ করতে হলে রকেটের ভর 1000 গুণ কমাতে হবে।

উপরের হিসাবপত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে, রকেটের গতির জন্য শুধু জ্বালানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা অর্থহীন প্রয়াস ছাড়া কিছু নয়। বেশী জ্বালানী নিলে বেশী জ্বালানী খরচ হবে মাত্র। কারণ, গ্যাস নির্গমনের বেগ নির্দিষ্ট থাকলে, রকেটের গতিবৃদ্ধি করা কার্যত অসম্ভব।

রকেটে উচ্চমাত্রার গতিবেগ পেতে হলে গ্যাস নির্গমনের বেগ বৃদ্ধি করাই প্রাথমিক উপায়। বর্তমানে পারমাণবিক জ্বালানীর ব্যবহার রকেটের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।

গ্যাস নির্গমনের বেগ স্থির থাকলে একই পরিমাণ জ্বালানী ব্যবহার করে বহুস্তর রকেটের সাহায্যে বেগ বৃদ্ধি করা যায়। একস্তর রকেটে জ্বালানীর ভর কমে যায় ঠিকই, কিন্তু খালি আধারগুলি রকেটেই থেকে যায়। তখন অনাবশ্যক এই জ্বালানী-আধারগুলি বহন করতে অতিরিক্ত শক্তি খরচ হয়। কোন আধারের জ্বালানী নিঃশেষ হয়ে গেলে সেটি ফেলে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। আধুনিক বহুস্তর রকেটে নিঃশেষিত আধার ও তৎ-সংলগ্ন নলগুলি ছাড়াও সংশ্লিষ্ট স্তরের ইঞ্জিনগুলিও ফেলে দেওয়া হয়।

এটা ঠিকই, রকেটের অনাবশ্যক অংশগুলি ক্রমাগত ফেলে দেওয়া সবচেয়ে ভাল। কিন্তু এই ব্যবস্থা এখনও উন্নতপর্যায়ের করা যায় নি। উৎক্ষেপণের সময় একটি ত্রিস্তর রকেটের ভর একই 'সর্বোর্দ্ধতা'-যুক্ত একটি মাত্র স্তরের রকেটের ভরের ছয়ভাগের একভাগ মাত্র করা যায়। 'ক্রমহ্রাসমান ভরের' রকেটে প্রাথমিক ভরের হিসাবে ত্রিস্তর রকেটের তুলনায় 15% বেশী সুবিধা পাওয়া যায়।

অভিকর্ষাধীন গতি (Motion under the action of gravity)

দুটি মসৃণ নততলে একটা ছোট গাড়ী গড়িয়ে দেওয়া যাক। এর জন্য দুটি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বোর্ড নেওয়া যেতে পারে—একটি বড় এবং অন্যটি ছোট। বোর্ড দুটি একই অবলম্বনে রেখে দুটি নততল তৈরী হল। এতে একটি তলের নতি অপেক্ষাকৃত কম হবে এবং অন্যটির বেশী। বোর্ড দুটির শীর্ষ কিন্তু একই উচ্চতায় স্থাপিত। এই দুই তলে

পরপর গাড়ীটি গড়িয়ে দিলে কোন্ তলের ক্ষেত্রে গাড়ীর চূড়ান্ত বেগ বেশী হবে ? বেশীর ভাগ লোক এরূপ সিদ্ধান্তে আসবে যে, বেশী খাড়াইসম্পন্ন তলের ক্ষেত্রে গাড়ীর অর্জিত বেগ বেশী হবে।
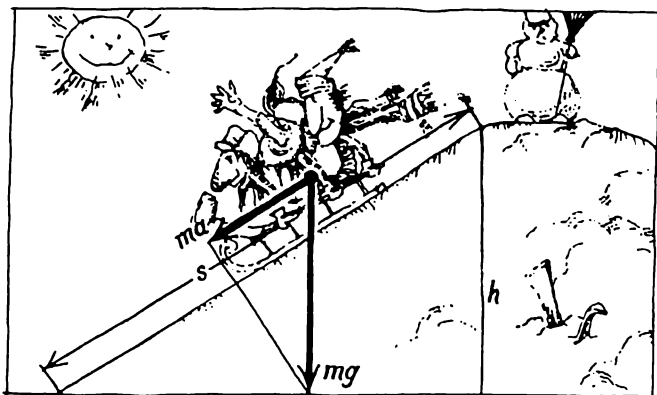
চিত্র 3.4

কিন্তু পরীক্ষা করে দেখান যায়, দুটি ক্ষেত্রেই গাড়ীর চূড়ান্ত বেগ অভিন্ন হবে। গাড়ী নততলে থাকাকালীন একটি স্থির বল গাড়ীর উপর ক্রিয়া করে (চিত্র 3.4), এই বলটি গতিপথ বরাবর অভিকর্ষ বলের উপাংশ। আমরা জানি, a ত্বরণ নিয়ে s পথ অতিক্রম করে একটি বস্তু যে বেগ সঞ্চয় করে তার মান $v = \sqrt{2as}$।

v-এর মান কেন নততলের নতির উপর নির্ভর করে না ? 3.4 চিত্রে আমরা দুটি ত্রিভুজ দেখতে পাচ্ছি। এদের একটি নততলটি নিয়েই গঠিত। এই ত্রিভুজের ক্ষুদ্রতম বাহুটি h—এই উচ্চতা থেকেই গতি শুরু হয়েছে। বস্তুটি ত্বরণ নিয়ে নততলে যে পথ অতিক্রম করেছে তার মান s এবং এটিই ত্রিভুজটির অতিভুজ। একটি বাহু ma এবং অতিভুজ mg-সম্পন্ন যে ক্ষুদ্রতর বলত্রিভুজটি দেখা যাচ্ছে তা বড় ত্রিভুজটির সদৃশ। কারণ, ত্রিভুজ দুটি সমকোণী এবং লম্বদ্বয়ের বিপরীত কোণদ্বয় পরস্পর সমান। সুতরাং অন্য বাহুদুটির অনুপাত অতিভুজদ্বয়ের অনুপাতের সমান। অর্থাৎ,

$$\frac{h}{ma} = \frac{s}{mg} \text{ বা, } as = gh$$

সুতরাং, প্রমাণিত হল, as গুণফলটি বা নততল বরাবর গতিশীল বস্তুর গতি নতি-নিরপেক্ষ, কিন্তু উচ্চতার উপর নির্ভরশীল। দেখা যাচ্ছে, একই উচ্চতা h থেকে গতি শুরু হলে সকল নততলের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বেগ v একই হবে এবং $v = \sqrt{2gh}$। এই মান একই উচ্চতা থেকে অবাধপতনের চূড়ান্ত বেগের সমান।

নততলের উপর h_1 এবং h_2 দুটি বিভিন্ন উচ্চতায় বস্তুটির বেগ কত তা হিসাব করা যাক। প্রথম বিন্দুটি অতিক্রম করার কালে বস্তুর বেগ v_1 এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বেগ v_2 ধরা যাক।

যদি h উচ্চতা থেকে গতি শুরু হয় তাহলে প্রথম বিন্দুতে বেগের বর্গ অর্থাৎ $v_1^2 = 2g(h - h_1)$ এবং দ্বিতীয় বিন্দুতে এই মান, $v_2^2 = 2g(h - h_2)$ হবে। দ্বিতীয়টি থেকে প্রথমটি বিয়োগ করে পাই,

$$v_2^2 - v_1^2 = 2g(h_1 - h_2),$$

এইসূত্র থেকে নতনলে যে কোন দুটি বিন্দুতে বস্তুটির বেগ এবং বিন্দুদ্বয়ের উচ্চতার সম্পর্ক জানা যায়।

দেখা যাচ্ছে, বেগ দুটির বর্গের অন্তরফল কেবলমাত্র উচ্চতা-পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল। আরও বোঝা যায়, সূত্রটি বস্তুর ঊর্ধ্বাভিমুখী এবং নিম্নাভিমুখী—উভয় গতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রথম উচ্চতা দ্বিতীয়টি থেকে কম হলে (ঊর্ধ্বারোহণ), দ্বিতীয় গতিবেগ প্রথম বেগ অপেক্ষা কম হবে।

সূত্রটি এভাবেও লেখা যায়ঃ

$$\frac{v_1^2}{2} + gh_1 = \frac{v_2^2}{2} + gh_2$$

এইভাবে লিখে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় তা সংক্ষেপে এই রকমঃ নততলের সমস্ত বিন্দুতে বেগের বর্গের অর্ধেক এবং উচ্চতা ও g-এর গুণফলের সমষ্টি একই থাকে। অন্যভাবে বললে, এই গতির ক্ষেত্রে, $(v^2/2) + gh$-এর মান সংরক্ষিত।

আমাদের সূত্রটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, পাহাড়ের উপরে ঘর্ষণবিহীন গতি বা যে কোন ধরনের চড়াই-উৎরাই-এর পথে এই সূত্র প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ, যে কোন পথকে অসংখ্য সরলরৈখিক পথের সমষ্টি বলে ধরা যায়। সরলরৈখিক খণ্ডগুলি যত ক্ষুদ্র নেওয়া যাবে, ততই পথগুলির সমষ্টি বক্রপথকে সঠিকভাবে নির্দেশ করবে। ফলে এইরূপ রেখাখণ্ডকে নততলের অংশ বলে ধরে নিয়ে আমাদের সূত্রটি প্রয়োগ করা যায়।

দেখা যাচ্ছে, গতিপথের প্রতিটি বিন্দুতে $(v^2/2)+gh$-এর মান একই। ফলত, বেগের বর্গের পরিবর্তন বস্তুর গতিপথের প্রকৃতি বা দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করছে না, শুধুমাত্র গতিপথে বস্তুর প্রাথমিক ও চূড়ান্ত অবস্থানের উচ্চতা পার্থক্যের উপর নির্ভর করছে।

পাঠকের মনে হতে পারে, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে উপরোক্ত তত্ত্ব যেন মেলে না। যেমন, খুবই সামান্য খাড়াই-সম্পন্ন তল-বরাবর বস্তুকে গড়িয়ে দিলে বস্তু এমনকিছু গতিশীল হয় না, অনেক সময় ধীরে ধীরে থেমেও যায়। বাস্তবে এরকমই ঘটে বা ঘটা উচিত। আমাদের আলোচনায় ঘর্ষণের ভূমিকা ধরা হয় নি। পৃথিবীর অভিকর্ষক্ষেত্রের মধ্যে একমাত্র অভিকর্ষ বলের অধীন বস্তুর ক্ষেত্রেই উপরোক্ত সূত্রটি খাটবে। ঘর্ষণ বল খুব সামান্য হলে, সূত্রটি মোটামুটি খাটে। পাহাড়ের গায়ে মসৃণ বরফের উপর লোহার চাকা-লাগানো স্লেজগাড়ীর ক্ষেত্রে ঘর্ষণবাধা খুবই সামান্য। মসৃণ বরফের উপর এইরকম চড়াই-উৎরাই-এর পথ তৈরী করে প্রথমে বেশ ঢালু পথে স্লেজগাড়ী গড়িয়ে দিলে গতিবেগ ভালোমত বৃদ্ধি পায় এবং পরে দেখা যায়, স্লেজটি যেখানে যাত্রা শেষ করল (যখন সেটি থামল) সেখানকার অর্থাৎ যাত্রা-শেষের উচ্চতা ও যাত্রারম্ভের উচ্চতা সমান, অবশ্য যদি ঘর্ষণ একেবারেই না থাকে। যেহেতু, ঘর্ষণ পুরোপুরি এড়ানো সম্ভব নয়, যাত্রারম্ভের উচ্চতা যাত্রাশেষের উচ্চতা থেকে বেশীই হয়।

অভিকর্ষাধীন বস্তুর চূড়ান্ত গতিবেগ যে গতিপথের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না:—এই তত্ত্বের সাহায্যে আমরা অনেক কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারি।

উত্তেজনাকর চমক হিসাবে সার্কাসে প্রায়শ উল্লম্ব বৃত্তপথে চরকি-পাকের খেলা দেখান হয়। খেলোয়াড় একটু উঁচু প্লাটফর্মে একটা সাইকেল বা গাড়ীতে বসেন। নীচে নামার সময় খেলোয়াড়টির ত্বরণ ঘটে। তারপরে আবার উঠতে থাকেন। এই সময়ে খেলোয়াড়ের মাথা নীচের দিকে। এইভাবে চক্রাকার পথে আবর্তন চলতে থাকে। সার্কাসের ইঞ্জিনিয়ারকে যে সমস্যাটির সমাধান করতে হয় তা একটু খতিয়ে দেখা যাক। সমস্যাটি হল, কি রকম উচ্চতা থেকে নামতে শুরু করলে খেলোয়াড়টি না পড়ে চক্রগতি সম্পূর্ণ করতে পারে? আমরা জানি, প্রয়োজনীয় শর্তটি হল ঃ খেলোয়াড়টিকে গাড়ীতে ধরে রাখতে প্রয়োজনীয় অপকেন্দ্র বল অবশ্যই বিপরীতমুখী অভিকর্ষ বলকে প্রতিমিত করবে। সুতরাং $mg \leqslant mv^2/r$, এখানে, r, চক্রাকার পথের

ব্যাসার্ধ এবং পথের সর্বোচ্চ বিন্দুতে বেগ হল v। এই গতিবেগ অর্জন করতে হলে চক্রাকার পথের সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে কিছু উচ্চতা h থেকে গতি শুরু করা দরকার। খেলোয়াড়টির প্রাথমিক বেগ শূন্য বলে, চক্রের সর্বোর্ধ্ব স্থানে, $v^2=2gh$ লেখা যায়। অন্যদিকে আবার, $v^2 \geqslant gr$ হওয়া দরকার। সুতরাং h এবং চক্রের ব্যাসার্ধের মধ্যে সম্পর্ক দাঁড়ায় $h \geqslant r/2$। তার অর্থ, চক্রের সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে প্ল্যাট-ফর্মের উচ্চতা কমপক্ষে ব্যাসার্ধের অর্ধেক হওয়া দরকার। অবশ্যম্ভাবী ঘর্ষণের কথা মনে রেখে নিরাপদ উচ্চতা নির্বাচন করা উচিত।
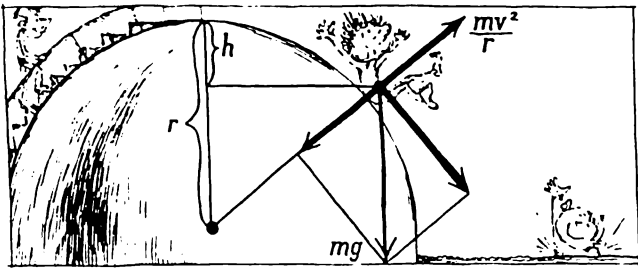
চিত্র 3.5

আর একটি প্রশ্ন। একটি বৃহদাকৃতি গোলগম্বুজের কথা ভাবা যাক। এর তলটি এত মসৃণ যে, ঘর্ষণ নগণ্য ধরা যেতে পারে। গম্বুজটির সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে একটি ছোট বস্তু বেশ জোরে ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে দেওয়া হল। শীঘ্র বা একটু দেরী হলেও, দেখা যাবে, বস্তুটি গম্বুজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্যে পড়তে শুরু করেছে। ঠিক কোন্ মুহূর্তে বস্তুটি গম্বুজ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে তার উত্তর সহজেই পাওয়া যায় : গম্বুজের তল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মুহূর্তে অপকেন্দ্র বল বস্তুটির ওজনের ব্যাসার্ধ বরাবর উপাংশের সমান হবে (এই সময় গম্বুজের তলে বস্তু কোন চাপ দেবে না, ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে)। বিচ্ছিন্ন হবার মুহূর্তে দুটি ত্রিভুজের গঠন 3.5 চিত্রে দেখান হয়েছে। ত্রিভুজদুটিতে লম্ব ও অতিভুজের অনুপাতগুলি থেকে লেখা যায় :

$$\frac{mv^2/r}{mg}=\frac{r-h}{r}$$

এখানে r, গোলগম্বুজটির ব্যাসার্ধ এবং h, গড়ানো পথের প্রাথমিক এবং শেষ বিন্দুর উচ্চতার পার্থক্য। এবারে যাত্রাপথের প্রকৃতির উপর

চূড়ান্ত বেগের নিরপেক্ষতাকে ব্যবহার করা যাক। বস্তুর প্রাথমিক বেগ শূন্য ধরে নিলে, $v^2=2gh$ হয়। v^2-এর এই মান উপরোক্ত অনুপাতে প্রয়োগ করলে $h=r/3$ হয়। সুতরাং, বস্তুটি যে বিন্দুতে বিচ্ছিন্ন হবে তার অবস্থান গম্বুজের সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে $r/3$ পরিমাণ নীচে হবে।

যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণ সূত্র (The law of conservation of mechanical energy)

উপরোক্ত উদাহরণগুলি থেকে এটুকু বুঝতে পারছি, বস্তুর গতির ক্ষেত্রে কোন্ রাশির সাংখ্যমানটি পরিবর্তন করছে না (সংরক্ষিত থাকছে) তা জানতে পারলে অনেক বিষয়ে আমাদের সুবিধা হয়।

এ পর্যন্ত আমরা একটিমাত্র ক্ষেত্রে এরকম রাশির কথা আলোচনা করেছি। অভিকর্ষক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বস্তুর গতির সময় কি হবে ? স্পষ্টতই, $(v^2/2)+gh$ রাশিমালাটি প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রে একই হবে—এরকম ধরা নাও যেতে পারে। কারণ, বস্তুগুলি তখন কেবলমাত্র অভিকর্ষ বলের অধীন থাকে না। তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও কাজ করে। সেক্ষেত্রে কি সম্ভবত সমস্ত বস্তুর এই রাশিমালার সমষ্টি সংরক্ষিত থাকবে ?

এই অনুমান যে ভুল তা এখনি বোঝা যাবে। অনেকগুলি বস্তুর গতির ক্ষেত্রে

$$\left(\frac{v^2}{2}+gh\right)_{\text{body 1}}+\left(\frac{v^2}{2}+gh\right)_{\text{body 2}}+\dots\dots$$

রাশিমালাটির পরিবর্তে নিম্নলিখিত সমষ্টি

$$m_1\left(\frac{v^2}{2}+gh\right)_1+m_2\left(\frac{v^2}{2}+gh\right)_2+\dots\dots$$

সংরক্ষিত থাকে।

বলবিদ্যার এই গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটির প্রমাণের জন্য এবার একটি উদাহরণের কথা ভাবা যাক।

একটি কপিকলের দড়ির দুপ্রান্তে একটি বেশী ভরের বস্তু M এবং একটি কম ভরের বস্তু m ঝোলান আছে। বড় ভারটি ক্ষুদ্রতর ভারকে টানবে—এতে উভয়ে ক্রমবর্ধমান বেগে গতিশীল হবে।

গতিসৃষ্টিকারী বলের পরিমাণ ঐ দুই বস্তুর ওজন পার্থক্য, $Mg-mg$.

যেহেতু ত্বরণযুক্ত গতির সঙ্গে উভয় ভরই যুক্ত, এ কারণে এখানে নিউটনের সূত্রটি দাঁড়ায় :

$$(M-m)g=(M+m)a$$

গতিকালে যে কোন দুটি মুহূর্তের কথা বিবেচনা করলে দেখান যায় যে ভর ও $(v^2/2+gh)$-এর গুণফল স্থির থাকে। অর্থাৎ নিম্নলিখিত অভেদটি প্রমাণ করতে হবে ঃ

$$m\left(\frac{v_2^2}{2}+gh_2\right)+M\left(\frac{v_2^2}{2}+gH_2\right)$$
$$=m\left(\frac{v_1^2}{2}+gh_1\right)+M\left(\frac{v_1^2}{2}+gH_1\right)$$

এখানে বড় হাতের অক্ষরগুলি বড় ভারের সংশ্লিষ্ট রাশিগুলি নির্দেশ করছে। নীচের 1 এবং 2 সংখ্যা দুটি আমাদের আলোচ্য সময়-মুহূর্ত বোঝাচ্ছে।

ভারগুলি পরস্পর দড়ি দিয়ে সংযুক্ত বলে $v_1=V_1$ এবং $v_2=V_2$ হয়। এই মানগুলি বসিয়ে এবং উচ্চতা ডানদিকে এবং বেগ বাঁদিকে নিয়ে গিয়ে আমরা লিখতে পারি।

$$\frac{m+M}{2}\left(v_2^2-v_1^2\right)=mgh_1+MgH_1-mgh_2-MgH_2$$
$$=mg\,(h_1-h_2)+Mg\,(H_1-H_2)$$

অবশ্য, ভারদুটির উচ্চতাপার্থক্য সমান (কিন্তু বিপরীত চিহ্নযুক্ত, কারণ, একটি ভার যখন উপরে ওঠে তখন অন্যটি নীচে নামে)। সুতরাং

$$\frac{m+M}{2}\,(v_2^2-v_1^2)=g(M-m)s$$

এখানে, $s=$ অতিক্রান্ত দূরত্ব।

47 পৃষ্ঠায় আগেই আমরা দেখেছি, a ত্বরণযুক্ত গতির ক্ষেত্রে s পথের দুই প্রান্তবিন্দুতে বেগের বর্গের অন্তরফল ঃ

$v_1^2-v_2^2=2as$

আগের সমীকরণে এই মান বসিয়ে পাই

$(m+M)a=(M-m)g$

এটাই নিউটনের সূত্র এবং আমাদের উদাহরণে আমরা আগেই এটি লিখেছি। সুতরাং, আমাদের প্রয়োজনীয় সূত্রটির প্রমাণ পেলাম যা সংক্ষেপে ঃ $(v^2/2)+gh$-কে ভর* দিয়ে গুণ করলে গুণফল দুটির

---

* অবশ্য, $(v^2/2)+gh$-কে একইভাবে $2m$ বা $m/2$ বা ইচ্ছেমত রাশি দিয়ে গুণ করলেও চলত। আমরা এখানে সাধারণভাবে কেবলমাত্র m দিয়ে গুণ করার কথা বলেছিলাম বলে তাই করা হয়েছে।

সমষ্টি দুটি বস্তুর ক্ষেত্রে স্থির থাকে বা সংক্ষেপে সংরক্ষিত হয়। সুতরাং,

$$\left(\frac{mv^2}{2}+mgh\right)+\left(\frac{Mv^2}{2}+Mgh\right)=\text{ধ্রুবক}$$

একটিমাত্র বস্তুর ক্ষেত্রে সূত্রটি দাঁড়ায়

$\frac{v^2}{2}+gh=$ ধ্রুবক, এটি আগেই প্রমাণ করা হয়েছে।

ভর ও বেগের বর্গের গুণফলের অর্ধেককে বস্তুর গতিশক্তি K বলা হয়।

$$K=\frac{mv^2}{2}$$

পৃথিবীর অভিকর্ষ ক্ষেত্রে বস্তুর ভার ও তার উচ্চতার গুণফলকে স্থিতিশক্তি U বলে।

$$U=mgh$$

সুতরাং দুটি বস্তুর ক্ষেত্রে (অবশ্য দুয়ের অধিক বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রমাণ করা যায়) গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির সমষ্টি স্থির থাকে। উপরোক্ত রাশিমালা থেকে সহজেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

অন্যভাবে বলা যায়, এই বস্তুসমষ্টির স্থিতিশক্তির হ্রাস ঘটলে তবেই গতিশক্তির বৃদ্ধি ঘটতে পারে (অবশ্য উল্টোটিও সমানভাবে সত্য)।

এই সূত্রকে **যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণ সূত্র** বলা হয়।

এটি প্রকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। এর সার্বিক গুরুত্বের কিছুই প্রায় আমরা বলিনি। পরবর্তী সময়ে পদার্থের অণুগতির সঙ্গে পরিচিতি ঘটলে এই সূত্রের সর্বজনীনতা ও সকল প্রাকৃতিক ঘটনায় এই সূত্রের প্রয়োগ পরিষ্কার বোঝা যাবে।

কার্য (Work)

বস্তুকে ঠেলা দেবার বা টানার সময় কোন বাধা না ঘটলে বস্তুর ত্বরণ ঘটে। এখানে বস্তুর গতিশক্তি বৃদ্ধিকে বল কর্তৃক কৃতকার্য A বলা হয়।

$$A=\frac{mv_2{}^2}{2}-\frac{mv_1{}^2}{2}$$

নিউটনের সূত্রানুযায়ী, বস্তুর ত্বরণ এবং সেইসঙ্গে গতিশক্তি বৃদ্ধি বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল সমস্ত বলের ভেক্টর যোগের উপর নির্ভর করে। ফলে অনেকগুলি বলের ক্ষেত্রে, সূত্রোক্ত $A=(mv_2{}^2/2-mv_1{}^2/2)$, বলগুলির সন্ধি কর্তৃক কৃতকার্যের সমান। লব্ধিবলের মানে কৃতকার্য A-কে প্রকাশ করা হয়েছে ধরে নেওয়া যাক।
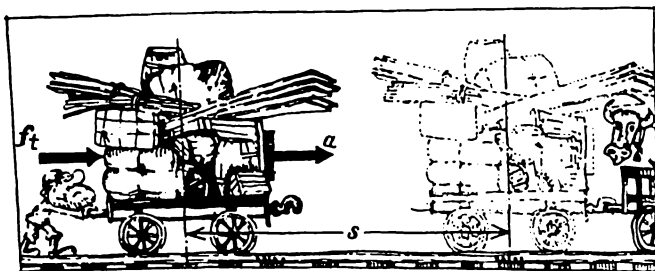
চিত্র 3.6

সহজবোধ্যতার কারণে বস্তুর গতি একটিমাত্র দিকেই ঘটছে এরকম ঘটনায় আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব—যেমন, লাইনের উপর m ভরের একটি গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, আমরা একে লাইন বরাবর ঠেলব (বা টানব) (চিত্র 3.6)।

সমত্বরণের সাধারণ সূত্রানুযায়ী, $v_2{}^2 - v_1{}^2 = 2as$। সুতরাং, s দূরত্বের মধ্যে ক্রিয়াশীল সমস্ত বল কর্তৃক কৃতকার্য,

$$A = \frac{mv_1{}^2}{2} - \frac{mv_1{}^2}{2} = mas$$

ma গুণফলটি গতির অভিমুখে সামগ্রিক বলের উপাংশমাত্র। সুতরাং $A = f_t s$।

অর্থাৎ অতিক্রান্ত দূরত্ব ও সরণের দিকে বলের ক্রিয়াশীল উপাংশের গুণফলের সাহায্যে বল কর্তৃক কৃতকার্যের পরিমাপ করা যায়।

বলের উৎস এবং বস্তুর গতিপথ যে কোন ধরনেরই হোক না কেন, কৃতকার্যের এই সূত্রটি সমানভাবে প্রযোজ্য।

এখন একটি গতিশীল বস্তুর উপরে বল ক্রিয়া করলেও কৃতকার্যের পরিমাণ শূন্য হতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ করিওলী বল কর্তৃক কৃতকার্য শূন্য ধরা যায়। কারণ, বল সেক্ষেত্রে বস্তুর গতির লম্বদিকে ক্রিয়া করে। বলের কোন স্পর্শক উপাংশ না থাকায় কৃতকার্য শূন্য হয়।

বস্তু গতিপথে কোন বাঁক নিলে যদি প্রগতি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে কৃতকার্য থাকে না, কারণ এই অবস্থায় গতিশক্তির কোন পরিবর্তন ঘটে না।

কৃতকার্য কি ঋণাত্মক হতে পারে ? অবশ্যই হতে পারে। যেমন, বস্তুর গতির অভিমুখের সঙ্গে ক্রিয়াশীল বলের অভিমুখ যদি স্থূলকোণ তৈরী করে তাহলে বল গতির অনুকূলে কাজ না করে বরং বাধারই সৃষ্টি করে। সেক্ষেত্রে গতির অভিমুখে বলের স্পর্শক উপাংশটি ঋণাত্মক হয় এবং আমাদের হিসাবে বল ঋণাত্মক কার্য করে।

একমাত্র গতিশক্তির বৃদ্ধি দেখে লব্ধি বল কর্তৃক কৃতকার্যের পরিমাপ করা হয়।

একক বলের ক্ষেত্রে কৃতকার্যের হিসাব করার সময় আমরা f, s সূত্রটি প্রয়োগ করি। কোন অটোমোবাইল সুষম গতিতে রাস্তায় চলতে থাকলে যেহেতু গতিশক্তির বৃদ্ধি নেই, সেজন্য লব্ধি বল কর্তৃক কৃতকার্য শূন্য। কিন্তু গাড়ীর মোটরটির কৃতকার্য, বলা বাহুল্য, শূন্য হয় না—মোটরের কৃতকার্য মোটর কর্তৃক প্রদত্ত ঘাত ও অতিক্রান্ত দূরত্বের গুণফলের সমান। ঘর্ষণ ও অন্যান্য বাধা কর্তৃক ঋণাত্মক কৃতকার্য মোটরের কৃতকার্য পরিপূরণ করে।

পৃথিবীর অভিকর্ষীয় বলের সঙ্গে আমরা ইতিপূর্বেই পরিচিত হয়েছি। এই অভিকর্ষ বলের অনেক চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা আমরা আমাদের 'কার্যের' ধারণা থেকে সহজে করতে পারি। অভিকর্ষের জন্য বস্তু এক অবস্থান থেকে আরেক অবস্থানে আসলে গতিশক্তির বৃদ্ধি ঘটে। গতিশক্তির এই পরিবর্তন কৃতকার্য A-র সমান। কিন্তু শক্তির সংরক্ষণ সূত্র থেকে আমরা জানি, স্থিতিশক্তির হ্রাস ঘটলে গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং, অভিকর্ষ বলের দ্বারা কৃতকার্য স্থিতিশক্তির হ্রাসের সমান ঃ

$$A = U_1 - U_2$$

স্পষ্টতই, স্থিতিশক্তির হ্রাস (বা বৃদ্ধি) এবং অন্যদিকে গতিশক্তির বৃদ্ধি (বা হ্রাস) পরস্পর সমান হবে এবং এই হ্রাস-বৃদ্ধি বস্তুর গতি-নিরপেক্ষ। তার অর্থ, অভিকর্ষ বলের দ্বারা কৃতকার্য বস্তুর গতিপথের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না।

প্রথম অবস্থান থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে যেতে বস্তুটির যে পরিমাণ গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় অবস্থান থেকে প্রথম অবস্থানে আসতে ঠিক সেই পরিমাণ গতিশক্তি হ্রাস পাবে। আরও, অবস্থান দুটির মধ্যে যাতায়াতে বস্তুর পথরেখা এক না হলেও কোন পার্থক্য ঘটবে না। সুতরাং 'যাবার' এবং 'ফেরার' সময় কৃতকার্য অভিন্ন। এইভাবে বস্তুটি বহু পথ পাড়ি দিয়ে যদি আবার তার প্রাথমিক অবস্থানে ফিরে আসে অর্থাৎ প্রাথমিক ও চূড়ান্ত অবস্থান অভিন্ন হয় তাহলে মোট কৃতকার্য শূন্যই দাঁড়ায়।

এমন একটি আশ্চর্য সুড়ঙ্গের কথা ভাবা যাক যার মধ্যে কোন ঘর্ষণ বল নেই। এই সুড়ঙ্গের উচ্চতম বিন্দু থেকে একটি বস্তুকে ছেড়ে দেওয়া হল। বস্তুটি সবেগে নীচে নামবে এবং এতে তার গতিশক্তি বৃদ্ধি পাবে। এই সঞ্চিত গতিশক্তিই বস্তুকে আবার স্বস্থানে ফিরিয়ে আনতে পারে। ফিরিয়ে আনার পর বেগ কি হবে ? বলা বাহুল্য, যে বেগ নিয়ে বস্তুটি যাত্রা শুরু করেছিল, ঠিক সেই বেগেই ফিরে আসবে। বস্তুটির স্থিতিশক্তিও পূর্বমানে ফিরে আসবে। সেক্ষেত্রে তো বস্তুটির গতিশক্তির বৃদ্ধি বা হ্রাস কিছুই ঘটেনি। সুতরাং কৃতকার্য শূন্য।

সমস্ত প্রকার বলের ক্ষেত্রে কিন্তু চক্রাকার পথে (পদার্থবিদের ভাষায় ঃ বদ্ধ) কৃতকার্য শূন্য হয় না। পথ যত দীর্ঘ হবে, ঘর্ষণ কর্তৃক কৃতকার্য তত বেশী হবে, একথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

কোন্ এককে কার্য ও শক্তি পরিমাপ করা হয় (In what units work and energy are measured)

যেহেতু কার্য শক্তির পরিবর্তনের সমান, কার্য এবং শক্তি—বলা বাহুল্য, স্থিতি এবং গতিশক্তি উভয়ই—এক এবং অভিন্ন এককে পরিমাপ করা হয়। কৃতকার্য বল এবং দূরত্বের গুণফলের সমান। এক ডাইন বল এক সেণ্টিমিটার দূরত্ব বরাবর ক্রিয়া করলে কৃতকার্যকে আর্গ বলে ;

$$1 \text{ আর্গ} = 1 \text{ ডাইন} \times 1 \text{ সে.মি.}$$

এক আর্গ কার্য খুব ক্ষুদ্র মানের। অভিকর্ষের বিরুদ্ধে একটা মাছি হাতের বুড়ো আঙুল থেকে তর্জনী বরাবর উড়ে গেলে এই পরিমাণ কার্য করা হয়। কার্য ও শক্তির যে বড় এককটি পদার্থবিজ্ঞানে ব্যবহার করা হয়, তাকে জুল (J) বলে। এক জুল এক আর্গের এক কোটি গুণ।

$$1 \text{ J} = 10^7 \text{ আর্গস্}$$

কার্যের আর একটি ব্যবহৃত একক 1 কিলোগ্রাম বল-মিটার (1 kgf-m)। 1 kgf বল প্রয়োগ করলে যদি প্রয়োগ বিন্দুর সরণ 1 মিটার হয় তাহলে কৃতকার্যকে 1 কিলোগ্রাম বল-মিটার বলে। টেবিল থেকে এক কিলোগ্রাম ওজনের একটা বাটখারা নীচে পড়লে মোটামুটি এই পরিমাণ কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে।

আমরা জানি, $1 \text{ kgf} = 981000$ ডাইন,

$$1 \text{ মিটার} = 100 \text{ সে.মি.}$$

$$\text{সুতরাং } 1 \text{ kgf-m} = 9{\cdot}81 \times 10^7 \text{ আর্গস্}$$

$$= 9{\cdot}81 \text{ J}$$

আবার, $1\ J = 0{\cdot}102\ kgf\text{-}m$

SI একক পদ্ধতিতে কিলোগ্রাম-বল-মিটারের পরিবর্তে কার্য ও শক্তির একক হিসাবে জুল ব্যবহার করা হয়। এক নিউটন বলের প্রয়োগে সরণ 1 মিটার হলে কৃতকার্য এক জুল বলা হয়। এই পদ্ধতিতে বলের সংজ্ঞাও খুব সহজ, সে কারণে SI পদ্ধতির সুবিধা কি কি তা বলে দিতে হয় না।

যন্ত্রের ক্ষমতা ও দক্ষতা (Power and efficiency of machines)

কার্য সম্পাদনে যন্ত্রের সামর্থ্য পরিমাপ করতে ক্ষমতার ধারণা আনা হয়। একক সময়ে কৃতকার্য বা কার্য সম্পাদনের হারকে **ক্ষমতা** বলে।

ক্ষমতার বিভিন্ন একক রয়েছে। সি. জি. এস. পদ্ধতিতে ক্ষমতার একক আর্গ/সেকেণ্ড (erg/s)। আর্গ/সেকেণ্ড অবশ্য খুব সামান্য ক্ষমতা। এ কারণে, বাস্তব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় না। বহুল প্রচলিত ক্ষমতার একক হল জুল/সেকেণ্ড বা ওয়াট (W): $1\ W = 1\ J/s = 10^7$ আর্গস্/সেকেণ্ড। এই এককেও না কুলালে একে হাজার দিয়ে গুণ করে নেওয়া হয়। নতুন এককটিকে তখন **কিলোওয়াট** (kW) বলে।

প্রযুক্তিবিদ্যার শুরু থেকে আমরা হর্সপাওয়ার (hp) বা **অশ্বক্ষমতা** নামে একটি এককের অধিকারী হয়েছি। সেই সময়ে এই নামটি একটি বিশেষ অর্থ বহন করত। ক্ষমতার একক সম্বন্ধে তখন কোন ধারণা না থাকলেও লোকে একটি 10 অশ্বক্ষমতার যন্ত্র কিনলে বলত, যন্ত্রটি 10টি অশ্বের সমান কাজ দেবে। বস্তুত, দুটি অশ্ব কখনই এক রকমের শক্তিসম্পন্ন হয় না। প্রথম যিনি এই এককের প্রবর্তন করেন তিনি মোটামুটি ধরে নিয়েছিলেন, একটি অশ্ব গড়ে প্রতি সেকেণ্ডে 75 kgf-m কার্য করতে পারে। একটা তেজী ঘোড়া এক অশ্বক্ষমতার চেয়ে বেশী হারে কার্য করতে পারে। বিশেষ করে কার্যের আরম্ভে। কিন্তু গড়মানের অশ্বের কার্য করার ক্ষমতা প্রায় 0·5 hp। কিলোওয়াটের সঙ্গে অশ্বক্ষমতার সম্পর্ক হল $1\ hp = 0{\cdot}735\ kW$।

প্রাত্যহিক জীবনে এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় আমরা বহু ধরনের যন্ত্রের সংস্পর্শে আসি। রেকর্ডপ্লেয়ারের চাকতিটি ঘোরাবার জন্য যে ক্ষুদ্র মোটর ব্যবহার করা হয় তার ক্ষমতা 10 W-এর মতো, সোভিয়েত মোটর গাড়ী ভল্গার (*Volga*) ইঞ্জিনের ক্ষমতা 100 hp বা 73 kW, সোভিয়েত যাত্রীবাহী বিমান ‘*IL*-18’-এর ইঞ্জিনের ক্ষমতা 16000

hp। কোন সমবায় কৃষিখামারে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য যে ছোট বৈদ্যুতিক স্টেশন তৈরী করা হয় তার উৎপাদিত ক্ষমতা 100 kW-এর মত। অন্যদিকে, সাইবেরিয়ায় ইনিসাই (*Yenisei*) নদীতে ক্রাশনো-ইয়ার্কস (*Kransnoyarsk*) জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে উৎপাদিত রেকর্ড ক্ষমতা 50 লক্ষ কিলোওয়াট।

ক্ষমতার আলোচ্য এককটি থেকে কার্য বা শক্তির বহুল প্রচলিত এককটির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এককটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kW-h)। এক কিলোওয়াট ক্ষমতা নিয়ে এক ঘণ্টায় কৃতকার্যের পরিমাণকে এক কিলোওয়াট ঘণ্টা বলে। নতুন এই একক থেকে সহজে পুরানো এককে ফিরে যাওয়া যায়ঃ

$$1 \text{ kW-h} = 3{\cdot}6 \times 10^6 \text{J} = 861 \text{ kcl} = 367000 \text{ kgf-m.}$$

শক্তির এতগুলি একক থাকতে নতুন করে একটি এককের প্রবর্তন করার দরকার ছিল কি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ছিল। পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শক্তির বিষয়টি অনিবার্যভাবে এসে পড়ে, সেকারণে পদার্থবিদ্‌গণ প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি করে নতুন এককের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। পরিমাপের অন্যান্য এককগুলি সম্পর্কেও একই কথা খাটে। পরিশেষে, পদার্থবিজ্ঞানের সমস্ত শাখা-প্রশাখার জন্য একটি একীকৃত একক পদ্ধতির (SI একক) প্রবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ল। পুরানো এককের পরিবর্তে জুল ইত্যাদি সুবিধাজনক এককগুলির পাকা-পাকি ব্যবহার হতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। পদার্থবিজ্ঞান পাঠের সময় পাঠকের কাছে কিলোওয়াট ঘণ্টাই শেষ 'আগন্তুক' নাও হতে পারে।

যন্ত্রপাতির প্রয়োজন কি? উত্তর সহজ—কার্য সম্পাদনের জন্য শক্তি উৎসের ব্যবহার। যেমন, ওজন তোলা, অন্য যন্ত্রকে চালানো কিংবা মালপত্র ও যাত্রীপরিবহণ করা, ইত্যাদি। যে কোন যন্ত্রের ক্ষেত্রে তাই ব্যবহৃত শক্তি এবং বিনিময়ে লব্ধ কার্যের তুলনা করা দরকার হয়। সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রাপ্ত কার্য প্রযুক্ত শক্তি বা কার্যের থেকে কম হয়—কিছু পরিমাণ শক্তি যন্ত্রে নষ্ট হয়। লব্ধ কার্য ও কৃতকার্যের অনুপাতকে যন্ত্রের দক্ষতা বলে এবং এটি শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হয়। যেমন, যে যন্ত্রের দক্ষতা শতকরা 90, সেই যন্ত্রে ব্যবহৃত শক্তির অপচয় মাত্র শতকরা দশ। বিপরীতপক্ষে, দক্ষতা শতকরা দশ হলে যন্ত্রটি মাত্র প্রদত্ত শক্তির শতকরা দশভাগ কার্য দেয়।

অবশ্যম্ভাবী ঘর্ষণ বল কমাতে পারলে যান্ত্রিক শক্তিকে কার্যে রূপান্তরিত করার জন্য যন্ত্রের দক্ষতা অনেকাংশে বৃদ্ধি করা যায়। উন্নততর তৈলাক্তকরণ পদ্ধতি, আরও ভাল বল-বেয়ারিং-এর ব্যবহার, মাধ্যমের প্রতিরোধ হ্রাস ইত্যাদির দ্বারা যন্ত্রের দক্ষতা শতকরা একশ ভাগের কাছাকাছি আনা যায়।

যান্ত্রিক শক্তিকে কার্যে রূপান্তরের কালে অনেক সময় একটি মধ্যবর্তী স্তর (যেমন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে) থাকে। উদাহরণ দ্বারা, বিদ্যুৎ শক্তির সঞ্চালনের কথা বলা যায়। স্বভাবতই, এর জন্য কিছু শক্তির অপচয় হয়। কিন্তু এর মান খুব সামান্য, ফলে এজাতীয় স্তর থাকলেও যান্ত্রিক শক্তিকে কার্যে পরিণত করার ক্ষেত্রে শক্তির মোট অপচয় খুব কম মানে নামিয়ে আনা যায়।

শক্তির অপচয় (Energy loss)

পাঠক সম্ভবত লক্ষ্য করে থাকবেন, যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণ সূত্র ব্যাখ্যা করার সময় আমরা বারবার একথা বলেছিঃ "ঘর্ষণ না থাকলে...., যদি ঘর্ষণ না থাকতে....ইত্যাদি।" কিন্তু যে কোন গতির ক্ষেত্রে ঘর্ষণ একটি অপরিহার্য বাধা। কিন্তু এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে যে সূত্রটি উপস্থাপিত করা হয়েছে, তার যৌক্তিকতা তাহলে কোথায়? এই আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে আমরা ঘর্ষণের কিছু ফলাফল নিয়ে এখন আলোচনা করছি।

ঘর্ষণ গতির বিরুদ্ধে কাজ করে এবং যে কারণে ঘর্ষণের কৃতকার্য ঋণাত্মক। এর ফলে যান্ত্রিক শক্তির অপচয় অবশ্যম্ভাবী।

এই অবশ্যম্ভাবী যান্ত্রিক শক্তির অপচয়ের ফলে কি বস্তুর গতি স্তব্ধ হতে পারে? প্রতিটি গতিই যে ঘর্ষণের দ্বারা বন্ধ হতে পারে না—এ ধারণা সৃষ্টি করা বোধ হয় কঠিন হবে না।

একটি আবদ্ধ তন্ত্রে পরস্পর ক্রিয়াশীল কয়েকটি বস্তু কল্পনা করা যাক। আবদ্ধ তন্ত্রে ভরবেগ সংরক্ষণসূত্র যে কার্যকরী হয় তা আমাদের জানা আছে। সামগ্রিকভাবে একটি আবদ্ধ তন্ত্রের কোন ভরবেগের পরিবর্তন হয় না, ফলে সমগ্র তন্ত্র বা ব্যবস্থাটি সুষমবেগে সরলরেখায় গতিশীল। তন্ত্রের বিভিন্ন অংশের আপেক্ষিক বেগ অবশ্য ঘর্ষণের জন্য পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তন্ত্রটির বেগ ও দিকের উপর ঘর্ষণের প্রভাব পড়ে না।

প্রকৃতিতে কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণ সূত্র নামে আর একটি সূত্রও (পরে এর সঙ্গে পরিচয় করানো যাবে) আছে। এই সূত্র অনুযায়ী বলা যায়, ঘর্ষণের দ্বারা তন্ত্রটির সুষমগতির কোন পরিবর্তন ঘটে না।

সুতরাং, ঘর্ষণের অস্তিত্বের জন্য তন্ত্রটির অন্তর্গত বস্তুসমূহের গতি বন্ধ হতে পারে, কিন্তু তন্ত্রটির সুষমবেগে সরলরৈখিক গতির ক্ষেত্রে ঘর্ষণ বাধাস্বরূপ হতে পারে না।

পৃথিবীর ঘূর্ণনবেগের যদি সামান্য পরিবর্তন ঘটে তাহলে তার জন্য পার্থিব বস্তু একে অপরের উপর ঘর্ষণ প্রয়োগ করবে না, কারণটি হল—পৃথিবী একটি বিচ্ছিন্ন তন্ত্র নয়।

ভূপৃষ্ঠে সকল বস্তুর গতির ক্ষেত্রে ঘর্ষণ কাজ করবে এবং তার জন্য তাদের যান্ত্রিক শক্তির অপচয় ঘটবে। সুতরাং কোন বাহ্যিক সাহায্য না পেলে এ জাতীয় গতি বন্ধ হতে বাধ্য।

প্রকৃতির নিয়মই তাই। কিন্তু কেউ যদি প্রকৃতির উপর টেক্কা দেন? তাহলে……তিনি নিশ্চয়ই শাশ্বত বা চিরন্তন গতি সৃষ্টি করতে পারবেন।

চিরন্তন গতি (Perpetuum mobile)

পুসকিনের লেখা "সীনস্ ফ্রম দি ডেজ অফ নাইটহুড" গ্রন্থের একটি প্রধান চরিত্র বারটোল্ড চিরন্তন গতি সৃষ্টির স্বপ্ন দেখতেন। "চিরন্তন গতি কি?"—সংলাপের উত্তরে বারটোল্ড জবাব দিচ্ছেন—"চিরন্তন গতি চিরকালীন গতিই। এই গতির সন্ধান পেলে মানুষের সৃষ্টির কোন সীমারেখা থাকবে না। স্বর্ণসন্ধান একটি লোভউদ্রেককারী বিষয়, কোন একটি আবিষ্কার কৌতূহলোদ্দীপক ও লাভজনক হতে পারে, কিন্তু চিরন্তন গতির সমস্যার সমাধান জানতে পারলে……."

চিরন্তন গতিদায়ক যন্ত্র কেবলমাত্র যান্ত্রিক শক্তির অপচয় রোধ করে না, এই যন্ত্র যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণ সূত্রেরও বিরুদ্ধতা করে। কারণ, আমরা জানি, এই সংরক্ষণ সূত্র কেবলমাত্র ঘর্ষণবিহীন আদর্শ অবস্থায় খাটে। চিরন্তন গতির যন্ত্র তৈরী করা সম্ভব হওয়া মাত্র তা চাকা ঘোরানো বা বোঝা তোলার মত কাজে 'নিজে নিজেই' চলতে থাকবে। যন্ত্রটি অবিরাম ও চিরস্থায়িভাবে কাজ করতে থাকবে এবং কোন জ্বালানী, মানুষের দৈহিক সামর্থ্য বা জলপ্রপাতের শক্তি—সংক্ষেপে, বাহ্যিক কোন সাহায্যের দরকার লাগবে না।

প্রমাণ নথিপত্র ঘেঁটে দেখা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও এই ধরনের চিরন্তন গতির যন্ত্রের 'বাস্তবতা' সম্বন্ধে মানুষের চিন্তাভাবনা ছিল। মজার ব্যাপার, প্রায় ছয় শতক পরে, 1910 সালে মস্কোর একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে ঠিক এই জাতীয় 'প্রকল্পের' কথা 'বিবেচনা' করার জন্য উপস্থাপিত করা হয়েছিল।
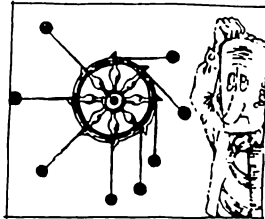
চিত্র 3.7

3.7 চিত্রে এই ধরনের একটি যন্ত্রের রূপরেখা দেখান হয়েছে। আবিষ্কারকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, চাকাটি ঘুরতে থাকলে ভারগুলি পিছনে ছিট্‌কে যাবে এবং এতে চাকার গতি বজায় থাকবে। কারণ, অক্ষ থেকে ভারগুলির দূরত্ব বেশী হওয়ায় অন্য অংশের তুলনায় বেশী চাপ দেবে। কোনক্রমেই জটিল বলা চলে না এমন 'যন্ত্র' তৈরী করে উদ্ভাবক নিজেই দেখতে পান—জড়তার জন্য দু'একবার চাকা ঘুরলেও শেষ পর্যন্ত থেমে যাচ্ছে। এতে কিন্তু তিনি মোটেই হতোদ্যম হন নি। ভাবটা এরকম, সামান্যই ভুল হয়েছে ঃ লিভারগুলি আরও বড় আর উদ্গত অংশগুলি আকারে পরিবর্তিত করা দরকার ছিল। এ সব সত্ত্বেও এই ধরনের নিষ্ফল প্রচেষ্টায় বহু পণ্ডিতম্মন্য আবিষ্কারক সারা জীবন ব্যয় করেছেন। বলা বাহুল্য, সকল প্রচেষ্টার 'সাফল্য' একই।

মোটের উপর, অনন্ত গতিযুক্ত যন্ত্রের পরিকল্পনা খুব বেশী বিভিন্ন ধরনের ছিল না—বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় চাকার কার্যনীতি মোটামুটিভাবে আমাদের পূর্ববর্ণিত চাকার মতো। উদাহরণ হিসাবে নাম করা যায় ঃ 3.8 চিত্রের হাইড্রলিক যন্ত্র, এটি 1634 সালে উদ্ভাবিত হয় ; সাইফন বা কৈশিক নলযুক্ত যন্ত্র (চিত্র 3.9), জলে ভারহ্রাসের যন্ত্র (চিত্র 3.10) অথবা চুম্বকে লৌহজাতীয় বস্তুর আকর্ষণকে ভিত্তি করে নির্মিত যন্ত্র। এর কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য কিসের বিনিময়ে অনন্ত গতি পাওয়া যাবে উদ্ভাবক তার কোন ধারণাই দিতে পারেন নি।

শক্তির সংরক্ষণ সূত্র আবিষ্কারের আগেই 1775 সালে ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমীর একটি সরকারী ইস্তাহারে অনন্ত গতিযুক্ত যন্ত্রের অসম্ভাব্যতার সমর্থন মেলে। ঘোষণায় ছিল—অনন্ত গতিযুক্ত যন্ত্রের আর কোন প্রকল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রমাণের জন্য গৃহীত হবে না।

চিত্র 3.8

চিত্র 3.9

চিত্র 3.10
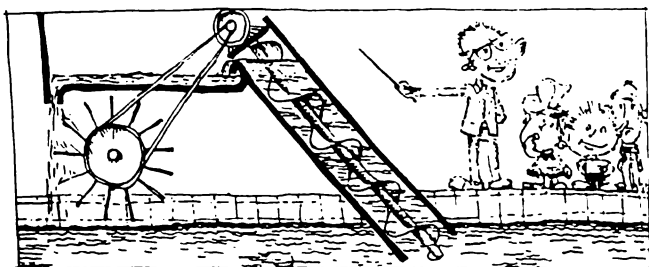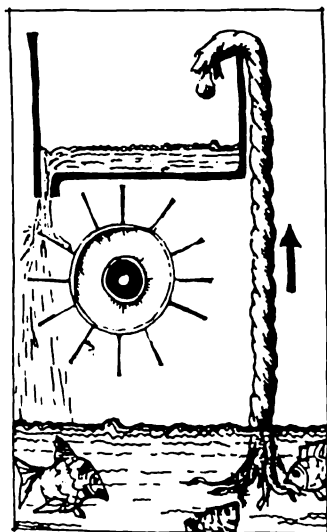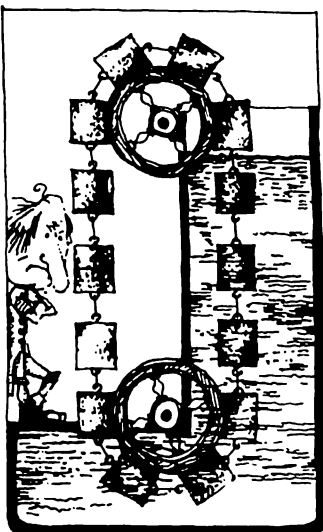
সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বহু বিজ্ঞানী অনন্ত গতিদায়ক যন্ত্রের অসম্ভাব্যতাকে তাদের প্রমাণের ভিত্তি হিসাবে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে

নিয়েছিলেন। বিজ্ঞানে শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের অবতারণা এর অনেক পরের ঘটনা।

বর্তমানে এটা পরিষ্কার, যে সব উদ্ভাবক অনন্ত গতির যন্ত্র সৃষ্টিতে উৎসাহী তারা কেবল পরীক্ষামূলক প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বাধা পান তাই না, প্রাথমিক যুক্তিস্তরেই একটি ভুল করে থাকেন। কারণ, তাদের ধারণা বলবিদ্যার সূত্রের প্রত্যক্ষ ফলাফল এবং সেই যুক্তি থেকেই তারা তাদের 'উদ্ভাবন' ব্যাখ্যা করতে চান।

অনন্ত গতিযুক্ত যন্ত্রের অনুসন্ধানে সামগ্রিক ব্যর্থতার বোধ করি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এই ব্যর্থতা শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের আবিষ্কারের পরিপন্থি না হয়ে তার দৃঢ়মূল ভিত্তি রচনা করেছে।

সংঘর্ষ (Collisions)

দুটি বস্তুর সংঘর্ষের ক্ষেত্রে ভরবেগ স্থির থাকে। বিভিন্ন ধরনের ঘর্ষণের জন্য অবশ্য শক্তির পরিমাণ হ্রাস পায়—একথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

অবশ্য, সংঘর্ষকারী বস্তুগুলি হাতীর দাঁত বা ইস্পাতের মতো কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থে নির্মিত হলে এই শক্তি হ্রাস অতি সামান্য হয়। যে সমস্ত সংঘর্ষের ক্ষেত্রে সংঘর্ষের আগে ও পরে গতিশক্তির মান একই থাকে তাদের **আদর্শ স্থিতিস্থাপক** সংঘর্ষ বলে।

উচ্চমানের স্থিতিস্থাপক বস্তুর ক্ষেত্রেও গতিশক্তির সামান্য হ্রাস ঘটে। যেমন, হস্তিদন্তনির্মিত বিলিয়ার্ড বলের ক্ষেত্রে এই মান 3—4%-এর মত।

গতিশক্তি সংরক্ষণ তত্ত্বের সাহায্যে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের অনেক প্রশ্নের সমাধান করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন ভরের কয়েকটি বলের মুখোমুখি স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের কথা ধরা যাক। ভরবেগ সমীকরণটি তখন দাঁড়ায় (আমরা ধরে নিচ্ছি যে, দ্বিতীয় বলটি সংঘর্ষের পূর্বে স্থির অবস্থায় ছিল):

$$m_1 v_1 = m_1 u_1 + m_2 u_2$$

এবং শক্তির সমীকরণটি

$$\frac{m_1 v_1^2}{2} = \frac{m_1 u_1^2}{2} + \frac{m_2 u_2^2}{2}$$

এখানে, v_1 সংঘর্ষের পূর্বে প্রথম বলটির বেগ এবং u_1 ও u_2 সংঘর্ষের পরে বল দুটির বেগ।

যেহেতু বস্তুদ্বয়ের গতি সরলরৈখিক (রেখাটি বল দুটির কেন্দ্রের সংযোজক রেখা—মুখোমুখি সংঘর্ষের ক্ষেত্রে এরকমই বোঝায়) বলে মোটা হরফের ভেক্টরের পরিবর্তে বাঁকা হরফের ভেক্টর নেওয়া হয়েছে।

প্রথম সমীকরণটি থেকে পাই

$$u_2 = \frac{m_1}{m_2}(v_1 - u_1)$$

u_2-এর এই মান শক্তির সমীকরণে বসালে

$$\frac{m_1}{2}(v_1^2 - u_1^2) = \frac{m_2}{2}\left[\frac{m_1}{m_2}(v_1 - u_1)\right]^2$$

সমীকরণটির একটি সমাধান $u_1 = v$ এবং এর থেকে $u_2 = 0$ পাওয়া যায়। এই সমাধান আমাদের কোন কাজে আসে না, কারণ $u_1 = v_1$ এবং $u_2 = 0$ হওয়ার অর্থ, বল দুটি আদপে কোন সংঘর্ষ করেনি। ফলে অন্য সমাধানটি বার করা দরকার। $m_1(v_1 - u_1)$ দিয়ে ভাগ করলে পাই

$$\tfrac{1}{2}(v_1 + u_1) = \tfrac{1}{2}\frac{m_1}{m_2}(v_1 - u_1)$$

অর্থাৎ, $m_1v_1 + m_2u_1 = m_1v_1 - m_1u_1$

বা, $(m_1 - m_2)v_1 = (m_1 + m_2)u_1$

এর থেকে সংঘর্ষের পরে প্রথম বলটির বেগের যে মান পাই তা হল:

$$u_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_1$$

গতিশীল বলটির ভর কম হলে স্থির বলের সঙ্গে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের দরুন ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে (u_1 ঋণাত্মক)। m_1, m_2 অপেক্ষা বড় হলে, উভয় বলই সংঘর্ষের অভিমুখে গতিশীল হবে।

বিলিয়ার্ড খেলার সময় ঠিক মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্য প্রায়ই এরকম দৃশ্য দেখা যায়: সংঘাতকারী বলটি হঠাৎ থেমে যায় আর টার্গেট বলটি পকেটে ঢুকে যায়। আমাদের সমীকরণ থেকে ঘটনাটির এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বল দুটির ভর সমান, ফলে সমীকরণ অনুযায়ী $u_1 = 0$, সুতরাং $u_2 = v_1$। এতে সংঘাতকারী বলটি থেমে যায় এবং দ্বিতীয় বলটি প্রথম বলটির বেগে গতি শুরু করে। মনে হয় বলদুটি যেন পরস্পর বেগ বিনিময় করল।

স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের নিয়মের সাহায্যে একই ভরের বস্তুর মধ্যে তির্যক সংঘর্ষের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে (চিত্র 3.11)।

দ্বিতীয় বস্তুটি সংঘর্ষের পূর্বে স্থির থাকলে ভরবেগ ও শক্তির সংরক্ষণ সূত্র থেকে লেখা যায় ঃ

$$m\mathbf{v}_1 = m\mathbf{u}_1 + m\mathbf{u}_2$$

$$\frac{mv_1^2}{2} = \frac{mu_1^2}{2} + \frac{mu_2^2}{2}$$

ভরের অপনয়নের পর

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$$

$$v_1^2 = u_1^2 + u_2^2$$

$\mathbf{v}_1$ ভেক্টরটি $\mathbf{u}_1$ এবং $\mathbf{u}_2$ ভেক্টর দুটির যোগ ; এর থেকে বোঝা যায়, বেগ ভেক্টরগুলি একটি ত্রিভুজ গঠন করে।
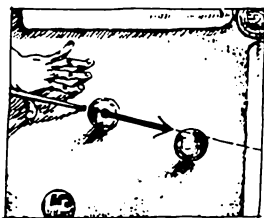
চিত্র 3.11

ত্রিভুজটি কি ধরনের হবে ? পিথাগোরাসের উপপাদ্যটি স্মরণ করুন। আমাদের দ্বিতীয় সমীকরণটি এই উপপাদ্যেরই গাণিতিক রূপ। সুতরাং আমাদের বেগ ত্রিভুজটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ, যার অতিভুজ $\mathbf{v}_1$ এবং অন্য বাহু দুটি $\mathbf{u}_1$ এবং $\mathbf{u}_2$। সুতরাং $\mathbf{u}_1$ এবং $\mathbf{u}_2$ পরস্পর লম্ব। দেখা যাচ্ছে, তির্যক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে মজার ফলাফলটি হল, সমান ভরের বস্তু হলে বস্তুদুটি পরস্পর লম্বদিকে ছিটকে যাবে।

4. দোলন

সাম্য (Equilibrium)

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাম্য বজায় রাখা বেশ কষ্টসাধ্য—যেমন টান করে বাঁধা দড়ির উপরে হাঁটার ব্যাপারটি। আবার দোলনচেয়ারে স্থির হয়ে বসে থাকার মধ্যে বাহবা পাবার কিছু নেই। কিন্তু এক্ষেত্রেও চেয়ারস্থিত ব্যক্তির সাম্য বজায় থাকে।

উদাহরণ দুটির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? কোন্ ক্ষেত্রে 'নিজে থেকেই' সাম্য বজায় থাকে বলে মনে হয়?

সাম্যের শর্ত সম্বন্ধে কোন অস্পষ্টতা থাকার অবকাশ নেই। বস্তুর উপর ক্রিয়ারত বলসমূহ পরস্পরকে প্রশমিত করলে বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে না ; অন্যভাবে বলা যায়, বলগুলির লব্ধি শূন্য হয়। সাম্যের জন্য এটি অবশ্য একটি প্রয়োজনীয় শর্ত, কিন্তু এই শর্তই কি যথেষ্ট?
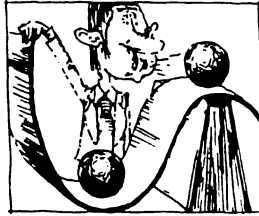
চিত্র 4·1

কার্ডবোর্ডের সাহায্যে সহজেই একটি পাহাড়ের পার্শ্বদৃশ্যের প্রতিরূপ তৈরী করা যায়, 4.1 চিত্রে তাই দেখান হয়েছে। এরূপ পাহাড়ের গায়ে একটি বল কোন্ জায়গায় রাখা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে বলটি বিভিন্ন আচরণ করবে। পাহাড়ের ঢালের উপর কোন জায়গায় বলটি রাখলে তার উপর একটি বল ক্রিয়া করবে এবং বলটি নীচে গড়িয়ে পড়বে। ক্রিয়াশীল বলটির কারণ অভিকর্ষ বা আরও সঠিকভাবে বলটির অবস্থানে পাহাড়ের গায়ে অভিকর্ষ বলের স্পর্শক উপাংশ। এটা সহজেই বোঝা যায়, ঢাল যত কম হবে স্পর্শক উপাংশটির মানও তত কম হবে।

মোটের উপর আমাদের এখন উদ্দেশ্য হল, পাহাড়ের কোন্ কোন্ অংশে বলটি রাখলে অভিকর্ষ বল সম্পূর্ণরূপে অবলম্বনের লম্ব প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রশমিত হয় সেই সেই অংশের খোঁজ করা। এই সমস্ত অবস্থানে স্বভাবতই লব্ধি শূন্য হবে। পাহাড়ের সর্বোচ্চ বিন্দু অর্থাৎ চূড়ায় এবং সর্বনিম্ন বিন্দু অর্থাৎ খাদে এই শর্ত খাটে। এই দুই অবস্থানে স্পর্শকদ্বয় অনুভূমিক হয় এবং বলটির উপর লব্ধিবলের মান শূন্য হয়।

এখন যদিও পাহাড়ের চূড়ায় লব্ধিবল শূন্য, তা সত্ত্বেও সেখানে আমাদের বলটি রাখা সম্ভব হবে না বা সম্ভব হলে একমাত্র যে কারণে হবে তা ঘর্ষণবল। ছোট্ট একটু ধাক্কা বা আলতো স্পর্শে বলটি ঘর্ষণ অতিক্রম করে স্থানচ্যুত হবে এবং নীচে গড়িয়ে পড়বে।

বলটি এবং পাহাড়ের গা উভয়েই মসৃণ হলে একমাত্র খাদের অবস্থানেই সাম্য ঘটতে পারে। ধাক্কা বা বায়ুপ্রবাহের জন্য বলটি সাময়িকভাবে স্থানচ্যুত হলেও আবার নিজেই নিজের সাম্য অবস্থানে ফিরে আসবে।

খাদের মধ্যে (বা গর্ত কিংবা নীচু জায়গায়) বস্তুর অবস্থাকে প্রকৃতপক্ষে সাম্য-অবস্থা বলা যেতে পারে। বস্তুটিকে তার এই অবস্থান থেকে বিক্ষিপ্ত করলেও কোন একটি বল তাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনে। পাহাড়ের চূড়ায় কিন্তু অবস্থাটি অন্যরকম: এক্ষেত্রে বস্তুটি স্থানচ্যুত হলে বস্তুটির উপর ক্রিয়ারত বল তাকে ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে আরও দূরে নিয়ে চলে। সুতরাং, লব্ধিবলের মান শূন্য হওয়া একটি প্রয়োজনীয় শর্ত ঠিকই, কিন্তু সুস্থির সাম্যের পক্ষে যথেষ্ট শর্ত বলা যায় না।

পাহাড়ের উপরে বলটির সাম্যের বিষয়টি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করা যায়। খাদের অংশগুলি স্থিতিশক্তির সর্বনিম্ন এবং চূড়া সর্বোচ্চ পরিমাণের অবস্থান সূচিত করে। কোন অবস্থানে স্থিতিশক্তি সর্বনিম্ন হলে শক্তির সংরক্ষণ-সূত্র অনুযায়ী ঐ অবস্থানটির পরিবর্তন হওয়া উচিত নয়। পরিবর্তন ঘটলে গতিশক্তি ঋণাত্মক হয়ে পড়বে এবং তা হওয়া সম্ভব নয়। চূড়ায় চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত। এই অবস্থান থেকে বিচ্যুত হলে স্থিতিশক্তি হ্রাস পেতে থাকে এবং সেক্ষেত্রে গতিশক্তি হ্রাস পায় না বরং বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সাম্য-অবস্থায় বস্তুর স্থিতিশক্তি পাশাপাশি অবস্থানগুলির তুলনায় সর্বনিম্ন মানে থাকে।

খাদ যত গভীর, সাম্য তত সুস্থির হয়। শক্তি সংরক্ষণসূত্র আমাদের জানা আছে বলে আমরা অনায়াসেই বলতে পারি একটি বস্তু কোন্ অবস্থায় খাদের বাইরে আসতে পারে। বস্তুটিকে খাদের বাইরে আনতে প্রয়োজনীয় গতিশক্তির জন্য বাহ্যিক শক্তি সরবরাহ করতে হয়। খাদ যত গভীর হবে, সুস্থির সাম্য-অবস্থা থেকে টেনে আনতে তত বেশী গতিশক্তির প্রয়োজন পড়বে।

সরল দোলন (Simple oscillations)

পাহাড়ের নীচু জায়গায় বলটি রেখে একটু ঠেলে দিলে বলটি পাহাড়ের একদিকের গা বেয়ে উঠতে থাকবে, এতে গতিশক্তি ক্রমাগত কমবে। গতিশক্তি শূন্য হয়ে গেলে মুহূর্তের জন্য বলটি স্থির হয়ে আবার নীচে নামতে থাকবে। এই সময় বলটির স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হবে। ফলে গতি বাড়বে এবং গতিজড়তার জন্য দ্রুত সাম্য-অবস্থানটি পেরিয়ে অন্যদিকে উঠতে থাকবে। ঘর্ষণ নগণ্য হলে এই 'উপর-নীচ' গতি অনেকক্ষণ চলতে থাকবে এবং আদর্শ-অবস্থায় অর্থাৎ ঘর্ষণ-শূন্যতায় অনন্তকাল চলবে।

দেখা যাচ্ছে সুস্থির সাম্য-অবস্থানের কাছাকাছি গতি পরিবর্তী প্রকৃতির (দোলন প্রকৃতির) হয়।

দোলন আলোচনার জন্য পাহাড়ের খাঁজে বলের এদিক ওদিক গতির চেয়ে পেণ্ডুলাম বেছে নেওয়াই ঠিক হবে, অন্তত ঘর্ষণের বিচারে পেণ্ডুলাম বেশী উপযুক্ত, কারণ এক্ষেত্রে ঘর্ষণ-বাধাকে যথেষ্ট পরিমাণে কমানো সহজতর।

সর্বোচ্চ অবস্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দোলকের পিণ্ডটির বেগ এবং গতিশক্তি শূন্য। এই মুহূর্তে তার স্থিতিশক্তি সর্বাধিক। পিণ্ডটি নামতে থাকলে স্থিতিশক্তি কমতে থাকে এবং গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে গতির বেগও বাড়তে থাকে। পণ্ডটি যখন তার সর্বনিম্ন অবস্থানটি অতিক্রম করে তখন স্থিতিশক্তিও সর্বনিম্ন হয়, সুতরাং সে মুহূর্তে গতিশক্তি এবং বেগ সর্বোচ্চ মান পায়। গতি চলতে থাকায় পিণ্ডটি আবার উঠতে থাকে। বেগ পুনরায় কমতে থাকে এবং স্থিতিশক্তি বাড়তে থাকে।

ঘর্ষণজনিত ক্ষয়ক্ষতি না থাকলে পিণ্ডটি শুরুতে বাঁদিকে যতটা বিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবারে ডানদিকে ঠিক ততটাই বিক্ষিপ্ত হবে। পিণ্ডটির স্থিতিশক্তি তখন গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল, এবার সেই পরিমাণে 'নতুন' স্থিতিশক্তির সঞ্চার হবে। এতে একটি দোলনের প্রথমার্ধ

সংঘটিত হল। দ্বিতীয়ার্ধও একইভাবে ঘটবে—তবে তখন গতি বিপরীত মুখে।

দোলনগতিতে একই গতির পুনরাবৃত্তি ঘটে, ফলে এই গতিকে পর্যাবৃত্ত গতিও বলা হয়। শুরুর জায়গায় ফিরে এসে পিণ্ডটি প্রতিবার (যদি ঘর্ষণজনিত পরিবর্তন না ধরা হয়) একই ধরনের গতি করতে থাকে এবং তার গতিপথ, বেগ ও ত্বরণের পুনরাবৃত্তি ঘটে। একটি পূর্ণদোলনের সময়কাল অর্থাৎ শুরুর জায়গায় ফিরে আসতে যে সময় লাগে, তা প্রথম, দ্বিতীয় এবং পরবর্তী সব দোলনের ক্ষেত্রে একই। এই সময়টি দোলনগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং একে দোলন-কাল বা পর্যায়কাল বলে। আমরা দোলনকালকে T দ্বারা সূচিত করব। এই সময় পরপর গতির পুনরাবৃত্তি ঘটে অর্থাৎ T সময় পরে পরে একটি কম্পনশীল বস্তুকে একই জায়গায় এবং একই দিকে গতিশীল অবস্থায় দেখা যাবে। অর্ধদোলনকাল পরে বস্তুটির সরণ এবং গতির অভিমুখ—দুটি বিপরীত হয়ে যায়। যেহেতু একটি পূর্ণদোলনের সময়কাল T, একক সময়ে nT দোলন ঘটলে n-এর মান $1/T$ হয়।

সুস্থির সাম্য অবস্থান থেকে খুব বেশী বস্তুর সরণ না ঘটলে কিসের উপর এই পর্যায়কাল নির্ভর করে? বিশেষ করে, দোলকের পর্যায়কাল কার উপর নির্ভরশীল? গ্যালিলিও সর্বপ্রথম এই বিষয়টি লক্ষ্য করেন এবং সমস্যাটির সমাধানেও ব্রতী হন। আমরা এখানে গ্যালিলিওর সূত্রটি প্রমাণ করব।

অসম ত্বরণের ক্ষেত্রে বলবিদ্যার সূত্রাবলী প্রয়োগ করে সোজা করে দেখানো অবশ্য বেশ কঠিন ব্যাপার। সে কারণে, উল্লম্ব তলে দোলন ঘটছে এমন দোলকের অবতারণা করে নিছক জটিলতা বাড়াব না। পরিবর্তে, মনে করি পিণ্ডটি যেন একই উচ্চতা বজায় রেখে বৃত্তপথে ঘুরছে। এরকম গতি সৃষ্টি করা আদৌ কঠিন নয়। এক্ষেত্রে পিণ্ডের সাম্য-অবস্থানে যথাযথ বলে এমন দিকে ঠেলা দিতে হবে যাতে বলের অভিমুখ বিক্ষেপ পথের ব্যাসার্ধের ঠিক লম্ব বরাবর হয়।

4.2 চিত্রে ঠিক এরকম একটা 'শঙ্কুদোলক' দেখানো হয়েছে।

m ভরের পিণ্ডটি একটি বৃত্তপথে ঘুরছে। ফলে অভিকর্ষ বল mg ছাড়াও একটি অপকেন্দ্র বল mv^2/r বা অন্যভাবে প্রকাশ করলে $4\pi^2n^2rm$ পিণ্ডটির উপর ক্রিয়া করছে। এখানে n প্রতি সেকেণ্ডে আবর্তন সংখ্যা। আমরা অপকেন্দ্র বলকে $4\pi^2rm/T^2$ হিসাবেও প্রকাশ করতে পারি। এই দুই বলের লব্ধি দোলকটির সুতাকে টানে।
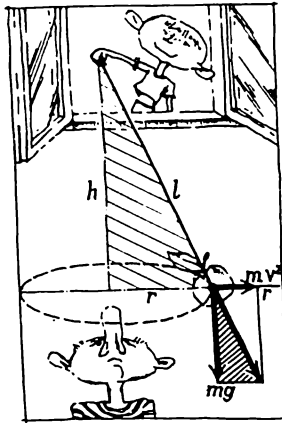
চিত্র 4.2

চিত্রে বলত্রিভুজ এবং সরণত্রিভুজ—দুটি সদৃশ ত্রিভুজ দেখা যাচ্ছে। অনুরূপ বাহুগুলির অনুপাত সমান, সুতরাং

$$\frac{mgT^2}{4\pi^2 rm}=\frac{h}{r}, \text{ বা, } T=2\pi\sqrt{\frac{h}{g}}$$

দোলকটির দোলনকাল তাহলে কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করছে? আমরা যদি ভূ-পৃষ্ঠের একই জায়গায় পরীক্ষা করি (g-এর মান একই থাকে) তাহলে পিণ্ডটির অবস্থান ও নিলম্ব বিন্দুর উচ্চতা-পার্থক্যের উপর দোলকের দোলনকাল নির্ভর করবে। অভিকর্ষক্ষেত্রে যেমন, এখানেও তেমনি দোলনকাল পিণ্ডের ভরের উপর নির্ভর করে না।

নীচের ঘটনাটি বেশ মজার। আমরা সুস্থির সাম্য-অবস্থানের কাছাকাছি বস্তুর গতি পর্যবেক্ষণ করছিলাম। ক্ষুদ্র বিক্ষেপের ক্ষেত্রে উচ্চতা h-এর বদলে দোলকের দৈর্ঘ্য l ব্যবহার করা যায়। আর এটি প্রমাণ করাও খুব সহজ। দোলকের দৈর্ঘ্য 1 মিটার এবং বিক্ষেপ-পথের ব্যাসার্ধ 1 সে. মি. হলে,

$$h=\sqrt{10,000-1}=99{\cdot}995 \text{ সে. মি.}$$

বিক্ষেপ 14 সে. মি. হলে h এবং l-এর পার্থক্য মাত্র 1% হবে। সুতরাং সাম্য-অবস্থান থেকে বিক্ষেপ খুব বেশী না হলে, দোলকের মুক্ত দোলনের পর্যায়কাল

$$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

অর্থাৎ, T-এর মান দোলকের দৈর্ঘ্য এবং যে স্থানে পরীক্ষাটি করা হচ্ছে সেখানে অবাধ পতনের ত্বরণের উপর মাত্র নির্ভর করে, স্থির অবস্থান থেকে পিণ্ডের বিক্ষেপের উপর নির্ভর করে না।

শঙ্কু দোলকের ক্ষেত্রে $T=2\pi\sqrt{l/g}$ সূত্রটি প্রমাণ করা গেল। তাহলে একটি সরল 'সমতলীয়' দোলকের ক্ষেত্রে সূত্রটি কেমন দাঁড়াবে? দেখা যাবে, সেক্ষেত্রেও সূত্রটির চেহারা একই থাকবে। আমরা যথাযথ পদ্ধতিতে তা এখানে প্রমাণ করছি না, তবে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের শঙ্কু দোলকটির ছায়া দেওয়ালে ফেললে ছায়াদোলকটিকে প্রায় সমতল দোলকের মতো দুলতে দেখা যাবে। আসল পিণ্ডটি যে সময়ে বৃত্তপথে একবার পূর্ণ আবর্তন করবে, আমাদের ছায়াদোলকের পিণ্ডটি ঠিক সেই সময়েই একবার পূর্ণ দোলন সম্পন্ন করবে।

স্থির বা সাম্য-অবস্থানের চারপাশে ক্ষুদ্র দোলনকে খুব নিখুঁতভাবে সময় মাপার কাজে ব্যবহার করা হয়।

কথিত আছে, ক্যাথিড্রালে চাকরি করার সময় গ্যালিলিও ঝাড়লণ্ঠনের দোলন পর্যবেক্ষণ করে দোলনের বিস্তার ও দোলকের ভরের উপর দোলনকালের নিরপেক্ষতার তথ্যটি বার করেন।

দেখা যাচ্ছে, দোলকের দোলনকাল দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের সমানুপাতিক। সুতরাং এক মিটার দৈর্ঘ্যের দোলকের দোলনকাল 25 সে. মি. দৈর্ঘ্যের দোলকের দোলনকালের দ্বিগুণ। দোলনের সূত্র থেকে আরও দেখা যায়, একই দোলক ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অক্ষাংশে একই বেগে দুলবে না। নিরক্ষরেখার কাছাকাছি স্থানে অবাধ পতনের ত্বরণ কমে যায়, ফলে দোলনকাল বাড়ে।

দোলনকাল অত্যন্ত নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা সম্ভব। সুতরাং, দোলকের পরীক্ষা থেকে অবাধ পতনের ত্বরণও যথেষ্ট নির্ভুলভাবে বার করা যায়।

দোলনের প্রদর্শন (Displaying oscillations)

দোলকের পিণ্ডের সঙ্গে এক টুকরা নরম সীসা এমনভাবে আটকে দেওয়া হল যাতে পিণ্ডের দোলনের সময় সীসার টুকরাটি নীচের একখণ্ড কাগজকে স্পর্শ করে মাত্র (চিত্র 4.3)। এবার পিণ্ডটি সামান্য দুলিয়ে দেওয়া হল। দোলনের সময় সীসার টুকরাটি কাগজের উপর একটি রেখা অংকন করবে। পিণ্ডটি যখন মধ্যবিন্দুতে অর্থাৎ দোলনের মাঝামাঝি জায়গায়, তখন পেন্সিলের দাগটি মোটা হবে, কারণ, এ জায়গায় সীসার টুকরাটি জোরে চাপ দেয়। কাগজটি দোলনতলের লম্বদিকে
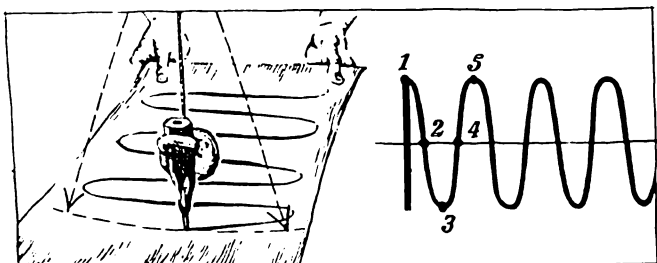
চিত্র 4.3

টানতে থাকলে চিত্রের মতো বক্ররেখার উৎপন্ন হবে। কাগজটি খুব ধীরে টানতে থাকলে তরঙ্গায়িত অংশগুলি ঘনসংবদ্ধ হবে, পক্ষান্তরে মোটামুটি জোরে টানলে পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বাড়বে। লেখটি সঠিকভাবে তৈরী করার জন্য কাগজটি একই দ্রুতিতে টানা দরকার।

এই পদ্ধতিতে দোলনকে 'প্রদর্শনীয়' করা যাচ্ছে বলা যেতে পারে।

পিণ্ডটি কোন্ জায়গায় ছিল এবং পরপর মুহূর্তে কোন্ কোন্ জায়গায় যাচ্ছে তা দেখানোর জন্য এই পরীক্ষামূলক প্রদর্শনের দরকার পড়ে। ধরা যাক, দোলক যখন মধ্য অবস্থানের বাঁদিকের প্রান্তবিন্দুতে ছিল, মোটামুটিভাবে সেই সময় কাগজটি 1 সে.মি./সেকেণ্ড বেগে টানা শুরু হয়েছিল। এটাকে প্রাথমিক অবস্থান মনে করলে লেখচিত্রে 1 চিহ্নিত বিন্দুটি সেই অবস্থান নির্দেশ করছে। দোলনকালের এক-চতুর্থাংশ সময় পরে দোলক মধ্যবিন্দু অতিক্রম করে। এই সময়ে কাগজটি $T/4$ সে.মি. দূরত্বে সরে যায় (2 চিহ্নিত বিন্দুটি)। দোলক এবারে ডানদিকে চলতে থাকে এবং কাগজটিও সেই সঙ্গে নিজের গতিপথে ধীরে ধীরে সরতে থাকে। দোলক ডানদিকের প্রান্তবিন্দুতে পৌঁছলে, কাগজটি মোট $T/2$ সে.মি. সরে (চিত্রে 3 চিহ্নিত বিন্দু)। দোলকটি আবার মধ্য-অবস্থান অভিমুখে গতিশীল হয় এবং $3T/4$ সময়ে সাম্য-অবস্থানে পৌঁছয় (চিত্রে 4 চিহ্নিত বিন্দু)। 5 চিহ্নিত বিন্দুতে দোলন সম্পূর্ণ হয় এবং T সময় পর পর দোলনের পুনরাবৃত্তি ঘটে। আমাদের কাগজে প্রত্যেক T সে.মি. পর এই পুনরাবৃত্তি ধরা পড়ে।

সুতরাং এই লেখচিত্রে কোন উল্লম্ব রেখার সাহায্যে সাম্য-অবস্থান থেকে সরণ এবং কেন্দ্রীয় অনুভূমিক রেখার সাহায্যে সময় সূচিত করা যায়।

এই ধরনের লেখ থেকে এমন দুটি রাশি বার করা যায় যাদের সাহায্যে কোন দোলনের বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। দুটি সদৃশ বিন্দুর, যেমন পাশাপাশি দুটি চূড়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব থেকে দোলন-কাল হিসাব করা যায়। সাম্য অবস্থান থেকে বস্তুর সর্বাধিক সরণও সহজে বার করা যায়। এই সর্বাধিক সরণকে দোলনের বিস্তার বলে।

অধিকন্তু, দোলনের এই প্রদর্শন থেকে নীচের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে: দোলনকারী বিন্দুটির যে কোন মুহূর্তে অবস্থান কোনটি আর পর মুহূর্তেই বা কোথায় হবে? যেমন, দোলকের সর্ববাম অবস্থানের মুহূর্ত থেকে সময় গণনা শুরু করলে এবং দোলনকাল 3 সেকেণ্ড হলে ঠিক 11 সেকেণ্ড পরে বিন্দুটির অবস্থান কোথায় হবে? একই বিন্দু থেকে 3 সেকেণ্ড পরে পরে দোলনের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। সুতরাং 9 সেকেণ্ড পরে দোলনকারী বিন্দুটি সেই সর্ববাম অবস্থানে থাকছে।

ফলে, অনেকগুলি দোলনকাল ধরে লেখচিত্র অংকন করার দরকার পড়ে না—একটি দোলনের লেখচিত্রই আমাদের হিসাবের পক্ষে যথেষ্ট। দোলনকাল 3 সেকেণ্ড বলে 11 সেকেণ্ড পরে বিন্দুটির অবস্থান আর শুরুর 2 সেকেণ্ড পরে অবস্থান অভিন্ন। চিত্রের সূচনা-বিন্দু থেকে 2 সে.মি. দূরের বিন্দুটি (এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, কাগজটি 1 সে.মি./সেকেণ্ড বেগে টানা হয়েছে বা অন্যভাবেও বলা যায় যে, চিত্রে 1 সে.মি. দূরত্ব 1 সেকেণ্ড নির্দেশ করছে) থেকে জানা যাচ্ছে যে, 11 সেকেণ্ড পরে দোলক তার সর্বদক্ষিণ প্রান্ত থেকে সাম্য-অবস্থানের পথে চলেছে। সেই মুহূর্তে সরণের পরিমাণ লেখচিত্র থেকে সহজেই বার করা যায়।

সাম্য-অবস্থানের চারপাশে ক্ষুদ্র দোলনের ক্ষেত্রে সরণের হিসাব করার জন্য লেখচিত্র অংকন করার দরকার পড়ে না। তত্ত্বের সাহায্যে বোঝা যায়, এক্ষেত্রে দোলনকালের সঙ্গে সরণের সম্পর্কের লেখটি হবে একটি সাইন-লেখ। বিন্দুর সরণ y, বিস্তার a এবং দোলনকাল T হলে শুরুর যে কোন সময় t পরে সরণের সূত্রটি

$$y = a \sin 2\pi \frac{t}{T}$$

যে দোলন উপরের সূত্রটি মেনে চলে তাকে সুসমঞ্জস বা দোলগতি বলে। 2π-কে t/T দিয়ে গুণ করে তার সাইন কোণানুপাতটি নেওয়া হয়। $2\pi t/T$ রাশিটিকে দশা বলে।

হাতের কাছে ত্রিকোণমিতির তালিকা থাকলে আর দোলনকাল ও বিস্তার জানা থাকলে বিন্দুটির যে কোন মুহূর্তে সরণের মান সহজেই বার করা যায়। সেই সঙ্গে দশার মান বার করলে বিন্দুটি কোন্ অভিমুখে গতি সম্পন্ন করছে তাও বলে দেওয়া যায়।

চিত্র 4.4

বৃত্তপথে পরিক্রমণরত বস্তুর ছায়া দেওয়ালে ফেলে তা থেকে কম্পনের প্রয়োজনীয় সূত্রটি বার করাও কঠিন নয় (চিত্র 4.4)।

আমরা মধ্য-অবস্থান থেকে ছায়ার সরণ মাপব। প্রান্ত অবস্থানদ্বয়ে সরণ y-এর সম বৃত্তের ব্যাসার্ধ a-এর সমান। এটিই ছায়াটির দোলনের বিস্তার।

পিণ্ডটি বৃত্তপথ বরাবর মধ্য-অবস্থান থেকে ϕ পরিমাণ কোণে সরে গেলে তার ছায়া মধ্যবিন্দু থেকে $a \sin\phi$ পরিমাণে সরে যায়।

মনে করি, পিণ্ডটির দোলনকাল (বলা বাহুল্য, ছায়ার দোলনকালও তাই) T ; তার অর্থ পিণ্ডটি সময়ে 2π রেডিয়ান কোণ ঘোরে। ϕ কোণে ঘোরার জন্য t সময় লাগলে আমরা $\phi/t = 2\pi/T$ অনুপাতটি লিখতে পারি।

সুতরাং, $\phi = 2\pi t/T$ এবং $y = a \sin 2\pi t/T$ এবং এটিই আমাদের ঈপ্সিত সূত্র।

সাইন-সূত্র অনুযায়ী দোলনকারী বিন্দুর গতিবেগও পরিবর্তিত হয়। বৃত্তপথে পরিক্রমণরত পিণ্ডটির ছায়া থেকে একইভাবে এ সিদ্ধান্তে আসা যায়। পিণ্ডটির বেগ v_0 স্থির মানের একটি ভেক্টর। পিণ্ডটির সঙ্গে বেগ ভেক্টরটিও আবর্তন করে। মনে করা যাক, বেগ ভেক্টরটি যেন একটি বাস্তব তীর যার ছায়াও দেওয়ালে পড়ছে। পিণ্ডটির প্রান্ত-

অবস্থানগুলিতে ভেক্টরটির অবস্থান আলোকরশ্মি বরাবর হওয়ায় কোন ছায়া তৈরী হয় না। কোন একটি প্রান্ত-অবস্থান থেকে পিণ্ডটি যখন θ কোণে ঘোরে, বেগ ভেক্টরটিও একই কোণে ঘোরে এবং দেওয়ালে এর অভিক্ষেপ $v_0 \sin\theta$ হয়। আগের মত একইভাবে $\theta/t = 2\pi/T$ লেখা যায়। সুতরাং কম্পনশীল বস্তুটির তাৎক্ষণিক বেগ $v = v_0 \sin \frac{2\pi}{T}t$।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সরণের সূত্র অনুযায়ী মধ্যবিন্দুতে সরণ শূন্য, কিন্তু, বেগের সূত্র অনুযায়ী এই মান প্রান্ত-অবস্থানে হয়। অর্থাৎ, পিণ্ডটি যখন মধ্য-অবস্থানে থাকে তখন সরণ শূন্য এবং দোলনের বেগ প্রান্ত-অবস্থানগুলিতে শূন্য হয়।

দোলনের সর্বাধিক বেগ v_0 এবং সর্বাধিক সরণ (বা বিস্তার) এর একটি সহজ সম্পর্ক রয়েছে। পিণ্ডটি তার পর্যায়কাল T সময়ে $2\pi a$ পরিধিবিশিষ্ট বৃত্তপথে একবার পরিক্রমণ সম্পূর্ণ করে, সুতরাং

$$v_0 = \frac{2\pi a}{T} \text{ এবং } v = \frac{2\pi a}{T} \sin \frac{2\pi}{T}t$$

দোলনে বল ও স্থিতিশক্তি (Force and potential energy in oscillations)

সাম্য-অবস্থানের দুপাশে প্রতিটি দোলনের সময় কম্পনশীল বস্তুর উপর একটি বল ক্রিয়া করে এবং এই বলের প্রভাবেই বস্তুটির সাম্য-অবস্থানে ফিরে আসতে 'ইচ্ছা জাগে'। দোলনকারী বিন্দু যখন সাম্য-অবস্থান থেকে দূরে যেতে থাকে, বলটি বিন্দুর গতিকে মন্দীভূত করে; বিপরীত পক্ষে, সাম্য-অবস্থানের অভিমুখী গতিকে ত্বরান্বিত করে।

সরল দোলকের এই বলটি পরীক্ষা করে দেখা যাক (চিত্র 4.5)। দোলকের পিণ্ডটির উপর অভিকর্ষ বল এবং সুতার টান ক্রিয়া করে। অভিকর্ষ বলকে দুটি উপাংশে ভাগ করা যাক—একটি সুতা বরাবর এবং অন্যটি তার লম্বদিকে গতিপথের স্পর্শক বরাবর। এদের মধ্যে স্পর্শক বরাবর উপাংশটির গুরুত্বই দোলনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য। এই বলটিই পিণ্ডকে যথাস্থানে ফিরিয়ে আনে অর্থাৎ পিণ্ডটির ক্ষেত্রে প্রত্যানয়ক বল। আর সুতা বরাবর বলটি যে পেরেক থেকে দোলকটি ঝোলান আছে তার টানকে প্রশমিত করে। কম্পনশীল বস্তুটির ভার সহ্য করতে সুতাটি উপযুক্ত কিনা তা কোন সময় বিচার করার দরকার পড়লে দ্বিতীয় বলটির কথা ভাবা যাবে।

পিণ্ডের সরণ x দ্বারা সূচিত করা যাক। ঠিক বলতে গেলে, একটি বৃত্তচাপ বরাবর গতি সম্পন্ন হচ্ছে। কিন্তু আমরা সাম্য-অবস্থানের
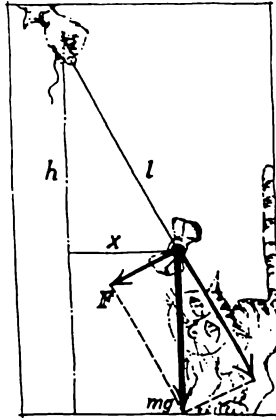
চিত্র 4.5

কাছাকাছি ক্ষুদ্র দোলনের কথা আলোচনা করছি। সেক্ষেত্রে বৃত্তচাপ বরাবর সরণের পরিমাণ আর উল্লম্ব তল থেকে সরণের পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য কিছু নেই বললেই চলে। দুটি সদৃশ ত্রিভুজ বিবেচনা করে অনুরূপ বাহুগুলির অনুপাত ও অতিভুজদ্বয়ের অনুপাত সমান লিখতে পারি, অর্থাৎ,

$$\frac{F}{x}=\frac{mg}{l} \text{ বা, } F=\frac{mg}{l}x$$

দোলনকালে এই mg/l রাশিটির মান পরিবর্তন হয় না। এই রাশিকে k দ্বারা সূচিত করলে প্রত্যানয়ক বল $F=kx$ হয়। আমরা যে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলাম তা সংক্ষেপে: প্রত্যানয়ক বলের মান দোলনকারী বিন্দুর সাম্য-অবস্থান থেকে সরণের সমানুপাতিক। কম্পনশীল বস্তুর প্রান্ত-অবস্থানগুলিতে এই বলের মান সর্বাধিক। মধ্যবিন্দু অতিক্রম করার মুহূর্তে বলটি উধাও হয়ে যায় এবং তারপরেই চিহ্ন অর্থাৎ দিক পরিবর্তন করে। বস্তুটি ডানদিকে সরলে বলটির অভিমুখ বাঁদিকে হয় এবং বস্তুটি বাঁদিকে গেলে বল ডানদিকে।

দোলনের সহজতম উদাহরণ সরল দোলক। যে কোন কম্পনের ক্ষেত্রে সরল দোলকের নিয়ম ও সূত্রাবলীর কতটা পরিবর্তন ও পরি-

মার্জন দরকার তা খতিয়ে দেখা যাক। এবারে কিন্তু আমরা মুক্ত দোলনের সময়কালকে প্রত্যানয়ক বলের ধ্রুবক k দিয়ে প্রকাশ করব। যেহেতু $k = mg/l$, সুতরাং $l/g = m/k$ এবং

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

যে কোন মুক্ত দোলন প্রত্যানয়ক বলের অধীন বলে উপরোক্ত সম্পর্কটি সকল প্রকার দোলনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়।

এখন সাম্য-অবস্থান থেকে সরণের হিসাবে দোলকের স্থিতিশক্তির পরিমাপ করা যাক। পিণ্ডটি যখন দোলনের সর্বনিম্ন অবস্থানে আসে তখন আমরা তার স্থিতিশক্তির মান শূন্য ধরতে পারি এবং তারপরে উক্ত বিন্দু থেকে যে কোন অবস্থানের উচ্চতা বার করি। নিলম্ববিন্দু এবং বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পিণ্ডের তলের উচ্চতা পার্থক্য h ধরলে, স্থিতিশক্তি $U = mg(l - h)$, বা, বর্গের অন্তরের সূত্র ব্যবহার করলে পাই,

$$U = mg\frac{l^2 - h^2}{l + h}$$

চিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে, $l^2 - h^2 = x^2$ এবং যেহেতু l এবং h-এর পার্থক্য খুবই সামান্য, সেহেতু $l + h$-এর পরিবর্তে $2l$ ব্যবহার করা যায়। সুতরাং $U = mgx^2/2l$ বা,

$$U = \frac{kx^2}{2}$$

দেখা যাচ্ছে, দোলনকারী বস্তুর স্থিতিশক্তি সরণের বর্গের সমানুপাতিক।

আমাদের এই সূত্রটি কতটা নির্ভুল তা পরীক্ষা করা যাক। স্থিতি-শক্তির হ্রাস নিশ্চয়ই প্রত্যানয়ক বল কর্তৃক কৃতকার্যের সমান হবে। বস্তুর x_1 এবং x_2 দুটি অবস্থান ধরা যাক। এই দুই ক্ষেত্রে স্থিতি-শক্তির পার্থক্য

$$U_2 - U_1 = \frac{kx_2^2}{2} - \frac{kx_1^2}{2} = \frac{k}{2}(x_2^2 - x_1^2) \text{ ,}$$

বর্গের অন্তরকে রাশিদ্বয়ের যোগফল ও বিয়োগফলের গুণফল হিসাবে প্রকাশ করলে,

$$U_2 - U_1 = \frac{k}{2}(x_2 + x_1)(x_2 - x_1)$$

$$= \frac{kx_2 + kx_1}{2}(x_2 - x_1)$$

কিন্তু $x_2 - x_1$, বস্তু কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং kx_1 ও kx_2 আলোচ্য বিন্দুদ্বয়ে প্রত্যানয়ক বল দুটির মান এবং $(kx_1 + kx_2)/2$-কে সেক্ষেত্রে গড় প্রত্যানয়ক বল বলা যায়।

আমাদের সূত্র থেকে তাহলে সঠিক ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে : স্থিতি-শক্তির হ্রাস কৃতকার্যের সমান।

স্প্রিং-এর কম্পন (Spring vibrations)

স্প্রিং থেকে একটা বল ঝুলিয়ে তার কম্পন তৈরী করা খুব সহজ। এখন স্প্রিংটির একপ্রান্ত বেঁধে অন্য প্রান্তের বলটি টেনে দেখা যাক (চিত্র 4.6)। হাত দিয়ে বলটি যতক্ষণ টানা হয় ততক্ষণ স্প্রিংটি প্রসারিত অবস্থায় থাকে। বলটি ছেড়ে দেওয়ামাত্র স্প্রিংটি গুটিয়ে
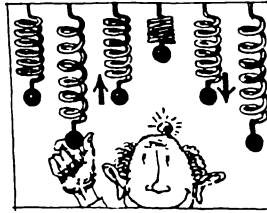
চিত্র 4.6

যায় এবং বলটি তার সাম্য-অবস্থানের দিকে এগিয়ে যায়। স্প্রিংটি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই থেমে যায় না বরং দোলকের মত দুলতে থাকে। গতিজড়তার জন্য সাম্য-অবস্থান পেরিয়ে সংকুচিত হতে থাকে। বলটিরও গতি কমতে থাকে এবং এক সময় থেমে গিয়ে আবার বিপরীত দিকে গতি শুরু করে। দোলকের দোলনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল, এখানেও ঠিক সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যযুক্ত দোলন শুরু হয়ে যায়।

ঘর্ষণ না থাকলে এই দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয়। ঘর্ষণের প্রভাবে দোলন অবমন্দিত হয়ে পড়ে। অধিকন্তু, ঘর্ষণ যত বেশী হয়, অবমন্দনের হার তত দ্রুত হয়।

স্প্রিং এবং দোলকের ভূমিকা প্রায় একই। সময়কালের নিত্যতা বিচারে উভয়েই সমার্থক। একটি ক্ষুদ্র ফ্লাই-হুইল ব্যালান্সের স্পন্দনের মাত্রা ঠিক করে বর্তমান ঘড়িতে সময়কাল ঠিক করা হয়। দিনে কয়েক হাজার বার একটি স্প্রিং-এর খোলা ও বন্ধ হওয়ার ব্যাপারটি কাজে লাগিয়ে ফ্লাই-হুইল ব্যালান্সকে স্পন্দিত করা হয়।

সুতায় ঝোলান বলটির উপর প্রত্যানয়ক শক্তির উৎস ছিল অভিকর্ষ বলের স্পর্শক উপাংশ। স্প্রিং-এর বলটির ক্ষেত্রে স্প্রিং-এর সংকোচন ও প্রসারণের স্থিতিস্থাপক বলই প্রত্যানয়ক বলের ভূমিকা নেয়। সুতরাং স্থিতিস্থাপক বলটির পরিমাণ সরণের সমানুপাতিক হবে ঃ $F=kx$

k গুণাঙ্কটির এখানে একটি ভিন্নতর অর্থও পাওয়া যায়। গুণাঙ্কটি স্প্রিং-এর কাঠিন্যের মান সূচিত করছে। নিম্নোক্ত বাক্য থেকে k-এর এই পরিচয়টি ফুটে উঠবে ঃ স্প্রিং-টিকে একক দৈর্ঘ্য পরিমাণ প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করতে যে পরিমাণ বলের প্রয়োজন তার মান k-এর সমান।

স্প্রিং-এর কাঠিন্যের মান এবং নীচে প্রলম্বিত ভার জানা থাকলে আমরা $T=2\pi\sqrt{m/k}$ সূত্র থেকে মুক্ত দোলনের পর্যায়কাল বার করতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ, 10^5 ডাইন/সে.মি. কাঠিন্য গুণাঙ্ক সম্পন্ন একটি স্প্রিং-এ (অবশ্য স্প্রিংটি বেশ দৃঢ়—একশ গ্রাম ওজন চাপালে তবে 1 সে.মি. প্রসারণ হবে) 10 গ্রাম-ভার ঝোলালে ভারটি $T=6{\cdot}28\times10^{-2}$ সেকেণ্ড পর্যায়কাল নিয়ে দোলন করবে। এক সেকেণ্ডে দোলন সংখ্যা দাঁড়ায় 16।

স্প্রিং যত নমনীয় হয় তত ধীরে তার স্পন্দন হয়। নীচের ভারের পরিমাণ বাড়ালেও এই ধীরগতির পরিবর্তন হবে না।

স্প্রিং-এর বলটির ক্ষেত্রে এবার শক্তির সংরক্ষণ সূত্র প্রয়োগ করে দেখা যাক।

আমরা জানি, দোলকের ক্ষেত্রে গতি এবং স্থিতিশক্তির সমষ্টি, $K+U$ সর্বদা একই থাকে।

অর্থাৎ $K+U$ সংরক্ষিত থাকে।

দোলকের ক্ষেত্রে K এবং U-এর মান আমরা বার করেছি। সুতরাং শক্তি সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী বলতে পারি,

$$\frac{mv^2}{2}+\frac{kx^2}{2} \text{ সংরক্ষিত থাকে।}$$

বলযুক্ত স্প্রিং-এর ক্ষেত্রেও এই একই নিত্যতা সূত্র খাটে।

আমরা নিশ্চয়ই হিসাব কষে তা দেখাব আর হিসাবটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। যে ধরনের স্থিতিশক্তির সঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে পরিচিত হয়েছি, এখানে তা ছাড়াও অন্য একটি স্থিতিশক্তি রয়েছে। আগের স্থিতিশক্তিকে অভিকর্ষজনিত স্থিতিশক্তি বলে। স্প্রিং-টি অনুভূমিক করে ঝোলালে স্পন্দনের সময় এই অভিকর্ষজনিত স্থিতি-শক্তির কোন পরিবর্তন হত না। নতুন যে স্থিতিশক্তির উল্লেখ করা

হল তাকে স্থিতিস্থাপকতাজনিত স্থিতিশক্তি বলে। এখানে তার মান $kx^2/2$, সুতরাং এটি স্প্রিং-এর কাঠিন্যের উপরে নির্ভর করে আর সেই সঙ্গে সংকোচনের বা প্রসারণের বর্গের সমানুপাতিক হয়।

কম্পনের মোট শক্তি ধ্রুবক এবং এই মোট শক্তির পরিমাণ $E=ka^2/2$ বা $E=mv_0{}^2/2$ হিসাবে লেখা যায়।

শেষ সূত্র দুটিতে উল্লিখিত a এবং v_0 রাশিদ্বয় যথাক্রমে কম্পনের ক্ষেত্রে সরণ ও বেগের সর্বোচ্চ মান (কখনও কখনও এ দুটিকে সরণ ও বেগের বিস্তার বলা হয়)। সূত্র দুটি কিভাবে এলো তা সহজেই বোঝা যায়। যে কোন প্রান্ত-অবস্থানে যখন $x=a$, তখন কম্পনের গতিশক্তির মান শূন্য, ফলে মোট শক্তি স্থিতিশক্তির সমান হয়। কম্পনের মধ্য-অবস্থানে সরণ শূন্য, সুতরাং স্থিতিশক্তিও শূন্য। সেই মুহূর্তে তাৎক্ষণিক বেগ সর্বাধিক, $v=v_0$; সুতরাং মোট শক্তি তখন গতিশক্তির সমান।

দোলনবিজ্ঞান পদার্থবিদ্যার একটি বিস্তৃত শাখা। প্রায়শই দোলক এবং স্প্রিং-এর আলোচনা এসে পড়ে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, অন্য অনেক বস্তুর দোলনের আলোচনার দরকার পড়ে না। যে কোন কাঠামোর কম্পন ঘটে; সেতু, অট্টালিকার অংশবিশেষ, কড়ি-বরগা, উচ্চ ভোল্টের বৈদ্যুতিক লাইন, এমনি অসংখ্য জিনিসের কম্পন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার পড়ে। শব্দও বাতাসের কম্পনের ফল।

উপরোক্ত তালিকার কম্পনসমূহ যান্ত্রিক কম্পনের মধ্যে পড়ে। অবশ্যই, দোলনের ধারণা বলতে শুধুমাত্র সাম্য-অবস্থান থেকে বস্তুকণার সরণ বা বস্তুসমূহের যান্ত্রিক কম্পনই বোঝায় না। অনেক তাড়িতিক ঘটনায় অনেক সময় দোলনের বিষয়টি পাওয়া যায়। আগের ঘটনাগুলিতে দোলনের যে সমস্ত নিয়মকানুনের কথা বলা হয়েছে, এখানেও দোলন মোটামুটি সেই নিয়মে ঘটে। পদার্থবিজ্ঞানের সকল শাখাতেই দোলনের জ্ঞান অপরিহার্য।

আরও জটিল দোলন (More complex oscillation)

আগের অনুচ্ছেদে যে সব দোলনের কথা আলোচনা করা হয়েছে সেখানে সাম্য-অবস্থানের কাছাকাছি দোলন ঘটেছে এবং প্রত্যানয়ক বলের মান সাম্য-অবস্থান থেকে দোলনের কেন্দ্রবিন্দুর সরণের সমানুপাতিক। সাইন নিয়ম অনুযায়ী এই দোলন ঘটে। ঐ দোলনকে সুসমঞ্জস দোলন বলে। এই প্রকার দোলনের পর্যায়কাল বিস্তার-নিরপেক্ষ।

বেশি বিস্তারের দোলনগুলি বেশ জটিল। এই দোলন সাইন নিয়মে ঘটে না এবং এই দোলনের প্রদর্শনও বেশ কঠিন। উপরন্তু বিবিধ বস্তুর দোলনের লেখও বিভিন্ন ধরনের হয়। দোলনের পর্যায়কাল এক্ষেত্রে দোলনের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক নয় এবং অন্যদিকে বিস্তার-নিরপেক্ষ নয়, পরিবর্তে বিস্তারের উপর নির্ভর করে।
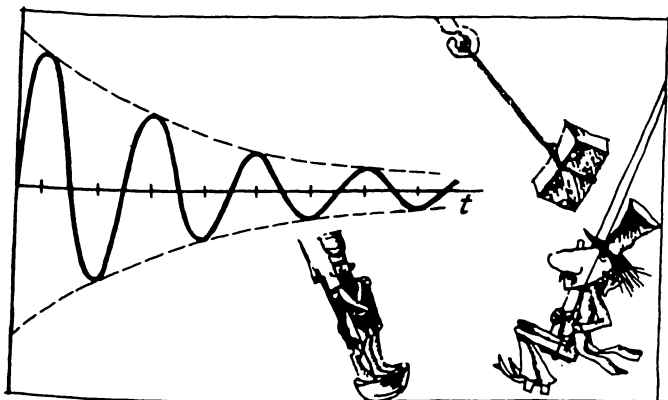
চিত্র 4.7

ঘর্ষণের প্রভাবে যে কোন দোলনের গুণগত পরিবর্তন ঘটে। ঘর্ষণ যত বেশী হয়, দোলনও তত দ্রুত অবমন্দিত হয়। জলের মধ্যে কোন দোলক দোলাতে গেলে কি হবে? দেখা যাবে, দোলকটি বড় জোর একটি বা দুটি পূর্ণ দোলন করতে পারছে। দোলকটি একটি অতিরিক্ত সান্দ্র তরলে ডোবালে আদৌ কোন দোলন করান সম্ভব না হতে পারে। দোলকটি বিক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করলে সেটি তার স্থির অবস্থানেই ফিরে আসতে চাইবে। এই ধরনের অবমন্দিত দোলনের লেখ 4.7 চিত্রে দেখান হয়েছে। এখানে উল্লম্ব অক্ষ বরাবর সরণ এবং অনুভূমিক রেখা বরাবর সময় নির্দেশ করা হয়েছে। প্রতিটি দোলনে বিস্তার সময়ের সঙ্গে কমতে দেখা যাচ্ছে।

অনুনাদ (Resonance)

দোলনায় একটি শিশু বসে আছে। তার পা মেঝে স্পর্শ করেনি। তাকে দোল দেওয়ার জন্য কাউকে দোলনাটি একদিকে তুলে তারপর

ছেড়ে দিতে হবে। এভাবে দোলান ঝামেলার ব্যাপার, আর তার দরকারও নেই। প্রথমে মৃদু দুলিয়ে তারপরে দোলনের সঙ্গে সঙ্গে মৃদু মৃদু ধাক্কা দিলে অল্প সময় পরেই দেখা যাবে দোলনাটি রীতিমত জোরে দুলছে।

দেখা যাচ্ছে, কোন বস্তুকে দোলাতে হলে দোলনের সঙ্গে তাল রেখে কাজ করতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, বস্তুর মুক্ত দোলনের সময়কালের সাথে সাথে ঠেলা দিতে হবে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অনুনাদের প্রসঙ্গটি এসে পড়ে।

প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় অনুনাদের বহুল ঘটনা দেখা যায়। সুতরাং বিষয়টি ভালোভাবে আলোচনা করার মত।
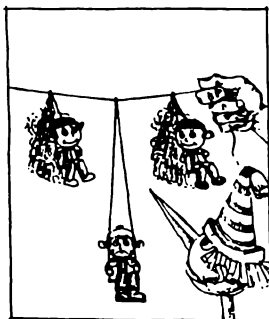
চিত্র 4.8

নীচের যন্ত্রটি তৈরী করে নিলে একটা ভারি চমকপ্রদ অনুনাদের ঘটনা দেখা যেতে পারে। একটা লম্বা অনুভূমিক তার থেকে তিনটি সরল দোলক ঝুলিয়ে দিতে হবে (চিত্র 4.8)—এদের দুটি ছোট কিন্তু সমান দৈর্ঘ্যের এবং তৃতীয়টি অপেক্ষাকৃত বড় দৈর্ঘ্যের। ছোট দোলক দুটির একটিকে দুলিয়ে দিতে হবে। অল্পক্ষণের মধ্যে দেখা যাবে কি ভাবে অন্য সমান দৈর্ঘ্যের ছোট দোলকটি দুলতে শুরু করেছে। আরও কয়েক সেকেণ্ড পরে দ্বিতীয় ছোট দোলকটি এমনভাবে দোলন করতে থাকবে যে, বোঝাই যাবে না কোন্ ছোট দোলকটি প্রথমে দোলান হয়েছিল।

এর কারণ কি ? একই দৈর্ঘ্যের দোলকের মুক্ত দোলনের পর্যায়-কাল সমান। প্রথম দোলকটি দ্বিতীয় দোলকটিকে দোলায়। তারের

মধ্য দিয়ে একটি দোলক থেকে তার একটি দোলকে এই দোলন সঞ্চারিত হয়। এখন, অন্য একটি ভিন্ন দৈর্ঘ্যের দোলকও একই তার থেকে ঝুলছে। তার ক্ষেত্রে কি হবে? তার কিছুই ঘটবে না? এই দোলকের পর্যায়কাল ভিন্ন বলে ছোট দোলকটি তাকে দোলাতে পারবে না। শক্তির 'সঞ্চালন'-এর এই মজার ঘটনায় তৃতীয় দোলকটির যেন কোন ভূমিকা নেই।

আমরা সকলেই অনেক সময় যান্ত্রিক অনুনাদের সম্মুখীন হয়ে থাকি। বেশীর ভাগ সময় আমরা বিষয়টি একেবারেই খেয়াল করি না—যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে এই অনুনাদ বেশ বিরক্তি উদ্রেক করে। জানালার পাশ দিয়ে রাস্তায় গাড়ি ছুটে চললে অনেক সময় টেবিলের বাসনপত্র নড়েচড়ে ওঠে। ব্যাপারটি কেন হয়? ভূমির কম্পন বাড়ির মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে ঘরের মেঝেতে এসে পড়ে। একইভাবে তা টেবিলে তথা বাসনপত্রে সঞ্চালিত হয়ে তাদের কম্পিত করে। দোলনের বিস্তার এইভাবে এবং এত সব জিনিসপত্রের মধ্য দিয়ে ঘটে। এটা অনুনাদেরই ফল। বাহ্যিক দোলন বস্তুর মুক্ত বা স্বাভাবিক দোলনের সঙ্গে মিশে অনুনাদ ঘটায়। বস্তুত, ঘরের মধ্যেই হোক আর কোন কারখানা বা গাড়ির মধ্যেই হোক, আমরা যে সব ঘর্ ঘর্ শব্দ শুনি, তাদের অধিকাংশই অনুনাদের জন্য ঘটে।

অনুনাদ ঘটনাচক্রে কোন কোন সময় আমাদের উপকার করে আবার সময় সময় ক্ষতিও করে।

মনে করুন, কোন একটি মঞ্চের উপর একটি যন্ত্র রাখা আছে। যন্ত্রটির গতিশীল অংশগুলি তালে তালে কম্পিত হচ্ছে অর্থাৎ এই কম্পনের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়কাল রয়েছে। যদি এমন হয় যে, মঞ্চটির মুক্ত দোলনের পর্যায়কালের সঙ্গে যন্ত্রের ঘূর্ণমান বা গতিশীল অংশের পর্যায়কাল মিশে গেল—তাহলে কি হবে? মঞ্চটি তৎক্ষণাৎ দুলতে শুরু করবে এবং তার ফলে ভেঙে যেতেও পারে।

একটি ঘটনা অনেকের জানা থাকতে পারে। একদল সৈন্য সেণ্ট পিটার্সবার্গে একটি সেতুর উপর দিয়ে মার্চ করে এগিয়ে চলেছিল। সেতুটি ভেঙে পড়ে। ঘটনাটির অনুসন্ধান শুরু হল। সেতু বা লোক-গুলির ব্যাপারে এহেন দুর্ঘটনার কোন আপাতকারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। কারণ, বহুবারই তো জনতা এই সেতুর উপরে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, একদল ধীরগতি সৈন্যের যা ওজন তার থেকে অনেক বেশী ওজনের ভারী ভারী যানবাহনের ভিড় ঘটে এই সেতুর উপরে।

ভারি ওজনের চাপে একটা সেতু যেটুকু ঝুলে পড়ে তা নেহাতই সামান্য। কিন্তু সেতুটি কোন কারণে দুলে উঠলে এর থেকে অনেক বেশী ঝুঁকে পড়তে পারে। একই মানের একটি স্থির ওজনের জন্য সেতু যতটা ঝুলে পড়ে তার থেকে হাজার গুণ বেশী ঝুলে পড়তে পারে, যদি দোলনের ক্ষেত্রে অনুনাদ সৃষ্টি হয়। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল—সেতুটির মুক্ত দোলনের পর্যায়কালের সঙ্গে মার্চ করার পর্যায়কাল মিলে গিয়ে অনুনাদ সৃষ্টি করেছিল।

সে কারণে, কোন ছোট মিলিটারী দলকেও সেতুর উপর মার্চ করতে নিষেধ করা হয়। লোকজনের চলাচল সাধারণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় কোন অনুনাদ ঘটে না, ফলে সেতুর দোলন ঘটে না। প্রসঙ্গত, উপরোক্ত দুঃখজনক পরিণতির কথা মনে রেখে ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ করতে হয়। সেতুর নকসা তৈরীর সময় তারা মার্চিং পদক্ষেপের পর্যায়কাল থেকে সেতুর মুক্ত দোলনের পর্যায়কাল যাতে বেশ পৃথক হয় সেদিকে নজর রাখেন।

যে কোন মঞ্চের নির্মাণকার্যেও এই সমস্যার কথা ভুলে গেলে চলবে না। যন্ত্রের গতিশীল অংশের পর্যায়কাল থেকে মঞ্চের মুক্ত দোলনের পর্যায়কাল যত বেশী দূরে রাখা যায় ততই ভাল।

---

5. কঠিন বস্তুর গতি

টর্ক (Torque)

হাত দিয়ে একটা ভারী ফ্লাইহুইল ঘোরাবার চেষ্টা করুন। চাকার যে কোন অংশ হাত দিয়ে টানুন। আপনি যদি অক্ষের কাছাকাছি কোন অংশ ধরে থাকেন, তাহলে দেখতে পাবেন কাজটা কত কঠিন লাগছে। কিন্তু আপনার হাত যদি ক্রমে পরিধির দিকে সরিয়ে নেন, তাহলে কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ মনে হবে।

সবক্ষেত্রেই তো মোটামুটি একই পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হয়েছিল। তাহলে এই পরিবর্তনটা ঘটছে কেন ? কারণ, বলের প্রয়োগবিন্দুর পরিবর্তন ঘটেছে।

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনাগুলিতে বল কোথায় প্রয়োগ করা হয়েছিল তার উল্লেখ করতে হয়নি। কারণ, সেসব ক্ষেত্রে বস্তুর আকার ও গঠনের কোন ভূমিকা ছিল না। ফলে বস্তুর বদলে একটি বস্তুবিন্দুর কল্পনা করলেও আমাদের অসুবিধা হয়নি এবং আমরা প্রকৃতপক্ষে সেটাই করেছিলাম।

বলের প্রয়োগবিন্দুর ভূমিকা ভালভাবে বোঝার জন্য একটা বস্তুকে কিছুটা কোণে ঘোরাতে কত কার্য করতে হয় তার হিসাব করা যাক। এই গণনার সময় অবশ্যই ধরে নিতে হবে বস্তুর অন্তর্গত কণাগুলি পরস্পর দৃঢ়সংবদ্ধ অবস্থায় আছে (একটা বস্তু যে বাঁকতে পারে, সংকুচিত হতে পারে বা সাধারণভাবে তার আকার পাল্টাতে পারে তা আপাতত উপেক্ষা করা হচ্ছে)। সুতরাং, বস্তুর যে কোন বিন্দুতে কোন বল প্রয়োগ করলে বস্তুর সমস্ত অংশই গতিশক্তি লাভ করবে।

এই কৃতকার্যের হিসাবের মাধ্যমে বলের প্রয়োগবিন্দুর ভূমিকা পরিষ্কার হবে।

5.1 চিত্রে একটি অক্ষদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত একটি বস্তু দেখানো হয়েছে। বস্তুটি ϕ পরিমাণ ক্ষুদ্র কোণে আবর্তন করলে বলের প্রয়োগবিন্দু একটি বৃত্তচাপ বরাবর সরে যায় এবং মনে করি এই সরণ যেন S।
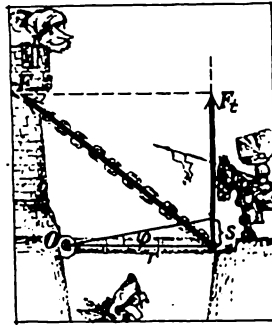
চিত্র 5.1

গতি বরাবর বলের অভিক্ষেপ নিলে অর্থাৎ বলের প্রয়োগবিন্দু যে পথে ঘোরে সেই বৃত্তপথের স্পর্শক বরাবর বলের উপাংশ নিলে আমরা কার্য A-এর পরিচিত রাশিমালাটি এইভাবে লিখতে পারি ঃ

$$A=F_t.s$$

s চাপকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ

$s=r\phi$; এখানে ঘূর্ণাক্ষ থেকে বলের প্রয়োগবিন্দুর দূরত্ব হল r ; তাহলে,

$$A=F_t r\phi$$

বস্তুটিকে বিভিন্নভাবে আবর্তন করানোর ক্ষেত্রে যদি আবর্তনের পরিমাণ এক এবং অভিন্ন রাখা যায় তাহলেও আমরা বলের প্রয়োগ বিন্দুর উপর নির্ভর করে বিভিন্ন পরিমাণের কার্য হিসাব করতে পারি।

কোণের পরিমাণ স্থির থাকলে, $F_t r$ গুণফলটির উপর কার্যের পরিমাণ নির্ভর করে। এই গুণফলটিকে **বলের ভ্রামক বা টর্ক** (M) বলে।

$$M=F_t r$$

আমাদের এই সূত্রটির অন্য একটি রূপ হতে পারে। ধরা যাক, O ঘূর্ণাক্ষ এবং B বলের প্রয়োগবিন্দু (চিত্র 5.2)। বলের অভিমুখের উপর O বিন্দু থেকে অঙ্কিত অভিলম্বের দৈর্ঘ্য d। এখন চিত্রে অঙ্কিত সদৃশ ত্রিভুজ দুটি থেকে লেখা যায়,

$$\frac{F}{F_t}=\frac{r}{d} \quad \text{বা,} \quad F_t r=Fd$$

d-কে 'বাহু' বা বলের 'লিভারবাহু' বলে।
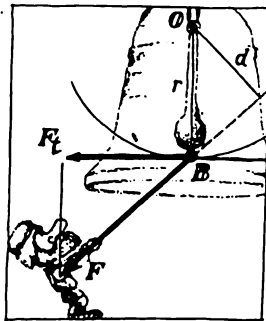
চিত্র 5·2

আমাদের নতুন সূত্র $M = Fd$-কে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়ঃ বল এবং বলের লিভারবাহুর গুণফলকে টর্ক বলা হয়।

বলের অভিমুখ বরাবর বলের প্রয়োগবিন্দু সরিয়ে নিয়ে গেলে লিভারবাহু d এবং সেই সঙ্গে টর্ক M-এর কোন পরিবর্তন ঘটবে না। সুতরাং, বলের ক্রিয়ারেখার উপর প্রয়োগবিন্দুটি যেখানেই থাকুক না কেন, কিছু যায় আসে না।

এই নবতর ধারণার আলোকে কার্যের সূত্রটি আরও সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ করা যায়ঃ

$$A = M\phi$$

অর্থাৎ, টর্ক এবং আবর্তন কোণের গুণফল কার্য।

ধরা যাক্, M_1 এবং M_2 ভ্রামকসম্পন্ন দুটি বল একটি বস্তুর উপর ক্রিয়া করছে। বস্তুটির আবর্তন ϕ হলে কৃতকার্যের পরিমাণ $M_1\phi + M_2\phi = (M_1 + M_2)\phi$। সমান চিত্রটির সাহায্যে বোঝা যাচ্ছে দুটি বলের পরিবর্তে $M = M_1 + M_2$ ভ্রামকসম্পন্ন একটিমাত্র বলের অধীনে বস্তুটি আবর্তন করলেও একই ফল হত। কিন্তু বলের ভ্রামক-গুলি পরস্পরকে যেমন সাহায্য করে, তেমনি বাধারও সৃষ্টি করে। M_1 এবং M_2 টর্ক দুটি যদি একই বস্তুকে একই দিকে ঘোরাতে চায় তাহলে তাদের মানের চিহ্ন একই ধরা হবে। বিপরীত পক্ষে, টর্ক দুটি যদি পরস্পর বিপরীত দিকে ঘোরাতে চায় তাহলে চিহ্নও পরস্পর বিপরীত হবে।

আমাদের জানা আছে, সমস্ত প্রকার বলই বস্তুর উপর ক্রিয়া করে গতিশক্তির পরিবর্তন ঘটায়।

বস্তুর আবর্তনের বেগ কমে যাক বা বেড়ে যাক, গতিশক্তির পরিবর্তন হবে। টর্কগুলির লব্ধি শূন্য না হলে এই পরিবর্তন অবশ্যই ঘটবে।

এখন, টর্কের লব্ধি শূন্য হলে কি হবে? স্পষ্টতই, উত্তরটি হবে—গতিশক্তির কোনরূপ পরিবর্তন ঘটবে না। সুতরাং জড়তাবশত বস্তুটি হয় সমবেগে ঘুরবে, না হয় স্থির থাকবে।

দেখা যাচ্ছে, ঘূর্ণক্ষম বস্তুর সাম্যাবস্থার শর্ত হল, বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল টর্কগুলি পরস্পরকে প্রশমিত করবে। আমাদের আলোচ্য টর্ক দুটির প্রভাবে বস্তু সাম্য অবস্থায় থাকলে লেখা যায়,

$$M_1 + M_2 = 0$$

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনাগুলিতে যেখানে আমরা বিস্তৃত বস্তুকে বিন্দুবস্তু হিসাবে ধরে নিতে পেরেছিলাম, সেখানে সাম্যাবস্থার শর্তটি আরও সহজ ছিল ঃ নিউটনের সূত্রানুসারে, কোন বস্তু স্থির বা সমবেগে চলমান থাকার জন্য লব্ধি বল শূন্য হলেই হত। সেক্ষেত্রে ঊর্ধ্বমুখী বল নিম্নমুখী বলকে বা ডানদিকের বল বাঁদিকের বলকে অবশ্যই প্রশমিত করে।

আমাদের এই ক্ষেত্রেও এই প্রশমনের নিয়মটি কার্যকরী হচ্ছে। ফ্লাইহুইলটি যদি স্থির অবস্থানে থাকে তাহলে এর উপর প্রযুক্ত বল অক্ষদণ্ডের প্রতিক্রিয়া বল কর্তৃক প্রশমিত হয়।

কিন্তু এই সমস্ত শর্ত প্রয়োজনীয় হলেও যথেষ্ট নয়। বল প্রশমিত হওয়া ছাড়াও টর্কের প্রশমন দরকার। বস্তুর স্থির থাকা বা সমবেগে আবর্তন করার জন্য বলের ভ্রামকগুলির প্রশমন দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় শর্তের মধ্যে পড়ে।

অনেকগুলি টর্ক থাকলে তাদের সহজেই দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর বস্তুকে ঘড়ির কাঁটার দিকে এবং অন্য শ্রেণী ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘোরাতে চায়। এই দুই শ্রেণীর ভ্রামকের পরিমাণ পরস্পর সমান ও বিপরীত হওয়া প্রয়োজন।

লিভার (Lever)

কোন ব্যক্তি কি একশ টন ওজনের একটি বস্তুর পতন আটকাতে পারে? কেউ কি হাত দিয়ে একটুকরা লোহা বিচূর্ণ করতে পারে? একটি শিশু কি একজন বলশালী লোকের মোকাবিলা করতে পারে? হ্যাঁ, তারা পারে।

একজন শক্তিমান লোককে বলুন তো ফ্লাইহুইলে অক্ষের কাছাকাছি ধরে সেটি ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরাতে। এক্ষেত্রে টর্কের পরিমাণ

খুবই কম হবে ঃ বলের পরিমাণ বেশ বেশী কিন্তু লিভারবাহু অনেক ছোট। যদি একটি ছোট ছেলে চাকার পরিধির কাছে ধরে তাকে উল্টো দিকে ঘোরাতে চায় তাহলে উৎপন্ন টর্কের পরিমাণ বেশী হওয়া অসম্ভব নয়। সাম্য অবস্থার শর্তটি হবে,

$$M_1 = M_2, \text{ অথবা } F_1 d_1 = F_2 d_2$$

ভ্রামকের এই নিয়মটি জানা থাকলে যে কোন ব্যক্তি অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে।

লিভারের কার্যকারিতা এই ধরনের অনেক চমকপ্রদ উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে।

ধরুন, আপনি একটি শাবলের সাহায্যে একটা বৃহৎ পাথর খণ্ডকে তুলতে চাইছেন। খণ্ডটির ওজন কয়েক টন হলেও আপনার পক্ষে কাজটি অসম্ভব নাও হতে পারে। কোন দৃঢ় বস্তুকে পিভট হিসাবে ব্যবহার করে ক্রোবারটি স্থাপন করুন। আবর্তনের কেন্দ্র হবে পিভটটি। দুটি বিপরীত টর্ক বস্তুটির উপর ক্রিয়া করবে ঃ একটি পাথরটির ওজন তোলার ব্যাপারে বাধা দেবে এবং অন্যটি তোলায় সাহায্য করবে। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয়টি আপনার হাতের বল। 1 এবং 2 অঙ্ক দুটি দিয়ে যদি পেশীর বল এবং পাথরের ওজন নির্দেশ করা হয় তাহলে পাথরটি তোলার সম্ভাবনাটি এভাবে লেখা যায় ঃ M_1-কে অবশ্যই M_2-র থেকে বড় হতে হবে।

ভূমি থেকে পাথরটি উপরে তুলে ধরার ক্ষেত্রে,

$$M_1 = M_2, \text{ অর্থাৎ } F_1 d_1 = F_2 d_2$$

ক্ষুদ্র লিভারবাহুটি (পিভট থেকে পাথর পর্যন্ত) যদি বড় বাহুটি (পিভট থেকে হাত পর্যন্ত) অপেক্ষা পনেরো গুণ ছোট হয় তাহলে যে কোন ব্যক্তি বড় বাহুর প্রান্তে শরীরের সমস্ত ওজন প্রয়োগ করে এক টন ওজনের পাথরটি মাটি থেকে উঁচুতে তুলে ফেলতে পারবে।

পিভটের উপরে শাবল জাতীয় দণ্ড রেখে তাকে লিভাররূপে ব্যবহার খুবই সহজ এবং প্রচলিত পদ্ধতি। এর সাহায্যে দশ-বিশগুণ বেশী বল সহজেই তৈরী করা যায়। একটা সাধারণ শাবলের দৈর্ঘ্য মোটামুটি 1·5 মিটারের মত। এতে নীচের দিকে 10 সেণ্টিমিটারের কম দূরত্বে পিভট ব্যবহার করা যায় না। সে কারণে দীর্ঘতর বাহুটি ক্ষুদ্রতর বাহু অপেক্ষা পনেরো থেকে কুড়ি গুণ বড় হতে পারে। বাহুটি যতগুণ বড় হবে বলও ততগুণ বেশী অর্জিত হবে।

জ্যাকের সাহায্যে গাড়ীর চালক কয়েক টন ওজনের একটা ভারী গাড়ীকে মাটির উপরে তুলে ফেলে। শাবলের মত এই জ্যাকও পিভটের উপর সংস্থাপিত একটা লিভার। কার্যকরী বলগুলির (হাত এবং গাড়ীর ওজন) প্রয়োগবিন্দু জ্যাকের উপর পিভটের দুই বিপরীত প্রান্তে থাকে। এসব ক্ষেত্রে প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ গুণের মত বল বৃদ্ধি ঘটে—এর সাহায্যে সহজেই প্রচণ্ড ভারী ওজন তোলা যায়।
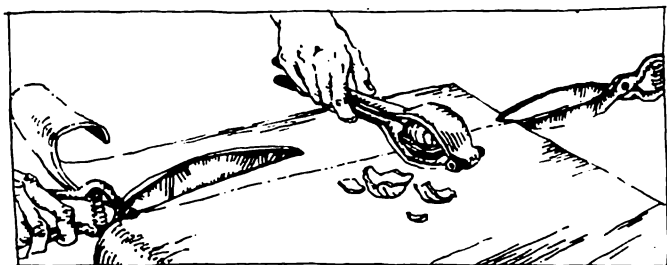
চিত্র 5·3
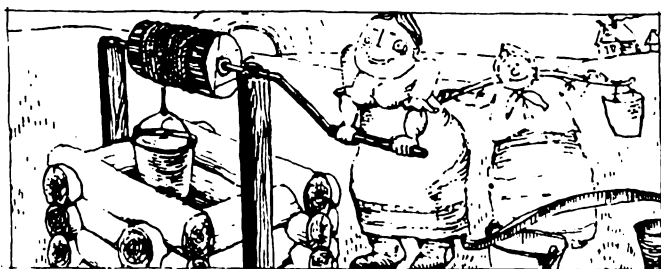
চিত্র 5·4

লিভারের উদাহরণ হিসাবে কাঁচি, জাঁতি, সাঁড়াশী, চিমটা এবং অন্যান্য অনেক যন্ত্রের নাম করা যায়। 5.3 চিত্রে কার্যের অনুকূল ও প্রতিকূল বলগুলির প্রয়োগবিন্দু এবং আবর্তনের কেন্দ্র (পিভট) এঁকে দেখানো হয়েছে।

কাঁচি দিয়ে একটা টিনের পাত কাটার সময় কাঁচির পাতদুটি যথা-সম্ভব খুলে নেওয়া হয়। এতে কি সুবিধা হয়? এর ফলে টিনের যে অংশটি যখন কাটা হয় তা ঘূর্ণনকেন্দ্রের কাছাকাছি থাকে। তাতে বিরুদ্ধ

টর্কের লিভারবাহুটি ছোট হয়ে যায় এবং বলের বৃদ্ধি বেশী হয়। কাঁচি বা চিমটা জাতীয় যন্ত্র ব্যবহার করার সময় একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি যে বল প্রয়োগ করে থাকেন তার পরিমাণ মোটামুটি 40-50 kgf-এর মত। একটি লিভারবাহু অন্যটি থেকে প্রায় কুড়ি গুণ বেশী লম্বা হয়। দেখা যাচ্ছে, এ ধরনের যন্ত্র দিয়ে প্রায় 1000 kgf বলের সৃষ্টি করা যায়। এই বলে আলোচ্য ধাতুর পাতকে কেটে দেওয়া যেতে পারে।

কপিকলও এক শ্রেণীর লিভার। অনেক গ্রামে কুয়ো থেকে জল টেনে তোলার জন্য কপিকল ব্যবহার করা হয় (চিত্র 5.4)।

পথপরিক্রমণে লোকসান (Loss in Path)

যন্ত্র মানুষকে ক্ষমতার অধিকারী করেছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যন্ত্রের সাহায্যে আমরা সামান্য পরিমাণ কার্যের বিনিময়ে প্রভূত কার্য সমাধা করতে পারি। শক্তির সংরক্ষণ সূত্র থেকে আমরা জেনেছি, 'কোন কিছু' খরচ না করে কার্য সৃষ্টি করা অসম্ভব।

লব্ধ কার্যের পরিমাণ কোন সময়ই কৃতকার্যের থেকে বেশী হতে পারে না। পক্ষান্তরে, ঘর্ষণ ইত্যাদির কারণে যেহেতু শক্তিক্ষয় সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, সুতরাং যন্ত্রের সাহায্যে লব্ধ কার্য সর্বদা কৃতকার্য অপেক্ষা কম হবেই। একেবারে আদর্শক্ষেত্রে, দুটির মান সমান হতে পারে।

ঠিক বলতে কি, এই নিপাট সত্যটি বোঝাবার জন্য আমরা অনর্থক সময় নষ্ট করছি। বস্তুত, আমরা ইতিপূর্বেই অনুকূল এবং বিরুদ্ধ বলের কৃতকার্যের সমতার সাহায্যে টর্কের নিয়মটি পেয়েছি।

বলের প্রয়োগ বিন্দুদ্বয়ের সরণ s_1 এবং s_2 হলে কার্যের সমতা থেকে লেখা যায় :

$$F_1 \cdot s_1 = F_2 \cdot s_2$$

লিভারের সাহায্যে s_2 পথ বরাবর F_2 বলকে অতিক্রম করার জন্য আমরা যে F_1 বল প্রয়োগ করি তার মান F_2 অপেক্ষা কম। কিন্তু F_2 থেকে F_1 যত গুণ ছোট ততগুণ বেশী আমাদের হাতের সরণ (s_1) ঘটাতে হয়। অর্থাৎ, s_1, s_2 থেকে ততগুণ বেশী হয়।

নিয়মটি ক্ষুদ্রতর বাক্যের সাহায্যে এভাবে বলা যায়, বলের বৃদ্ধিপথ পরিক্রমণের লোকসানের সমান।

প্রাচীন যুগের মহান বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস লিভারের সূত্রটি আবিষ্কার করেন। লিভারের বিস্ময়কর কার্যকারিতা লক্ষ্য করে এই বিখ্যাত বিজ্ঞানী সাইরাকুজের রাজা দ্বিতীয় হীরোকে লিখেছিলেন : "যদি অন্য

একটি পৃথিবী থাকত এবং আমি সেখানে যেতে পারতাম, তাহলে আমাদের পৃথিবীকে আমি নড়িয়ে দিতে পারতাম !" পৃথিবীর কাছাকাছি পিভট ব্যবহার করে খুব দীর্ঘ একটি লিভারের সাহায্যে ব্যাপারটি ঘটান যেত।

শুধু একটি পিভট বা আলম্বের অভাবে আর্কিমিডিস তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত করতে পারেন নি। যাই হোক, আলম্বের অভাবের জন্য আর্কিমিডিসের দুঃখের ভাগীদার হওয়ার দরকার আমাদের নেই।

আসুন আমরা কল্পনা করি ঃ যতদূর শক্ত হতে পারে এমন একটা লিভার নেওয়া হয়েছে এবং এটা পিভটে স্থাপন করে ক্ষুদ্রতর বাহুর প্রান্তে একটা ছোট্ট গোলক ঝোলান হয়েছে। গোলকটির ওজন 6×10^{24} kgf 'মাত্র'। এই আপাতনিরীহ সংখ্যা থেকে বোঝা যাবে, সমগ্র পৃথিবীকে চেপে একটা ক্ষুদ্র গোলকে পরিণত করলে তার ওজন কত হয়। এখন দীর্ঘ বাহুর প্রান্তে পেশীবল প্রয়োগ করা যাক।

আর্কিমিডিস যে বল প্রয়োগ করতেন তার মান যদি 60 kgf ধরা হয় তাহলে এই 'সুপারি-আকৃতি পৃথিবী'-কে 1 সে.মি. পরিমাণ সরাতে আর্কিমিডিসের হাতকে $(6\times10^{24})/60=10^{23}$ গুণ বেশী পথ পরিক্রমা করতে হত। 10^{23} সে.মি., 10^{18} কি.মি.-র সমান, এই পথ পৃথিবীর কক্ষপথের ত্রিশ কোটি গুণ বেশী।

এই কল্প উদাহরণের সাহায্যে লিভারের ব্যবহারে 'পথ পরিক্রমার লোকসান' সম্বন্ধে একটা আভাষ পাওয়া যাচ্ছে।

আমাদের উল্লিখিত সমস্ত উদাহরণের ক্ষেত্রেই শুধু যে বলবৃদ্ধির পরিমাণ বার করা তা নয়, পরিক্রমণজনিত লোকসানেরও হিসাব পাওয়া যেতে পারে। গাড়ীর চালক যখন জ্যাকের সাহায্যে গাড়ী উপরে তোলে তখন তার হাতকে অনেক বেশী বার ওঠা-নামা করতে হয়। চালকের পেশীবল গাড়ীর ওজনের থেকে যতগুণ কম, গাড়ী যে উচ্চতায় ওঠে তার ততগুণ বেশী পথ চালককে হাত ওঠাতে-নামাতে হয়। কাঁচি দিয়ে টিনের পাত কাটার সময়ও ঠিক তাই। টিনের রোধ হাতের বলের থেকে যতগুণ বেশী, ঠিক ততগুণ বেশী পথ আঙুলকে ওঠা-নামা করতে হয় টিনের কাটা অংশের দৈর্ঘ্যের তুলনায়। শাবল দিয়ে পাথর তোলার সময় পাথরের ওজনের থেকে পেশীর বল যতগুণ কম, পাথর যে উচ্চতায় উঠবে হাতকে ততগুণ বেশী নীচে নামাতে হবে। স্ক্রুর কার্যনীতি থেকেও ব্যাপারটি বোঝা যাবে। মনে করা যাক, আমরা 1 মি.মি. স্ক্রু-পিচের একটি বোল্টের মধ্যে স্ক্রু-চালনা করছি। রেঞ্চের

দৈর্ঘ্য 30 সে.মি.। সেক্ষেত্রে, বোল্টটি যখন একপাকে অক্ষবরাবর মাত্র 1 মি.মি. অগ্রসর হবে, সে সময়ে আমাদের হাতকে দীর্ঘ 2 মিটার পথ
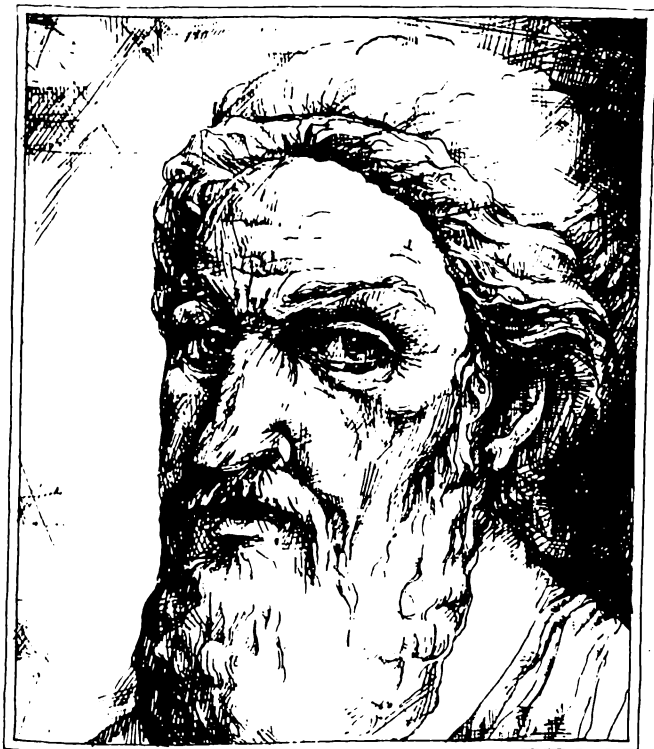
আর্কিমিডিস (কার্কা 287—212 খৃঃ পূঃ)—প্রাচীন যুগের প্রখ্যাত গণিতশাস্ত্রজ্ঞ, পদার্থবিদ ও স্থপতি। আর্কিমিডিস গোলক ও তার অংশবিশেষ, চোঙ এবং উপবৃত্ত, অধিবৃত্ত ও পরাবৃত্তের ঘূর্ণনে যে সকল ঘনবস্তু উৎপন্ন হয় তাদের আয়তন ও তলের ক্ষেত্রফল বার করার সূত্র আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথম বৃত্তের পরিধি ও তার ব্যাসের অনুপাতটি অতি নির্ভুলভাবে হিসাব করেন এবং $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$ দেখান। গতিবিদ্যায় তিনি লিভারের নিয়ম, ভাসমান বস্তুর শর্ত (আর্কিমিডিসের সূত্র) এবং সমান্তরাল বলের সংযোজন পদ্ধতি নির্ধারণ করেন। জল তোলার যন্ত্র (আর্কিমিডিসীয় স্ক্রু—আজকের যুগে সান্দ্র পদার্থের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়), লিভার পদ্ধতি ও ভারী ওজন তোলার ব্লক ইত্যাদি তিনি উদ্ভাবন করেন। রোমানদের দ্বারা তাঁর নিজের শহর সাইরাকুইজ অবরুদ্ধ হলে আর্কিমিডিস যে মিলিটারী যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন তা সার্থকভাবে প্রয়োগ করা হয়।

অতিক্রম করতে হবে। এতে বল সৃষ্টি হবে দু'হাজার গুণ এবং এর সাহায্যে আমরা বিভিন্ন বস্তুকে একসঙ্গে আটকে রাখতে বা হাতের অল্প চাপে একটা ভারী ওজনকে চালিত করতে পারব।

অন্যান্য অত্যন্ত সরল যন্ত্রপাতি (Other very simple machines)

বল সৃষ্টির জন্য লিভারের ক্ষেত্রেই একমাত্র পথ-পরিক্রমণের জরিমানা দিতে হয় তা নয়, বস্তুত, মানুষের ব্যবহৃত নানা যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিতেও এই সাধারণ নিয়মটি প্রযোজ্য।
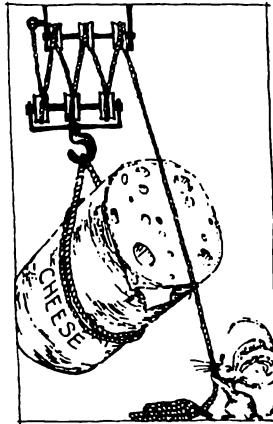
চিত্র 55

বোঝা তোলার জন্য একটা সাধারণ কৌশল প্রায়শ ব্যবহার করা হয়। এর জন্য কয়েকটি কপিকলকে একটার সঙ্গে আটকে বা কয়েকটি পরস্পর আবদ্ধ কপিকল-ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 5.5 চিত্রে এই রকম ব্যবস্থায় একটি বোঝাকে ছটা দড়ির সাহায্যে ঝোলান অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, মোট ওজন দড়িগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়েছে—অর্থাৎ, প্রত্যেক দড়িতে যে টান কাজ করছে তা বোঝার ওজনের ছয়ভাগের একভাগ। ফলে, এক টনের একটা বোঝা তুলতে মাত্র $1000/6 = 167$ kgf বলের দরকার। এর সঙ্গে এটাও বার করার অসুবিধা নেই যে, বোঝাটি 1 মিটার মত তুলতে একজনকে 6 মিটার লম্বা দড়িতে জোরে টান লাগাতে হবে। 1 মিটার তুলতে মোট

কৃতকার্যের পরিমাণ 1000 kgf-m। এই পরিমাণ কার্য আমাদেরও 'যে কোনভাবে' ব্যয় করতে হবে—1000/6 kgf বল প্রয়োগ করলে তার প্রয়োগবিন্দুকে 6 মিটার পথ-পরিক্রমণ করতে হবে। একইভাবে হিসাব করে বলা যায়, 10 kgf বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে পথের দৈর্ঘ্য হবে 100 মিটার বা 1 kgf বলের জন্য পথের দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে 1 কিলোমিটার।

26 পৃষ্ঠায় যে নততলের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও বলের বৃদ্ধি পথ-পরিক্রমণজনিত লোকসান মেনে নিয়ে পেতে হয়।

প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বলবৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। হাতুড়ি, কুঠার, ঢেঁকিকল, এমন কি, ঘুঁষির আঘাতেও প্রভূত বল উৎপন্ন করা যায়। প্রচণ্ড আঘাতের এই রহস্য বোঝা কঠিন নয়। একটা সুদৃঢ় দেওয়ালে পেরেক পোঁতার জন্য হাতুড়িকে বেশ দূরে নিয়ে যাওয়ার দরকার পড়ে। এর ফলে প্রযুক্ত বল অনেকটা পথ বরাবর কাজ করে এবং হাতুড়িতে যথেষ্ট পরিমাণে গতিশক্তি উৎপন্ন হয়। অল্প পরিমাণ পথে এই শক্তি সঞ্চালিত হয়। হাতুড়ি যদি $\frac{1}{2}$ মিটার উঁচুতে তোলা হয় এবং পেরেকটি যদি দেওয়ালে $\frac{1}{2}$ সে.মি. ঢুকে যায়, তাহলে বলটি 100 গুণ বেড়ে যায়। দেওয়ালটি যদি বেশ পোক্ত হয় এবং এর ফলে পেরেকটি মাত্র $\frac{1}{2}$ মি.মি. ঢুকতে পারে, তাহলে বল পূর্বাপেক্ষা দশগুণ বেশী শক্তিসম্পন্ন হয়। শক্ত দেওয়ালে পেরেক বেশী গভীরে না গেলেও এই অল্প পথের জন্য একই পরিমাণ কার্য করা হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে, হাতুড়িটি একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো কাজ করে ঃ দেওয়াল যত শক্ত হয়, হাতুড়িও তত জোরে ঘা দেয়।

1 কিলোগ্রাম ওজনের একটা হাতুড়িকে 'অধিকতর গতিশীল' করলে এটি পেরেককে প্রায় 100 kgf বল দিয়ে আঘাত করে। আবার, কুঠার দিয়ে কাঠ কাটার সময় বলের পরিমাণ দাঁড়ায় কয়েক হাজার kgf-এর মত। কামারশালায় অল্প উচ্চতা থেকেই ভারি হাতুড়ি ফেলা হয়, উচ্চতা সাধারণত 1 মিটারের মতো থাকে। কোন লৌহ-খণ্ডকে 1-2 মিলিমিটার বাড়াতে 1000 কি. গ্রা. ওজনের হাতুড়ি লোহার উপর প্রচণ্ড বলে আঘাত করে, এই বলের পরিমাণ 10^6 kgf।

কঠিন বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল সমান্তরাল বলের যোগ কিভাবে করা হয়
(How to add parallel forces acting on a solid body)

ইতিপূর্বে গতিবিদ্যার নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা যেখানে কোন বস্তুকে বিন্দু হিসাবে ধরে আলোচনা করেছি, সেখানে

বিভিন্ন বল খুব সাধারণ নিয়মে যোগ করা হয়েছে। সেখানে বলের সামান্তরিক সূত্রটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং যেখানে বলগুলি পরস্পর সমান্তরাল সেখানে তাদের মান সাধারণ সংখ্যার মত যোগ করা হয়েছে।

এখন ব্যাপারটি একটু জটিল পর্যায়ে পৌঁছেছে। কারণ, বস্তুর উপর বলের প্রভাব তো শুধুমাত্র বলের মান ও অভিমুখের উপর নির্ভর করে না, বলের প্রয়োগবিন্দু বা—আমরা একটু আগে আলোচনার মাধ্যমে যা দেখলাম—বলের ক্রিয়ারেখার উপরও নির্ভর করে।

বলের যোগের অর্থ হল, বলগুলির পরিবর্তে একটি মাত্র বল পাওয়া। সব সময় তা সম্ভব না হতেও পারে।

সমান্তরাল বলশ্রেণীর পরিবর্তে একটিমাত্র লব্ধিবল বার করার সমস্যাটি সহজেই সমাধান করা যায় (এর একটি ব্যতিক্রম রয়েছে—এই অধ্যায়ের শেষে তা আলোচনা করা হবে।)

এখন আসুন সমান্তরাল বলের লব্ধি বার করা যাক। অবশ্য 3 kgf এবং 5 kgf বলের অভিমুখ অভিন্ন হলে যোগফল 8 kgf হবে—এর মধ্যে কোন জটিলতা নেই। লব্ধিবলের প্রয়োগবিন্দু (বা ক্রিয়ারেখা) বার করার ব্যাপারটা শুধু বাকী থাকছে।

চিত্র 5.6

5.6 চিত্রে একটি বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল দুটি বল দেখান হয়েছে। F_1 এবং F_2 বল দুটির পরিবর্তে লব্ধি F পাচ্ছি, কিন্তু তার অর্থ শুধু এই নয় যে, $F=F_1+F_2$; পরন্তু, F-এর কার্যকারিতা F_1 এবং F_2-র কার্যকারিতার সমান এবং F_1 ও F_2 মোট যে টর্ক উৎপন্ন করে, F-ও সেই পরিমাণ টর্ক উৎপন্ন করে।

এখন লব্ধিবল F-এর ক্রিয়ারেখাটি খুঁজে পাওয়া দরকার। বোঝাই যাচ্ছে, রেখাটি F_1 এবং F_2-র সমান্তরাল হবে; কিন্তু এর অবস্থান F_1 এবং F_2 থেকে কত দূরে?

চিত্রে F_1 এবং F_2-র প্রয়োগবিন্দুর সংযোজক সরলরেখার উপর F-এর প্রয়োগবিন্দু হিসাবে একটি বিন্দু দেখান হয়েছে। নির্বাচিত এই বিন্দু সাপেক্ষে F-এর ভ্রামক অবশ্যই শূন্য হবে। সেক্ষেত্রে এই বিন্দু সাপেক্ষে F_1 এবং F_2-র ভ্রামকগুলির যোগফলও শূন্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ, F_1 এবং F_2 কর্তৃক উৎপন্ন টর্কগুলির মান সমান কিন্তু বিপরীত চিহ্নযুক্ত হবে।

F_1 এবং F_2-র লিভার বাহু যথাক্রমে d_1 এবং d_2 দ্বারা সূচিত করলে আমরা উপরোক্ত যুক্তির সাহায্যে লিখতে পারি :

$$F_1 d_1 = F_2 d_2,\ \text{অর্থাৎ,}\ \frac{F_1}{F_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

রেখাবৃত ত্রিভুজ দুটির সাদৃশ্য থেকে জানা যাচ্ছে, $\frac{d_2}{d_1} = \frac{l_2}{l_1}$, অর্থাৎ লব্ধিবলের প্রয়োগবিন্দু সংযোজক রেখাখণ্ডকে l_1 এবং l_2 অংশে ভাগ করেছে এবং অংশগুলি বল দুটির ব্যস্তানুপাতিক।

F_1 এবং F_2-র প্রয়োগবিন্দুদ্বয়ের দূরত্বকে l দ্বারা নির্দেশ করলে স্পষ্টতই, $l = l_1 + l_2$

এবার নীচের সমীকরণ দুটির সাহায্যে চলরাশি দুটির সমাধান করা যাক।

$$F_1 l_1 - F_2 l_2 = 0$$
$$l_1 + l_2 = l$$

এর থেকে পাওয়া যাচ্ছে,

$$l_1 = \frac{F_2 l}{F_1 + F_2}\ \text{এবং}\ l_2 = \frac{F_1 l}{F_1 + F_2}$$

চিত্র 5.7
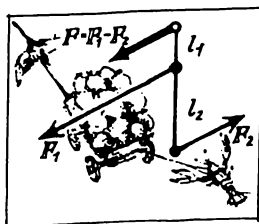
এই সূত্রগুলির সাহায্যে শুধু সমমুখী সমান্তরাল বলের ক্ষেত্রে লব্ধির প্রয়োগবিন্দু পাওয়া যায় তা নয়, বল দুটি বিপরীত মুখে সমান্তরাল হলেও তা পাওয়া যাবে। বলগুলি ভিন্নমুখী হলে তাদের চিহ্নও পরস্পর বিপরীত হবে। সেক্ষেত্রে লব্ধি তাদের বিয়োগফল $F_1 - F_2$ হবে, যোগফল না। ক্ষুদ্রতর বল F_2-কে ঋণাত্মক ধরলে আমাদের সূত্র থেকে দেখা যায় যে, l_1 ঋণাত্মক হচ্ছে। সেক্ষেত্রে F_1 বলের প্রয়োগবিন্দু লব্ধির প্রয়োগ বিন্দুর বাম দিকে (আগের মত) থাকবে না, ডানদিকে চলে আসবে (চিত্র 5.7)।

অধিকন্তু আগের মতই

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{l_2}{l_1} \text{ হবে।}$$

সমমানের বিপরীতমুখী সমান্তরাল বলের ক্ষেত্রে একটি মজার ফলাফল দেখা যায়। এক্ষেত্রে, $F_1 + F_2 = 0$; সূত্র দেখে বোঝা যাচ্ছে, l_1 এবং l_2-র মান অসীম হয়ে পড়ে। এর ব্যাখ্যা কি বোঝায়? যেহেতু লব্ধি অসীমে স্থাপন করার কোন বাস্তব অর্থ নেই, সুতরাং সমমানের বিপরীতমুখী সমান্তরাল বলকে একটি মাত্র বলে পরিণত করাও সম্ভব নয়। এই সম্মিলিত বলকে যুগ্মবল বা দ্বন্দ্ব বলে।

দ্বন্দ্বের কার্যকারিতা একটিমাত্র বলের কার্যকারিতায় নিয়ে আসা যায় না। একমুখে সমান্তরাল বা বিপরীত মুখে সমান্তরাল যে কোন যুগল বলকে একটি মাত্র বলে পরিণত করা যায়, কিন্তু দ্বন্দ্বকে করা যায় না।

দ্বন্দ্বের বল দুটি পরস্পরকে প্রশমিত করে—এই ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। দ্বন্দ্বের একটি সুস্পষ্ট কার্যকারিতা রয়েছে—এটি বস্তুর আবর্তন ঘটায়। দ্বন্দ্বের কার্যকারিতার বৈশিষ্ট্য হল, দ্বন্দ্ব কখনও সরলরৈখিক গতি উৎপন্ন করে না।

কোন কোন ক্ষেত্রে সমান্তরাল বল যোগ করার পরিবর্তে একটি বলকে দুটি সমান্তরাল বলে বিভাজিত করা প্রয়োজন পড়ে।

5.8 চিত্রে দুই ব্যক্তিকে একটি দণ্ডের সাহায্যে একটি ভারী ঝুড়ি বইতে দেখা যাচ্ছে। ঝুড়িটির ভার ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে। দণ্ডের মাঝখানে যদি বোঝাটির ভার কাজ করে তবে উভয়েই সমান ভার বহন করবে। বোঝার প্রয়োগবিন্দু থেকে ব্যক্তিদ্বয়ের দূরত্ব যদি d_1 এবং d_2 হয়, তবে F বলটি F_1 এবং F_2 বলে বিভাজিত হবে এবং বিভাজনের নিয়মটি হল

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

দেখা যাচ্ছে, বোঝার কাছাকাছি অংশে বলশালী ব্যক্তির ধরা উচিত।
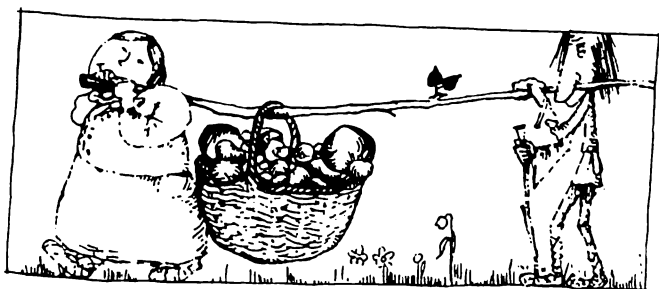
চিত্র 5.8

ভারকেন্দ্র (Centre of gravity)

একটি বস্তুর সমস্ত কণারই ভার আছে। সুতরাং, একটি কঠিন বস্তু অসংখ্য অভিকর্ষ বলের অধীন। অধিকন্তু, বলগুলি পরস্পর সমান্তরাল। সুতরাং, একটু আগের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, এই সমস্ত বলের পরিবর্তে একটিমাত্র বল পাওয়া সম্ভব। এই লব্ধির প্রয়োগবিন্দুকে বস্তুর **ভারকেন্দ্র** বলে। ভারকেন্দ্রটি এমন, যেন বস্তুটির সামগ্রিক ভার এই বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

একটি বস্তুকে তার যে কোন একটি বিন্দু থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। বস্তুটি তখন কিভাবে অবস্থান করবে? যেহেতু আমরা বস্তুটির পরিবর্তে ভারকেন্দ্রে সমান মানের একটি বস্তুপিণ্ড কল্পনা করে নিতে পারি, সেহেতু এটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, সাম্য অবস্থানে এই বস্তুপিণ্ড পিভটগামী উল্লম্ব রেখার উপর অবস্থান করবে এবং বস্তুপিণ্ডটি সম্ভাব্য সর্বনিম্ন অবস্থানে থাকবে।

কোন বস্তুকে এমনভাবে সংস্থাপন করা যায় যে, তার ভারকেন্দ্র ঘূর্ণাক্ষগামী উল্লম্বরেখায় কিন্তু পিভটের উপরে থাকে। এটা সম্ভব হয় ঘর্ষণের জন্য, তবে এভাবে বস্তুকে রাখা বেশ কঠিন। এই ধরনের সাম্যকে **অস্থির সাম্য** বলে।

সুস্থির সাম্যের শর্ত আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি—যখন বস্তুর স্থিতিশক্তি সর্বনিম্ন হয় তখন সেটি ঘটে। ভারকেন্দ্র যখন পিভটের নীচে থাকে তখনই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। বস্তুটির বিক্ষেপ

ঘটালে ভারকেন্দ্র উঁচুতে ওঠে এবং এতে তার স্থিতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। বিপরীতপক্ষে, ভারকেন্দ্র যখন পিভটের উপরে অবস্থান করে তখন একটা মৃদু ধাক্কাতেই বস্তুটির অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে যায় এবং স্থিতিশক্তি সর্বনিম্ন মানে চলে আসে। এই অবস্থাকে সেজন্য অস্থির সাম্য অবস্থা বলা হয়।

কার্ডবোর্ড থেকে যে কোন আকারের একটি অংশ কেটে নেওয়া যাক। এর ভারকেন্দ্র বার করার জন্য দু'বার একে দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিন্দু থেকে ঝোলাতে হবে। ভারকেন্দ্রগামী অক্ষের সঙ্গে কার্ডবোর্ডের টুকরাটিকে আটকে দেওয়া হল। এবার টুকরাটি এক, দুই, তিন···· বিভিন্ন অবস্থানে রাখা হল। দেখা যাবে, সব ক্ষেত্রেই বস্তুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভঙ্গীতে সাম্য-অবস্থানে রয়েছে। যে কোন অবস্থানে এই যে বিশেষ সাম্য-অবস্থা তাকে সঠিকভাবেই নিরপেক্ষ সাম্য বলা যায়।

ইদৃশ আচরণের কারণটি পরিষ্কার। খণ্ডটির যে কোন অবস্থানে এর ভারকেন্দ্রটি এক এবং অভিন্ন বিন্দুতে রয়েছে।

বহুক্ষেত্রে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা হিসাব-নিকাশ ছাড়াই ভারকেন্দ্র বার করা যায়। এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, গোলক, বৃত্ত, বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্রাকৃতি বস্তুর ভারকেন্দ্র তাদের জ্যামিতিক কেন্দ্রবিন্দুতেই অবস্থান করে। কারণ, এগুলি প্রতিসম বস্তু। মনে মনে এই প্রতিসম বস্তুকে অনেক ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করলে প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশ কেন্দ্রের অন্য দিকের একটি ক্ষুদ্র অংশের প্রতিসম হবে। এ জাতীয় প্রতিটি কণা-জোড়ের জন্য বস্তুর কেন্দ্রই বস্তুর ভারকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

ত্রিভুজের ভারকেন্দ্র মধ্যমা তিনটির ছেদবিন্দুতে অবস্থিত। ব্যাপারটি বুঝতে ত্রিভুজটির একটি বাহুর সমান্তরালে ত্রিভুজটিকে কতকগুলি সরু ফালিতে ভাগ করা যাক। একটি মধ্যমা এই ফালিগুলিকে সমান ভাগে বিভক্ত করে। একটি ফালির ভারকেন্দ্র অবশ্যই তার মধ্যবর্তী বিন্দুতে অবস্থান করবে, অর্থাৎ মধ্যমার উপরে। এইভাবে সমস্ত ফালির ভারকেন্দ্রগুলি মধ্যমার উপরে অবস্থান করে। এই সমস্ত ভার যোগ করে এরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ত্রিভুজটির ভারকেন্দ্র মধ্যমাটির উপরে কোথাও আছে। যে কোন মধ্যমার ক্ষেত্রে একই যুক্তি খাটে। সুতরাং, ভারকেন্দ্রটি অবশ্যই মধ্যমাগুলির ছেদবিন্দুতে অবস্থান করবে।

তিনটি মধ্যমাই যে একটি বিন্দুতে ছেদ করে তা বোধহয় বিশ্বাস করতে অসুবিধা হতে পারে। জ্যামিতিশাস্ত্রে এটি প্রমাণ করা হয়। অবশ্য যুক্তি দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ উপপাদ্যটি আমরা প্রমাণ করতে পারি।

কোন বস্তুরই একাধিক ভারকেন্দ্র থাকতে পারে না। যেহেতু ত্রিভুজটির ভারকেন্দ্র কেবলমাত্র মধ্যমার উপরেই থাকবে এবং যে কোন শীর্ষবিন্দু থেকেই ত্রিভুজটি ঝোলান হোক না কেন, মধ্যমাগুলি সর্বদা একটি বিন্দুর মধ্য দিয়েই যাবে এবং এই বিন্দুই তাদের ছেদবিন্দু তথা বস্তুর ভারকেন্দ্র। দেখা যাচ্ছে, পদার্থ বিজ্ঞানের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে জ্যামিতির উপপাদ্যেরও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

সমসত্ত্ব শঙ্কুর ভারকেন্দ্র নির্ণয় করা আরও কঠিন। কেবলমাত্র প্রতিসাম্যের ধারণা থেকে বলা যায়, শঙ্কুর ভারকেন্দ্র তার অক্ষের উপরে থাকবে। হিসাব করে দেখা যায় যে, শঙ্কুর ভারকেন্দ্র ভূমি থেকে এক-চতুর্থাংশ উচ্চতায় অক্ষের উপরে অবস্থান করে।

ভারকেন্দ্র যে সর্বদা বস্তুর পদার্থের অন্তর্গত একটি বিন্দু হবে তা নয়। উদাহরণস্বরূপ, একটা আংটার ভারকেন্দ্র আংটার কেন্দ্রে অবস্থিত ; এই ভারকেন্দ্রটি আংটার অন্তর্গত কোন বিন্দু নয়।
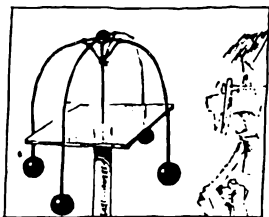
চিত্র 5.9

একটা পিন কি কাচের বেদীতে খাড়াভাবে বসান সম্ভব ?

কিভাবে এটা করা যায় তা 5.9 চিত্রে দেখান হয়েছে। তারের সাহায্যে একটা ছোট্ট কাঠামো বানিয়ে তাতে চারটি ছোট ভার ঝুলিয়ে কাঠামোটি পিনের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আটকে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু ভারগুলি পিভটের থেকে অনেক নীচে ঝুলছে এবং পিনটির ভার খুবই সামান্য, সেকারণে ব্যবস্থাটির ভারকেন্দ্র পিভটের নীচে অবস্থান করবে। অবস্থাটি সুস্থিত সাম্য বলা যায়।

এ পর্যন্ত আমরা যেসব বস্তুর আলোচনা করলাম তাদের বিন্দু-অবলম্বন নিয়ে বিচার করা হয়েছে। কোন বস্তু যদি একটি তলের উপর অবস্থান করে সেখানে তার সাম্যাবস্থার ব্যাপারটি কেমন দাঁড়ায়। কোন ক্ষেত্র অবলম্বনের উপর বস্তুর ভারকেন্দ্র অবলম্বনের উপরে থাকলে এটা বোঝায় না যে, তার সাম্য-অবস্থান সুস্থিত হতে পারে না। নাহলে,

টেবিলের উপর গ্লাস থাকে কিভাবে ? বস্তুর স্বাভাবিক সুপ্রতিষ্ঠার শর্ত হল, বস্তুর ভারকেন্দ্রগামী উল্লম্বরেখা অবলম্বনের উপর বস্তুর পাদভূমিকে ছেদ করবে। বিপরীতক্রমে, যদি ক্রিয়ারেখা পাদভূমির বাইরে দিয়ে যায় তবে বস্তুটির পতন ঘটবে।

অবলম্বন থেকে বস্তুর ভারকেন্দ্রের উচ্চতার উপর বস্তুর সুপ্রতিষ্ঠার বিশেষ হেরফের ঘটে। নেহাৎ অসাবধানী না হলে কারও হাতে লেগে চায়ের গ্লাস উল্টে যেতে পারে না। কিন্তু ছোট্ট ভূমির উপর দাঁড়ানো ফুলদানীটা অসতর্ক স্পর্শে উল্টে যেতে পারে। এখানে কারণটি কি ?

চিত্র 5·10

5.10 চিত্রটি দেখা যাক। দুটি ফুলদানীর ভারকেন্দ্রে একই ধরনের অনুভূমিক বল ক্রিয়া করছে। ডানদিকের ফুলদানীটি পড়ে গেছে, এর

চিত্র 5.11

কারণ লব্ধিবল এটির পাদভূমির ভিতর দিয়ে যায় নি, একপাশ দিয়ে চলে গেছে।

আগেই বলা হয়েছে, বস্তুর সুপ্রতিষ্ঠার জন্য বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল যেন অবলম্বনের উপর বস্তুর পাদভূমির ভিতর দিয়ে যায়। কিন্তু সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য অবলম্বনের প্রয়োজনীয় অংশের পরিমাণ সব সময় পাদ-ভূমির বাস্তব ক্ষেত্রফলের সমান হয় না। 5.11 চিত্রে যে বস্তুটি দেখা যাচ্ছে তার অবলম্বনের ক্ষেত্রটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি। অর্ধচন্দ্রাকৃতি ক্ষেত্রকে যদি বস্তু দিয়ে ভর্তি করে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ঘনবস্তুতে পরিণত করা হয় তাহলেও বস্তুটির সুপ্রতিষ্ঠার জন্য কোন পরিবর্তন ঘটানো যাবে না। দেখা যাচ্ছে, সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রফল বস্তুর পাদভূমির ক্ষেত্রের থেকে বেশী হতে পারে।

5.12 চিত্রে যে ত্রিপদটি দেখান হয়েছে তার পাদভূমির ক্ষেত্রফল বার করার জন্য ত্রিপদের শীর্ষবিন্দুগুলি সরলরেখা দিয়ে যোগ করতে হবে।

টান টান করে বাঁধা দড়ির উপর দিয়ে হাঁটা কঠিন কেন? কারণ, এক্ষেত্রে অবলম্বনের ক্ষেত্রফল উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। টান করা
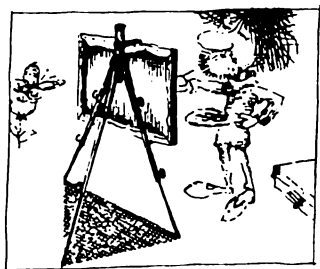
চিত্র 5.12

দড়ির উপর দিয়ে হাঁটা বাস্তবিকই সহজ নয় এবং দক্ষ দড়ি-খেলোয়াড় বিনা কারণে অভিনন্দিত হয় না। যাই হোক, দর্শককুল এ জাতীয় কলাকৌশলকে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক হিসাবে ধরে নিয়ে ভুল করেন। খেলোয়াড় বেশ নমনীয় একটি বাঁকের দুপ্রান্তে দু'বালতি জল নেন এবং বাঁকটি এমনভাবে ধরেন যাতে বালতি দুটি টান করা দড়ির নীচে অবস্থান করে। অর্কেস্ট্রা বাজতে শুরু করলে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে খেলোয়াড়টি দড়ি-বরাবর হাঁটতে শুরু করে। অনভিজ্ঞ দর্শক ভাবেন, খেলোয়াড়টি কি অনবদ্য কৌশলই না আয়ত্ত করেছে। বস্তুত,

ভারকেন্দ্র নীচে নামিয়ে খেলোয়াড়টি তার কাজকে অনেক সহজ করে নিয়েছে।

ভরকেন্দ্র (Centre of mass)

এখন নীচের প্রশ্নটির সমাধান করা যাক। প্রশ্নটি নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক নয়। একটি বস্তুশ্রেণীর ভারকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? অনেকে মিলে যদি একটি ভেলায় চাপেন তাহলে ভারকেন্দ্রের অবস্থানের উপর তাদের (ভেলাটি সহ) সুস্থিতি নির্ভর করবে।

আমাদের ভারকেন্দ্রের ধারণাটি এখানে একই থাকছে। আলোচ্য বস্তুসমূহের উপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষ বলগুলির লব্ধি যে বিন্দু দিয়ে কাজ করে তাকেই সমষ্টির ভারকেন্দ্র বলা হবে।

দুটি বস্তুর ক্ষেত্রে এই ভারকেন্দ্রের হিসাব আমাদের জানা আছে। বস্তু দুটির ওজন F_1 এবং F_2 ও তাদের পারস্পরিক দূরত্ব যদি x হয় তাহলে, তাদের ভারকেন্দ্র প্রথম বস্তু থেকে x_1 দূরত্বে এবং দ্বিতীয় বস্তু থেকে x_2 দূরত্বে অবস্থিত হলে আমরা জানি,

$$x_1 + x_2 = x \text{ এবং } \frac{F_1}{F_2} = \frac{x_2}{x_1}$$

বস্তুর ওজন mg দিয়ে প্রকাশ করা যায়। সুতরাং ভারকেন্দ্র নিম্নোক্ত শর্তটি পালন করে

$$m_1 x_1 = m_2 x_2$$

অর্থাৎ, ভারকেন্দ্রটি এমন বিন্দুতে অবস্থিত হবে যেটি ভর দুটির দূরত্বকে তাদের ভরের ব্যস্ত-অনুপাতে ভাগ করে।

কোন উঁচু জায়গায় রাখা বন্দুক থেকে গুলি ছোড়ার ঘটনাটি মনে করা যাক। বন্দুক ও গুলির ভরবেগগুলি মানে সমান কিন্তু বিপরীত-মুখী। সমীকরণগুলি এইরকম ঃ

$$m_1 v_1 = m_2 v_2, \text{ অথবা } \frac{v_2}{v_1} = \frac{m_1}{m_2}$$

সংঘাতকালে বেগের এই অনুপাত একই থাকে।

আঘাত ও প্রত্যাঘাতের ফলে বন্দুক এবং গুলি পরস্পর বিপরীত মুখে ছিটকে যায়। x_1 এবং x_2 যথাক্রমে ওদের প্রাথমিক অবস্থান থেকে সরণের পরিমাণ ধরা যাক। x_1 এবং x_2 দূরত্বগুলি সময়ের সঙ্গে বাড়তে থাকে, কিন্তু বেগের ধ্রুব অনুপাতের জন্য এদের অনুপাত সর্বদা একই থাকে।

$$\frac{x_2}{x_1} = \frac{m_1}{m_2} \text{ বা, } x_1 m_1 = x_2 m_2$$

বলা বাহুল্য, x_1 এবং x_2 যথাক্রমে বন্দুক ও গুলির সরণ। ভারকেন্দ্রের হিসাব করার সময় যে সূত্র পাওয়া গেছে তার সঙ্গে বর্তমানের সূত্রটির কোন পার্থক্য নেই। এতে বোঝা যায়, গুলি ছোঁড়ার পরেও বন্দুক ও গুলির ভারকেন্দ্র তার প্রাথমিক অবস্থানেই রয়ে গেছে।

অন্যভাবে বললে, আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল জানতে পারলাম—বন্দুক ও গুলির ভারকেন্দ্র গুলি ছোঁড়ার পরেও স্থির অবস্থানে থাকে।

এই বক্তব্য সততই খাটে ঃ দুটি বস্তুর ভারকেন্দ্র যদি প্রথমে স্থির থাকে তবে যে কোন রকমের সংঘাত ঘটুক না কেন, সংঘাতের জন্য ভারকেন্দ্রের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

ঠিক এই কারণেই কেউ নিজের চুল টেনে নিজেকে উপরে তুলতে পারবে না বা সেই বিখ্যাত ফরাসী লেখক Cyrano de Bergerac-এর প্রস্তাব অনুযায়ী (অবশ্যই মজা করে) কেউ উপর দিকে একটা চুম্বক ছুঁড়ে দিয়ে আর হাতে একটা লোহার টুকরো নিয়ে চুম্বকের আকর্ষণে চাঁদের বুকে নিজেকে তুলে নিতে পারবে না।

ভিন্ন জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্র সাপেক্ষে কোন স্থির ভারকেন্দ্র সমবেগে গতিশীল হতে পারে। সুতরাং, ভারকেন্দ্র হয় নিশ্চল থাকে কিংবা সমবেগে সরলরৈখিক পথে গতিশীল হতে পারে।

দুটি বস্তুর ভারকেন্দ্র সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে অনেকগুলি বস্তু সম্বন্ধে সে কথাই খাটে। অবশ্য, পরিপার্শ্ব থেকে স্বতন্ত্র বস্তুগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ভরবেগ সংরক্ষণসূত্র প্রয়োগ করার সময় এই রকমই ধরে নেওয়া হয়।

দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি পরস্পর ক্রিয়ারত বস্তুগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে একটি বিন্দু রয়েছে যেটি হয় স্থির, নতুবা সমবেগে চলমান অবস্থায় থাকে। এই বিন্দুটিই তাদের ভারকেন্দ্র।

বিন্দুটির উপর নতুন আর একটি ধর্ম আরোপ করতে গিয়ে আমরা একে ভরকেন্দ্রও বলি। বস্তুতপক্ষে, সৌরজগতের ভার (সেই সঙ্গে এর ভারকেন্দ্র)-এর প্রশ্ন তুললে সেটি একটি 'কাল্পনিক' বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

কয়েকটি বস্তুর একটি সংহতগোষ্ঠী যেভাবেই গতিশীল থাকুক না কেন, তাদের ভর (ভার) কেন্দ্র স্থির থাকবে বা জড়তার কারণে অন্য নির্দেশতন্ত্র সাপেক্ষে গতিশীল হবে।

কৌণিক ভরবেগ (Angular momentum)

আমরা এখন গতিবিদ্যার আর একটি ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে চলেছি এবং এর সাহায্যে গতির একটি নতুনতর ও গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের

সন্ধান পাব। বিষয়টি হল, **কৌণিক ভরবেগ** বা **ভরবেগের ভ্রামক**। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে, এই নতুন বিষয়টি অনেকটা বলের ভ্রামকের মত হবে। বলের ভ্রামকের মত ভরবেগের ভ্রামকের ক্ষেত্রেও কোন্ বিন্দু সাপেক্ষে ভ্রামক নেওয়া হচ্ছে তার নির্দেশ থাকা দরকার। কোন বিন্দু সাপেক্ষে কৌণিক ভরবেগের ভ্রামক বার করতে হলে ভরবেগ ভেক্টরটি গঠন করে উক্ত বিন্দু থেকে ভরবেগের অভিমুখের উপর লম্ব টানতে হবে। ভরবেগ mv-কে লিভারবাহু d দিয়ে গুণ করলেই কৌণিক ভরবেগ পাওয়া যায় এবং এই কৌণিক ভরবেগ N দ্বারা সূচিত করলে

$$N = mvd$$

অবাধে গতিশীল বস্তুর গতিবেগ পাল্টায় না, ফলে কোন বিন্দু থেকে এই গতিমুখের উপর লিভার-বাহুরও পরিবর্তন ঘটবে না ; কারণ, বস্তুর গতিপথ সরলরৈখিক। এরূপ শক্তির ক্ষেত্রে কৌণিক ভরবেগ অবশ্যই স্থির মানের হবে।
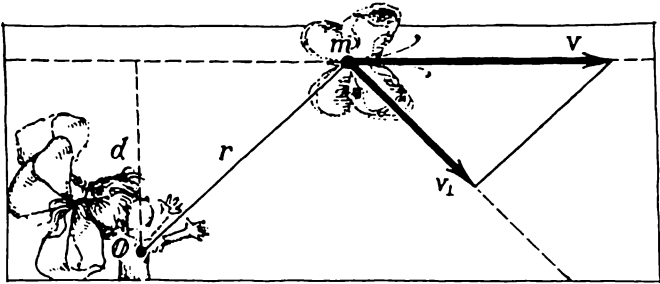
চিত্র 5.13

বলের ভ্রামকের মত এখানেও আমরা ভরবেগের ভ্রামকের জন্য অন্য একটি সূত্র বার করতে পারি। যে বিন্দু সাপেক্ষে আমরা কৌণিক ভরবেগ মাপতে চাই সেখান থেকে বস্তুর অবস্থান পর্যন্ত একটি ব্যাসার্ধ ভেক্টর অংকন করা যাক (চিত্র 5.13)। ব্যাসার্ধ ভেক্টরের লম্ব বরাবর বস্তুর বেগের অভিক্ষেপও টানা হল। চিত্রের সদৃশ ত্রিভুজের ধর্ম থেকে পাওয়া যায় $v/v_\perp = r/d$, সুতরাং, $vd = v_\perp r$ এবং কৌণিক ভরবেগ N-কে সেক্ষেত্রে এভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$N = mv_\perp r$$

একটু আগেই বলা হল। বাধামুক্ত গতির ক্ষেত্রে কৌণিক ভরবেগের মান স্থির। ঠিক আছে। কিন্তু যদি কোন বল বস্তুর উপর ক্রিয়ারত হয়? গণনা করে দেখানো যায়, প্রতি সেকেণ্ডে কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তন টর্কের সমান।

একাধিক বস্তু থাকলেও এই সূত্র প্রযোজ্য হবে। একক সময়ে প্রতিটি বস্তুর কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তন যদি যোগ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যোগফলটি বস্তুগুলির উপর ক্রিয়াশীল টর্কের সমষ্টির সমান হচ্ছে। সুতরাং, বস্তুসমষ্টির ক্ষেত্রে লেখা যায়ঃ একক সময়ে কৌণিক ভরবেগের মোট পরিবর্তন বলগুলির ভ্রামকের সমষ্টির সমান।

কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণসূত্র (Law of conservation of angular momentum)

দুটি পাথরের টুকরো একটি দড়ির দু'প্রান্তে বেঁধে তাদের একটি সজোরে নিক্ষেপ করলে অন্যটিও প্রথমটির পিছু পিছু ছুটবে। টুকরো দুটি একে অন্যকে পিছনে ফেলে ছুটতে চাইবে এবং এর ফলে ওদের মধ্যে একটি আবর্ত-গতির সৃষ্টি হবে। অভিকর্ষ-ক্ষেত্রের কথা ভুলে যাওয়া যাক কিংবা ধরা যাক, পাথর দুটি মহাশূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে।

পাথর দুটির উপর ক্রিয়াশীল বলগুলি সমান এবং দড়ি বরাবর পরস্পর অভিমুখী (কারণ বলগুলি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল)। সুতরাং যে কোন বিন্দু সাপেক্ষে বল দুটির লিভারবাহু সমান হবে। সমান লিভারবাহু এবং সমান কিন্তু বিপরীত বলের কারণে উদ্ভূত টর্কগুলির মানও সমান হবে এবং সেই সঙ্গে বিপরীত চিহ্নযুক্ত।

লব্ধি টর্ক শূন্য হবে। সুতরাং এর থেকে বোঝা যায়, কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তনও শূন্য হবে। যার অর্থ, এই ব্যবস্থায় কৌণিক ভরবেগের মান অপরিবর্তিত থাকবে।

দড়িতে বাঁধা পাথরের টুকরোর প্রসঙ্গ এনে আমরা যেন ব্যাপারটি 'দেখতে' চেয়েছিলাম। প্রকৃতপক্ষে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারত যে কোন বস্তু-যুগলের ক্ষেত্রে কৌণিক ভরবেগের এই সংরক্ষণসূত্র প্রযোজ্য, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি যাই হোক না কেন, কিছু যায় আসে না।

হ্যাঁ, শুধু একজোড়া বস্তুর ক্ষেত্রে না। বস্তুসমষ্টির ক্ষেত্রেও অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে বলগুলিকে সমান সংখ্যক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় ভাগ করা যায় এবং এইভাবে জোড়ায় জোড়ায় তারা পরস্পরকে প্রশমিত করে।

সামগ্রিক কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণসূত্র সার্বজনীন। বস্তু-সমষ্টির ক্ষেত্রেও অবশ্যই প্রযোজ্য।

কোন অক্ষ সাপেক্ষে ঘূর্ণায়মান বস্তুর কৌণিক ভরবেগ $N = mvr$. এখানে m, বস্তুর ভর; v, গতিবেগ এবং r, অক্ষ থেকে বস্তুর দূরত্ব। বেগকে প্রতি সেকেণ্ডে ঘূর্ণনসংখ্যা n দ্বারা প্রকাশ করলে আমরা পাই,

$$v = 2\pi nr \text{ এবং } N = 2\pi mnr^2.$$

অর্থাৎ, কৌণিক ভরবেগ অক্ষ থেকে দূরত্বের বর্গের সমানুপাতিক।

ঘূর্ণায়মান টেবিলের উপর বসুন। হাতে ভারী ওজন তুলে নিন। হাত প্রসারিত অবস্থায় কাউকে টেবিলটি ধীরে ঘুরিয়ে দিতে বলুন। হঠাৎ হাত দুটি বুকের কাছে গুটিয়ে নিয়ে আসুন—দেখবেন টেবিলটি জোরে ঘুরতে শুরু করেছে। এবার হাত ছড়িয়ে দিন—বেগ কমে যাবে। ঘর্ষণের জন্য টেবিলটি না থামা পর্যন্ত আপনি আপনার গতিবেগ কয়েকগুণ পাল্টে ফেলতে পারেন।

এটা কি করে ঘটে?

প্রতি সেকেণ্ডে আবর্তন সংখ্যা স্থির থাকায় যখন ওজনগুলি অক্ষের কাছাকাছি আসে তখন কৌণিক ভরবেগ কমে যায়। এই 'কমে যাওয়া' পূরণ করার জন্য কৌণিক বেগ বৃদ্ধি পায়।

ব্যায়ামবিদ্ কলাকৌশল প্রদর্শনের জন্য কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণ সূত্রকে সুন্দর কাজে লাগায়। ব্যায়ামবিদ্ শূন্যে ডিগবাজী খায় কেমন করে? প্রথমত, সে স্থিতিস্থাপক মেঝে বা সহযোগীর হাতের সাহায্য নিয়ে ধাক্কায় উপরে ওঠে। এই অবস্থায় তার শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তার ওজন ও ধাক্কার বলে একটি 'তাৎক্ষণিক টর্কের সৃষ্টি হয়। ধাক্কার জন্য সম্মুখগতি উৎপন্ন হয় এবং টর্ক আবর্তগতির সৃষ্টি করে। অবশ্য শুধু এভাবে যে আবর্তন ঘটে তা বেশ ধীরগতি এবং দর্শকের প্রত্যাশা তাতে পূর্ণ হয় না। বাজিকর তার হাঁটুও মুড়ে নেয় এবং এভাবে তারা সারা শরীরকে ঘূর্ণাক্ষের যতটা সম্ভব 'কাছাকাছি জড়' করে। এতে হঠাৎ কৌণিক বেগ বৃদ্ধি পায় এবং তখন দ্রুত ঘুরে যাওয়া যায়। ডিগবাজী দেওয়ার কলাকৌশল মোটামুটি এই।

যৌথনৃত্যে নর্তকীদের দ্রুত ঘুরে যাওয়ার ব্যাপারটিও এই নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। সাধারণভাবে একজন নর্তকী তার প্রাথমিক কৌণিক ভরবেগ সঙ্গিনীর কাছ থেকে পায়। সেই মুহূর্তে নর্তকীর শরীর গুটিয়ে আসে, এতে ধীর আবর্তন শুরু হয় এবং তারপরে যখন

নর্তকী সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন এই ঘূর্ণন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কারণ, এসময় তার শরীরের প্রায় সব অংশই ঘূর্ণাক্ষের কাছাকাছি এসে পড়ে। কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণসূত্র অনুযায়ী তখন কৌণিক বেগ হঠাৎ বৃদ্ধি পায়।

কৌণিক ভরবেগের ভেক্টররূপ (Angular momentum as a vector)

এ যাবৎ আমরা কৌণিক ভরবেগের পরিমাণ নিয়েই আলোচনা করেছি, কিন্তু কৌণিক ভরবেগের ভেক্টর ধর্মও রয়েছে।

কোন একটি 'কেন্দ্র' সাপেক্ষে কোন বিন্দুর আবর্তন আলোচনা করা যাক। 5.14 চিত্রে বিন্দুটির দুইটি কাছাকাছি অবস্থান দেখান হয়েছে। আমরা এখানে বিন্দুটির কৌণিক ভরবেগ ও গতির তল সম্পর্কে আগ্রহী। গতির তলটি চিত্রে ছায়াবৃত করে দেখান হয়েছে—এই অংশটুকু ব্যাসার্ধ-ভেক্টর কর্তৃক অতিক্রান্ত ক্ষেত্রফল।
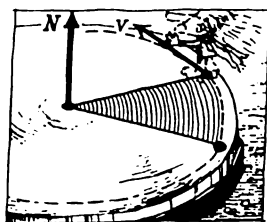
চিত্র 5.14

গতির তলের অভিমুখ ও কৌণিক ভরবেগের মান সম্পর্কিত তথ্যাদির সমন্বয় ঘটানো যাক। এই উদ্দেশ্যে গতির তলের লম্বদিকে কৌণিক ভরবেগের মান অনুযায়ী একটি ভেক্টর নেওয়া হল। অবশ্য এতেই হবে না—তলের উপর বস্তুর গতির অভিমুখও বিচার করতে হবে। কারণ, কোন বিন্দু সাপেক্ষে যে কোন বস্তু ঘড়ির কাঁটার দিকেও যেমন ঘুরতে পারে তেমনি বিপরীত দিকেও ঘুরতে পারে। কৌণিক ভরবেগের ভেক্টর অংকনের প্রচলিত নিয়মটি হল, ভেক্টরটির দিকে মুখ করে তাকালে যেন বস্তুকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত মুখে ঘুরতে দেখা যায়। আর একভাবেও এটা বলা যায়ঃ কর্ক-স্ক্রুর হাতলের গতির সঙ্গে স্ক্রুর গতির যে সম্পর্ক রয়েছে, এখানেও কৌণিক ভরবেগের অভিমুখের সঙ্গে বস্তুর গতির অভিমুখের সেই সম্পর্ক ধরা হয়।

দেখা যাচ্ছে, কৌণিক ভরবেগ ভেক্টরটি জানা থাকলে আমরা কৌণিক ভরবেগের মান, গতিতলের অবস্থান এবং 'কেন্দ্র' সাপেক্ষে বস্তুর আবর্তনের দিক বার করতে পারি।

যদি এক এবং অভিন্ন তলে গতি চলতে থাকে কিন্তু লিভারবাহু এবং দ্রুতি পাল্টায়, তাহলে কৌণিক ভরবেগ ভেক্টরটি তার অভিমুখ ঠিক রাখে কিন্তু দৈর্ঘ্যে পরিবর্তিত হয়। ইচ্ছামত গতির ক্ষেত্রে কৌণিক ভরবেগ ভেক্টরটি যুগপৎ অভিমুখ ও মান পাল্টায়। মনে হতে পারে, গতিতলের অভিমুখ এবং কৌণিক ভরবেগের মানের এই সংযুক্তি কেবলমাত্র অনর্থক কথাখরচ বাঁচানো। বাস্তবে, যখন আমরা একাধিক তলে বস্তুসমূহের গতি পর্যালোচনা করি, তখন ভরবেগের ভ্রামকগুলিকে কেবলমাত্র ভেক্টর হিসাবে ধরেই কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণসূত্রটি পেতে পারি। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, কৌণিক ভরবেগের ভেক্টররূপ থাকার সুবিধা কত বেশী।

কৌণিক ভরবেগ বললেই কোন শর্তসাপেক্ষে নির্বাচিত 'কেন্দ্র' সাপেক্ষে বলতে হয়। এতে স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় যে, এর মান নির্বাচিত বিন্দুটির অবস্থানের উপর নির্ভর করে। অন্যদিকে, এটাও প্রমাণ করা যায় যে, একটি বস্তুগোষ্ঠী সামগ্রিকভাবে স্থির থাকলে (গোষ্ঠীর মোট ভরবেগ শূন্য) তার কৌণিক ভরবেগ ভেক্টরটি 'কেন্দ্র' নির্বাচনের উপর নির্ভর করে না। এই কৌণিক ভরবেগকে বস্তু-সংহতির অভ্যন্তরীণ কৌণিক ভরবেগ বলে।

কৌণিক ভরবেগ ভেক্টরের সংরক্ষণসূত্রটি বলবিজ্ঞানের তৃতীয় এবং শেষ সংরক্ষণসূত্র। অবশ্য খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার না করেই আমরা তিনটি সংরক্ষণসূত্রের কথা বলছি। বাস্তবিকপক্ষে, ভরবেগ এবং কৌণিক ভরবেগ ভেক্টররাশি এবং কোন ভেক্টরের সংরক্ষণসূত্র বলতে শুধুমাত্র তার মানের কথা বোঝায় না, তার দিকের কথাও বোঝায়। অন্যভাবে বললে, তিনটি পরস্পর লম্বদিকে ভেক্টরের তিনটি স্থিরমানের উপাংশ রয়েছে। শক্তি একটি স্কেলার রাশি, ভরবেগ ভেক্টর এবং কৌণিক ভরবেগও ভেক্টর। সুতরাং খুঁটিয়ে দেখে এটা বলাই বোধ-হয় ঠিক হবে যে, বলবিজ্ঞানে মোট সাতটি সংরক্ষণসূত্র পাওয়া যাচ্ছে।

লাট্টু (Top)

একটা সরু কাঠির আগায় একটা প্লেটকে উল্টো করে ধরে রাখার চেষ্টা করুন। দেখবেন, কিছুতেই রাখা যাচ্ছে না। চীনা

বাজিকরদের এটি একটি অতি প্রিয় খেলা। অনেকগুলি কাঠি একসঙ্গে নিয়েও তারা এই কায়দাটি দেখাতে পারে। এমন কি, কাঠিটি খাড়াভাবে ধরে রাখার ব্যাপারেও তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। হেলানো কাঠির আগায় খুব আলতোভাবে এবং হেলাফেলা করে প্লেটটা লাগিয়ে রাখা সত্ত্বেও প্লেট পড়ে যায় না; যেন হাওয়ায় ভাসে। ব্যাপারটি ভোজবাজীর মত।

যদি কোন সময় বাজিকরের কার্যকলাপ খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয় তাহলে নীচের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি অবশ্যই লক্ষ্য করবেন: বাজিকর প্লেটগুলি এমনভাবে ঘোরায় যাতে প্লেটগুলি তাদের নিজ নিজ তলে খুব জোরে ঘুরতে পারে।

বাজির আংটা, টুপি সব ক্ষেত্রেই বাজিকর প্রথমে একটু ঘূর্ণনবেগ দিয়ে দেয়। এতে বস্তুগুলি ঠিক একই অবস্থায় এবং একই ভঙ্গীতে তার হাতে ফিরে আসে।

এই সুস্থিতির কারণ কি? কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণসূত্রের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, যখন ঘূর্ণাক্ষের অভিমুখের পরিবর্তন হয়, কৌণিক ভরবেগের ভেক্টরটিরও অভিমুখের পরিবর্তন ঘটে। বেগের অভিমুখের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য যেমন বলের দরকার হয়, তেমনি আবর্তনের দিক পাল্টাতে টর্কের দরকার পড়ে—বস্তু যত দ্রুত ঘুরতে চায় তত বেশী টর্ক লাগে।

দ্রুত ঘূর্ণায়মান বস্তুর ঘূর্ণাক্ষের অভিমুখ যে অপরিবর্তিত থাকে তা উপরের উদাহরণ ছাড়াও অন্য অনেক বস্তুতে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ঘূর্ণায়মান লাট্টুর অক্ষ হেলানো থাকলেও উল্টে যায় না।

হাত দিয়ে একটি ঘুরন্ত লাট্টুকে ফেলে দিতে চেষ্টা করে দেখুন। দেখবেন, ব্যাপারটি খুব সোজা হবে না।

ঘূর্ণায়মান বস্তুর স্থায়িত্বকে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হয়। বন্দুকের নল 'রাইফেল করা' অর্থাৎ শাঁখের মত পেঁচালো করা হয় বলে বোধহয় শুনে থাকবেন। বহির্গামী ক্ষেপণাস্ত্র এ কারণে নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরতে থাকে, এতে বাতাসে চলার সময়ে গতির মধ্যে কোন 'বিশৃঙ্খলা' দেখা যায় না। রাইফেল না করা বন্দুকের থেকে একারণে রাইফেল করা বন্দুকে লক্ষ্যভেদ আরও নির্ভুলভাবে করা যায়।

এরোপ্লেন বা জাহাজের চালকের পক্ষে যে কোন সময় নিজের অবস্থানে প্লেন বা জাহাজ সাপেক্ষে সত্যিকারের পার্থিব উল্লম্বরেখা জানার

বিশেষ দরকার পড়ে। ত্বরণযুক্ত গতির ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ঘটে বলে এসব ক্ষেত্রে ওলন-দড়ির সাহায্যে তা সঠিকভাবে বার করা যায় না। বিভিন্ন আকারের ঘূর্ণনশীল লাট্টু এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়—এদের 'জাইরোভার্টিক্যাল' বলে। এ জাতীয় লাট্টুর ঘূর্ণাক্ষকে পার্থিব উল্লম্বরেখা বরাবর স্থাপিত করলে ঘূর্ণাক্ষ সর্বদাই স্থির থাকে—প্লেন বা জাহাজের অবস্থা যাই ঘটুক না কেন।

কিন্তু এই লাট্টু কিসের উপর রেখে ঘোরাতে হবে? যদি কোন অবলম্বনের উপর রাখা হয় তাহলে তো অবলম্বনটিও প্লেনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে পারে। লাট্টুটি সেক্ষেত্রে কিভাবে তার ঘূর্ণাক্ষকে নির্দিষ্ট অভিমুখে স্থির রাখতে পারে?
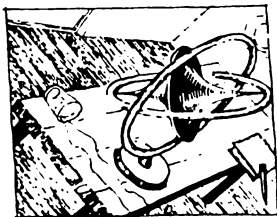
চিত্র 5.15

এই উদ্দেশ্যে কার্ডান (Cardan) দোলনা জাতীয় একপ্রকার যন্ত্র অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করা হয় (চিত্র 5.15)। এই যন্ত্রের পিভটে ঘর্ষণবল খুব সামান্য থাকে এবং লাট্টু বাতাসে ভেসে থাকার মতই অবিচল থাকতে পারে।

ঘুরন্ত লাট্টুর স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় যে কোন টর্পেডো বা এরোপ্লেনকে নির্দিষ্ট গতিপথে অবিচল রাখা হয়। লাট্টুর ঘূর্ণাক্ষ সাপেক্ষে টর্পেডোর অক্ষের অবস্থান 'লক্ষ্য করে' এ ধরনের ব্যবস্থা করা হয়।

ঘুরন্ত লাট্টুর নীতি কাজে লাগিয়ে 'জাইরোকম্পাস' নামে একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্র তৈরী হয়েছে। প্রমাণ করা যায় যে, করিওলী বল এবং ঘর্ষণের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও লাট্টুর অক্ষ পৃথিবীর অক্ষ বরাবর সর্বদা স্থাপিত থাকে, ফলে অক্ষটি সর্বদা পৃথিবীর উত্তর দিক নির্দেশ করে।

নৌচালনার কাজে জাইরোকম্পাস বহুল ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটির প্রধানতম অংশ একটি ভারী ফ্লাই হুইল লাগানো ইঞ্জিন, ফ্লাই হুইলটি মিনিটে 25,000 বার আবর্তন করে।

নানাধরনের বাধা, বিশেষ করে জাহাজের তলদেশ কোথাও আটকে গেলে, কাটিয়ে ওঠার অনেক ঝামেলা থাকা সত্ত্বেও চৌম্বক কম্পাসের তুলনায় জাইরোকম্পাস অনেক বেশী সুবিধাজনক। জাহাজে লৌহ জাতীয় পদার্থ এবং বিভিন্ন তড়িৎযন্ত্র থাকায় চৌম্বক কম্পাসের পাঠে অনেক গরমিল ঘটে থাকে।

নমনীয় দণ্ড (Flexible shaft)

আধুনিক স্টীম টারবাইনে অক্ষদণ্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ। 10 মি. লম্বা এবং 0·5 মি. ব্যাসের যথাযথ অক্ষদণ্ড নির্মাণ জটিল প্রযুক্তিসমস্যাও বটে। উচ্চশক্তির টারবাইনের একটি অক্ষদণ্ড 3000 rpm বেগে ঘোরে এবং প্রায় 200t ভার সহ্য করতে হয়।

প্রথমে মনে হতে পারে, এই ধরনের দণ্ড বেশ মজবুত ও সুদৃঢ় হওয়া দরকার। ব্যাপারটি কিন্তু আদৌ তা নয়। যে কোন দণ্ড তা যতই শক্ত হোক না কেন, সেটি যদি শক্ত করে আটকানো হয় এবং সেই সঙ্গে দণ্ডটি অনমনীয় হয় তবে মিনিটে কয়েক হাজার আবর্তনে নির্ঘাৎ ভেঙ্গে যাবে।

দৃঢ় দণ্ড কেন অনুপযুক্ত তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। যত নিখুঁতভাবেই ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করুন না কেন, টারবাইনের চাকায় সামান্য হলেও কিছু প্রতিসাম্যের অভাব থাকবেই। চাকা যখন ঘোরে, তখন প্রচণ্ড অপকেন্দ্র বলের উদ্ভব হয়। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, এই অপকেন্দ্র বলের মান ঘূর্ণনবেগের বর্গের সমানুপাতিক হয়। ঠিক ঠিক প্রতিসাম্য না থাকলে অক্ষদণ্ড বলবেয়ারিংকে 'ধাক্কা' দিতে থাকে (কারণ অপ্রশমিত অপকেন্দ্র বল যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে 'ঘুরতে থাকে'), এতে বলবেয়ারিং ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায় এবং মেশিনটিও ভেঙে পড়ে।

এক সময়ে ঘূর্ণনবেগ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত ঘটনা অপ্রতিরোধ্য বাধার সৃষ্টি করত। এই শতাব্দীর শেষভাগে এর প্রতিকারের উপায় খুঁজে পাওয়া গেল। টারবাইন প্রযুক্তিতে নমনীয় অক্ষদণ্ডের প্রবর্তন হল।

এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনের পশ্চাদ্‌পট বুঝতে হলে উদ্ভূত অপকেন্দ্র বলের সামগ্রিক ফলাফল হিসাব করতে হবে। কিন্তু কিভাবে এই বলের যোগ করা যেতে পারে? দেখা যায়, উদ্ভূত অপকেন্দ্র বলের লব্ধি অক্ষদণ্ডের ভারকেন্দ্রে ক্রিয়া করে এবং টারবাইনের চাকার মোট

ভার এই ভারকেন্দ্রে ক্রিয়া করলে যে মান পাওয়া যায় এই লব্ধির মান তার সঙ্গে সমান।

মনে করা যাক, চাকায় প্রতিসাম্যের ঘাটতি থাকায় টারবাইনের অক্ষদণ্ড থেকে চাকার ভারকেন্দ্রের দূরত্ব যেন a এবং স্পষ্টতই a-র মান শূন্য থেকে বেশী। চাকার ঘূর্ণনের সময় দণ্ডের উপর অপকেন্দ্র বল ক্রিয়া করে এবং তাতে দণ্ডটি নুয়ে পড়ে। দণ্ডের এই সরণকে l দ্বারা সূচিত করা যাক। এখন l-এর মান হিসাব করা যাক। আমরা ইতিপূর্বেই অপকেন্দ্র বলের পরিমাণসূচক রাশিমালাটি জেনেছি। এই বল অক্ষ থেকে ভারকেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বের সমানুপাতিক। দূরত্বটি আমাদের ক্ষেত্রে $a+l$; সুতরাং অপকেন্দ্র বলের মান $4\pi^2n^2M(a+l)$, এখানে n প্রতি মিনিটে আবর্তন সংখ্যা এবং ঘূর্ণায়মান অংশসমূহের ভর M। এই অপকেন্দ্র বল স্থিতিস্থাপক বল কর্তৃক প্রশমিত হয় এবং এই স্থিতিস্থাপক বল দণ্ডের সরণের সমানুপাতিক। সুতরাং, এই বল kl দ্বারা প্রকাশ করা যায়, এখানে k দণ্ডের উপাদানের দৃঢ়তা-গুণাঙ্ক।

তাহলে, $kl = 4\pi^2n^2M(a+l)$

সেখান থেকে,

$$l = \frac{a}{k/4\pi^2n^2M - 1}$$

সূত্রটি বিচার করলে বলা যায়, অতি দ্রুত আবর্তনের জন্য নমনীয় দণ্ড ব্যবহার করলে কোন সমস্যা থাকে না। n-এর মান বড় (এমন কি, অসম্ভব বড়) হলেও দণ্ডের সরণ l-এর মান সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পায় না। n যত বড় হতে থাকে, $k/4\pi^2n^2M$-এর মান ততই ছোট হতে হতে শূন্যের দিকে এগিয়ে চলে। ফলে দণ্ডের সরণ l-এর মান প্রতিসাম্যহীনতার সমান কিন্তু বিপরীত চিহ্নযুক্ত হয়।

উপরের হিসাবপত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে, খুব দ্রুত আবর্তনের ক্ষেত্রে প্রতিসাম্যহীন চাকা দণ্ডকে ভেঙে দেওয়ার পরিবর্তে এমনভাবে বাঁকিয়ে দেয় যাতে প্রতিসাম্যহীনতার ত্রুটি সংশোধিত হয়ে যায়। দণ্ডের নমনের ফলে দণ্ডের যে বিকৃতি ঘটে তাতে ভারকেন্দ্র ঘূর্ণাক্ষে সরে আসে এবং তার ফলে অপকেন্দ্র বলের ক্রিয়া প্রশমিত হয়ে যায়।

তাহলে, দণ্ডের নমনীয়তা তার কোন ত্রুটি নয়। বরং সুস্থিত স্থায়িত্বের প্রয়োজনীয় শর্ত। বস্তুত, স্থায়িত্বের জন্য দণ্ডটির নমনের পরিমাণ a-এর কাছাকাছি হওয়া উচিত।

আগ্রহী পাঠক হয়তো আমাদের উত্থাপিত যুক্তির মধ্যে একটি ত্রুটি লক্ষ্য করবেন। দ্রুত আবর্তনের সময় দণ্ডটির যে সাম্য-অবস্থান আমরা খুঁজে পেয়েছি তা থেকে যদি সরিয়ে দিই তবে কেবলমাত্র অপকেন্দ্র ও স্থিতিস্থাপক বলের হিসাব করে দেখব যে, সাম্য অবস্থাটা ছিল ক্ষণিক বা অস্থির। আমাদের ক্ষেত্রে করিওলী বলের প্রভাবে এমনটি ঘটে না এবং এই বল অস্থির সাম্যকে সুস্থিত সাম্যে রূপান্তরিত করে।

শুরুতে টারবাইন ধীরে ধীরে ঘোরে। তখন n-এর মান বেশ কম। ফলে $k/4\pi^2n^2M$-এর মান বেশী হয়। n বাড়তে থাকা সত্ত্বেও যতক্ষণ এই রাশিটির মান একের বেশী থাকে ততক্ষণ দণ্ডের সরণের মুখও চাকার ভারকেন্দ্রের সরণের মুখ একই দিকে থাকে। সুতরাং গতির শুরুতে দণ্ডের নমনের জন্য চাকা কেন্দ্রের দিকে সরে আসে না, অধিকন্তু দণ্ডের বিকৃতির জন্য ভারকেন্দ্রের মোট সরণ বৃদ্ধি পায় ও সঙ্গে সঙ্গে অপকেন্দ্র শক্তি বৃদ্ধি পায়। $k/4\pi^2n^2M > 1$ অবস্থাটি চলতে থাকলে একসময় সংকট মুহূর্ত আসে। যখন $k/4\pi^2nM = 1$ হয়, আমাদের সূত্রের হরটি শূন্য হয়ে যায় এবং অংকের হিসাবে দণ্ডের সরণ l-এর মান অসীম হয়ে পড়ে। এইরূপ বেগের জন্য দণ্ডটি ভেঙে পড়তে চায়। এ কারণে, টারবাইন চালু করার সময়ে এই মুহূর্তটি দ্রুত পেরিয়ে যেতে দেওয়া উচিত। এজন্য আবর্তন হারের সংকট মানটিকে চট করে পেরিয়ে গিয়ে উচ্চতর হারে পৌঁছাতে হয় তখন পূর্বোক্ত নিরাপদ আত্মকেন্দ্রীকরণের বিষয়টি এসে যায়।

সংকট মুহূর্তটি ঠিক কখন আসে? আমাদের সমীকরণটি একটু সাজিয়ে এভাবে লেখা যায়,

$$4\pi^2\frac{M}{k} = \frac{1}{n^2}.$$

n-এর বদলে $\frac{1}{T}$ বসিয়ে (T = পর্যায়কাল) এবং বর্গমূল বার করলে $T = 2\pi\sqrt{M/k}$।

সমীকরণের ডানদিকের রাশিটির প্রকৃতি কি? সূত্রটির চেহারা আমাদের পরিচিত। আগেই দেখা গেছে। চাকার মুক্ত দোলনের পর্যায়কাল আমাদের সূত্রটির ডানদিকের রাশিটির সমান। M-ভরের চাকাটি দণ্ড থেকে সামান্য বিক্ষিপ্ত করে ছেড়ে দিলে চাকাটি যে মুক্ত

দোলন করবে তার পর্যায়কাল হবে $2\pi\sqrt{M/k}$, এখানে k, দণ্ডের দৃঢ়তা-গুণাঙ্ক।

তাহলে, যখন চাকা ও দণ্ডের সমন্বয়ের মুক্ত দোলনের সময়কাল চাকার আবর্তনকালের সমান হয়ে পড়ে, তখনই সংকট মুহূর্তটি আসে। প্রতি মিনিটে আবর্তন সংখ্যার এই সংকট মানের জন্য বস্তুত অনুনাদই দায়ী।

6. মহাকর্ষ

কি পৃথিবীকে ধরে রেখেছে? (What holds the earth up)

এ প্রশ্নের জবাবে সুদূর অতীত দিনের লোকের সরল উত্তর ছিল ঃ তিনটি তিমি। বেশ, তাই না হয় হল। তিমি তিনটি কোথায় রয়েছে তা তো পরিষ্কার হল না। অবশ্য, এ ধরনের প্রতি প্রশ্নে আমাদের সাদাসিধে পূর্বপুরুষদের মোটেই বিব্রত হতে দেখা যায় নি।

গ্রহের গতির কারণ জানার অনেক আগেই পৃথিবীর গতি, তার আকার এবং সূর্যের চারদিকে গ্রহদের আবর্তনের নিয়মকানুন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা প্রচলিত ছিল।

বাস্তবিক, এ প্রশ্ন আসতে পারে—পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলিকে কে 'ধরে রেখেছে'? কেনই বা তারা নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যের চার--পাশে আবর্তন করছে? পরিবর্তে কেন তারা ছিট্‌কে বেরিয়ে যাচ্ছে না?

অনেক কাল পর্যন্ত এ প্রশ্নের উত্তর জানা ছিল না। জগৎ সম্বন্ধে কোপার্নিকাসের ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে তৎকালীন চার্চ পৃথিবীর গতি অস্বীকার করার জন্য এই অজ্ঞতার অজুহাতই দেখাত।

সঠিক উত্তর আবিষ্কারের জন্য আমরা প্রখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনের কাছে অশেষ ঋণী।

কথিত আছে, নিউটন যখন বাগানে বসে দম্‌কা হাওয়ায় গাছ থেকে একটার পর একটা আপেল মাটিতে কেন পড়ছে তা (পরপর মাটিতে আপেল পড়ার বিষয়টি) নিয়ে গভীর চিন্তামগ্ন ছিলেন, সেই সময় মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণের সূত্রটি হঠাৎই তাঁর মাথায় আসে।

নিউটনের আবিষ্কারের ফলে জানা গেল, যে সমস্ত ঘটনা আপাত-দৃষ্টিতে বিবিধধর্মী বলে মনে হয়—যেমন, ভূপৃষ্ঠে অবাধ পতন, চন্দ্র-সূর্যের আপাতগতি, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি আসলে প্রকৃতির এক এবং অভিন্ন নিয়মেরই প্রকাশ মাত্র—নিয়মটি মহাকর্ষ।

এই নিয়ম বলে যে, ক্ষুদ্র বালুকণা, মটর দানা, পাথরের টুকরো থেকে শুরু করে বিপুল আয়তনের গ্রহ পর্যন্ত যাবতীয় বস্তুরাজির মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বল কাজ করছে।

11-01010

অনুভূতির প্রথম ধাক্কায় মনে হবে, সূত্রটি ঠিক নয়, কই, আমরা তো আমাদের চারপাশের যাবতীয় বস্তুকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হতে দেখি না। পৃথিবী তার সমুদায় বস্তুকে নিজের দিকে টানে, এ বিষয়ে কারও মনে সন্দেহ নেই। কিন্তু হতে পারে এটা পৃথিবীর বিশেষ কোন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। না, তা নয়। যে কোন দুটি বস্তুকণার মধ্যে আকর্ষণ খুবই নগণ্য পরিমাণ এবং এই কারণেই তা আমাদের গোচরে আসে না। কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই আকর্ষণ প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে।

অন্য কোনভাবে নয়। একমাত্র মহাকর্ষের অস্তিত্বের সাহায্যেই সৌরজগতের স্থায়িত্ব, গ্রহ এবং নভোমণ্ডলীয় বস্তুসমূহের গতি ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

পার্থিব আকর্ষণ বলে চন্দ্র তার কক্ষপথে আর সৌর আকর্ষণে পৃথিবী তার কক্ষপথে ধরা রয়েছে।

ঢিল-বাঁধা পাথরের টুকরো যেমন বৃত্তপথে ধরা থাকে, ঠিক তেমনি নভোমণ্ডলীয় বস্তুসমূহ বৃত্তপথে গতি নির্বাহ করে চলে। মহাকর্ষ বল যেন এক অদৃশ্য 'দড়ি'-র টানেই মহাজাগতিক বস্তুসমূহ নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে।

বিশ্বজনীন মহাকর্ষ বলের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করাটাই শেষ নয়; নিউটন মহাকর্ষ বলের নীতি আবিষ্কার করেন এবং কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর এই বল নির্ভর করে তা নির্দেশ করেন।

বিশ্বজনীন মহাকর্ষসূত্র (Law of universal gravitation)

নিজের কাছে নিউটনের যে প্রশ্নটি ছিল তা হল: আপেলের ত্বরণের তুলনায় চন্দ্রের ত্বরণের পার্থক্য কেন হয়? অন্যভাবে বললে, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে r দূরত্বে তার পৃষ্ঠে পৃথিবীর সৃষ্ট ত্বরণ g এবং পৃথিবী থেকে R দূরত্বে যে চন্দ্র রয়েছে সেখানে পৃথিবীরই সৃষ্ট ত্বরণের মধ্যে পার্থক্যটা কি?

এই ত্বরণ v^2/R; এর মানটি হিসাব করার জন্য চন্দ্রের প্রদক্ষিণ বেগ এবং পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব জানা দরকার। এই দুটি সংখ্যাই নিউটনের জানা ছিল। তাতে চন্দ্রের ত্বরণ 0·27 সে.মি./সেকেণ্ড^2-এর মত দেখা গেল। এই মান g-এর 980 সে.মি./সেকেণ্ড^2 মানের 3600 ভাগের প্রায় একভাগ মাত্র।

দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যত দূরে যাওয়া যায়, ততই পৃথিবীর সৃষ্ট ত্বরণের মান কমে যায়। কিন্তু কি পরিমাণে? পৃথিবী ও চন্দ্রের পারস্পরিক দূরত্ব পার্থিব ব্যাসার্ধের প্রায় ষাটগুণ। আবার, 3600 হচ্ছে 60-এর বর্গ। 60-এর গুণিতকে দূরত্ব বাড়তে থাকলে, ত্বরণ 60^2 অনুপাতে কমতে থাকে।

নিউটন সিদ্ধান্ত করলেন, ত্বরণ এবং তার ফলে মহাকর্ষ বল দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত-আনুপাতিক। আরও, আমরা জেনেছি যে, মহাকর্ষক্ষেত্রে বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বল ভরের সমানুপাতিক। সুতরাং প্রথম বস্তু দ্বিতীয় বস্তুকে দ্বিতীয় বস্তুর ভরের সমানুপাতিক বলে আকর্ষণ করবে এবং দ্বিতীয় বস্তুও প্রথম বস্তুকে প্রথম বস্তুর ভরের সমানুপাতিক বলে আকর্ষণ করবে।

আমরা দুটি একান্তভাবে সমান বলের সম্মুখীন হয়েছি—এদের বলি 'প্রক্রিয়া' ও 'প্রতিক্রিয়া'। ফলত, পারস্পরিক মহাকর্ষ বলটি প্রথম বস্তুর ভর এবং সেই সঙ্গে দ্বিতীয় বস্তুর ভরেরও সমানুপাতিক হবে, অর্থাৎ অন্য কথায়, এই বল ভর দুটির গুণফলের সমানুপাতিক। তাহলে,

$$F = G\frac{Mm}{r^2}$$

এটিই **বিশ্বজনীন মহাকর্ষসূত্র** নামে পরিচিত। নিউটন অভিমত দিলেন, যে কোন দুটি বস্তুর মধ্যে সূত্রটি কার্যকরী হবে।

এই যুগান্তকারী অভিমতটি বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং, দুটি বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বল তাদের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

সূত্রের মধ্যে যে G-টি রাখা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা কি? এটি ভেদের ধ্রুবক। আগে অনেক ক্ষেত্রে যেমন করেছি, এখানেও কি এটাকে একক মানে পরিবর্তিত করা যাবে? না, আমরা এখানে তা বোধহয় পারি না: আমরা এর পূর্বে ভর গ্রামে, দূরত্ব সেণ্টিমিটারে এবং বল ডাইনে মাপব বলে ঠিক করেছি। 1 গ্রামের দুটি বস্তু 1 সে. মি. দূরত্বে থাকলে পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ বল প্রয়োগ করে তাই হবে G-এর সমান। এই বলটির মান আমরা আগে থেকেই নির্দিষ্ট করে দিতে পারি না (বিশেষ করে 1 ডাইন)। G গুণাঙ্কটির মাণ অবশ্যই মেপে জানতে হবে।

বলা বাহুল্য, G বার করতে গিয়ে দু-চার গ্রাম ভরের বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল পরিমাপ করলে হবে না। এর জন্য বৃহদাকৃতি বস্তু দরকার—তবেই আকর্ষণ বলের পরিমাপ সম্ভব হবে।

দুটি বস্তুর ভর বার করলে, তাদের দূরত্ব জানা থাকলে এবং পারস্পরিক আকর্ষণ বল মাপতে পারলে সহজ গণনার দ্বারা G-এর মান হিসাব করা যায়।

অনেকবার এ জাতীয় পরিমাপের পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই G-এর এক এবং অভিন্ন মান পাওয়া গেছে—এই মান বস্তু-সমূহের উপাদান এবং তাদের মাধ্যম-নিরপেক্ষ বলে দেখা গেছে। G-কে **মহাকর্ষীয় ধ্রুবক** বলা হয়। এর মান $6{\cdot}67 \times 10^{-8}$ সে.মি.^{3}/গ্রাম-সেকেণ্ড^{2}।
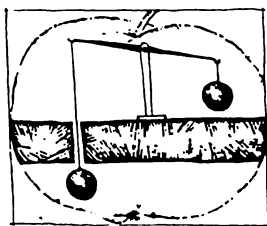
চিত্র 6.1

6.1 চিত্রে পরীক্ষামূলকভাবে G বার করার একটি পদ্ধতি দেখান হয়েছে। তুলাদণ্ডের দুপ্রান্ত থেকে একই ভরের দুটি গোলক ঝোলানো আছে। একটি গোলক একটি সীসার পাতের নীচে এবং অন্যটি ঐ পাতের উপরে রয়েছে। সীসার (পরীক্ষাকার্যে 100 টন মত সীসা নেওয়া হয়) আকর্ষণের ফলে ডানদিকের গোলকটির ওজন বেড়ে গেছে, অন্যদিকে বামপাশের গোলকটির ওজন কমে গেছে। ফলে প্রথম গোলকটি দ্বিতীয় গোলকের চেয়ে ওজনে ভারী হয়ে গেছে। তুলাদণ্ডের বিক্ষেপের মাপ থেকে G-এর মান গণনা করা হয়। G-এর অতি ক্ষুদ্র মানের জন্যই যে কোন দুটি বস্তুর ক্ষেত্রে মহাকর্ষীয় বল নিরূপণের অসুবিধা ঘটে।

1000 কিলোগ্রামের দুটি ভারী বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বলের পরিমাণ মাত্র $6{\cdot}7$ ডাইন বা $0{\cdot}007\ gf$, যদি পারস্পরিক দূরত্ব 1 মিটার ধরা হয়।

অন্যদিকে দুটি নভোমণ্ডলীয় বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ-বল কত বেশী হতে পারে? যেমন, চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যে এই বল

$$F = 6{\cdot}7 \times 10^{-8} \frac{6 \times 10^{27} \times 0{\cdot}74 \times 10^{26}}{(38 \times 10^{9})^{2}}$$

$$= 2 \times 10^{25} \text{ ডাইন} \approx 2 \times 10^{19}\ kgf.$$

আবার, পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে

$$F = 6{\cdot}7 \times 10^{-8} \frac{2 \times 10^{3} \quad \times 10^{27}}{(15 \times 10^{12})^{2}}$$

$$= 3{\cdot}6 \times 10^{27} \text{ ডাইন} \approx 3{\cdot}6 \times 10^{21}\ kgf.$$

পৃথিবীকে ওজন কর (Weighing the earth)

বিশ্বজনীন মহাকর্ষসূত্রটির প্রয়োগ আলোচনা করার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা যাক।

একটু আগে পরস্পর 1 মিটার দূরত্বে অবস্থিত দুটি বস্তুর ক্ষেত্রে আকর্ষণ বল হিসাব করা হয়েছে। এখন, দূরত্বটি যদি মাত্র 1 সে. মি. হত ? তাহলে আমাদের সূত্রে দূরত্বের জায়গায় কোন সংখ্যা বসাতাম— বস্তু দুটির গাত্রদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব, না তাদের ভারকেন্দ্র দুটির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব, না অন্য কোনও সংখ্যা ?

এই ধরনের কোন সংশয় না উপস্থিত হলে মহাকর্ষসূত্রের $F = Gm_1m_2/r^2$ সম্পর্কটি নির্বিঘ্নে ব্যবহার করা যেত। বস্তুগুলির আকারের তুলনায় তাদের পারস্পরিক দূরত্ব যথেষ্ট বেশী হওয়া দরকার —সেক্ষেত্রে বিস্তৃত বস্তুকে বিন্দুবস্তু বলে মনে করা অযৌক্তিক হয় না। কিন্তু খুব কাছাকাছি দুটি বস্তুর ক্ষেত্রে এই সূত্রটি কিভাবে প্রয়োগ করা যাবে ? প্রয়োগ করা যাবে একটি সহজ নীতিতে।

নীতিটি এই রকম : আমরা বস্তু দুটিকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভেঙে নিয়েছি বলে ভাবলাম, তারপরে জোড়ায় জোড়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি নিয়ে তাদের অসংখ্য আকর্ষণ বলগুলি বার করলাম। এবার বল-গুলিকে যোগ (ভেক্টর পদ্ধতিতে) দিলাম।

নীতির দিক থেকে খুবই সহজ, কিন্তু বাস্তবে এটা করা বেশ কঠিন।

যাই হোক, প্রকৃতি আমাদের সাহায্য করেছে। গণনা করে দেখা গেছে, যদি বস্তুকণাগুলির পারস্পরিক আকর্ষণ বল $1/r^2$-এর সমানুপাতিক হয় তাহলে গোলকাকৃতি বস্তুসমূহকে গোলকের কেন্দ্রে বিন্দুবৎ ধরে নিলে একই ফল পাওয়া যায়। দুটি গোলকের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব r স্থির থাকলে গোলক দুটির অবস্থান কাছাকাছি থাকুক বা দূরেই থাকুক, $F = G\frac{m_1m_2}{r^2}$ সব সময়ই খাটবে। ভূপৃষ্ঠে ত্বরণ হিসাব করার সময় আমরা ঠিক এই নিয়মটিই প্রয়োগ করি।

পৃথিবী বস্তুসমূহকে যে বলে আকর্ষণ করে তার হিসাব বার করার জন্য এবার মহাকর্ষসূত্রকে কাজে লাগানোতে আর কোনও বাধা রইল না। r এখানে নির্দেশ করবে কোনও বস্তুর দূরত্ব — পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে।

ধরা যাক, পৃথিবীর ভর M এবং ব্যাসার্ধ R, তাহলে পৃথিবী পৃষ্ঠে m ভরের বস্তুর উপর আকর্ষণ বল,

$$F = G\frac{Mm}{R^2}$$

বস্তুত, এই বলটিই হচ্ছে বস্তুর ওজন এবং একে আমরা mg বলেই জানি। সুতরাং অবাধ পতনের ত্বরণ,

$$g = G\frac{M}{R^2}$$

এইবার, পৃথিবীকে অবশেষে কি করে ওজন করা হয়েছিল সে বিষয়ে আমরা ধারণা করতে পারি। কারণ, g, G এবং R-এর মান জানা আছে ; সুতরাং, সূত্রটি থেকে পৃথিবীর ওজন হিসাব করা যাবে। একই ভাবে সূর্যকেও ওজন করা যাবে।

এই পদ্ধতিকে কি সত্যিসত্যিই ওজন করা বলা যায় ? নিশ্চয়ই, তা আমরা বলতে পারি। পদার্থবিজ্ঞানে পরোক্ষ পরিমাপের ভূমিকা অনেক সময় প্রত্যক্ষ পরিমাপের সমার্থক।

এখন একটা মজার প্রশ্নের সমাধান করা যাক।

দুনিয়া জুড়ে টেলিভিশন পরিকল্পনার একটি '24-ঘণ্টার উপগ্রহ' সৃষ্টির সম্ভাবনাকে ভিত্তি করে রচিত হচ্ছে। এই উপগ্রহটি সব সময় ভূপৃষ্ঠের একটি স্থির বিন্দুর উপর অবস্থান করবে। উপগ্রহটি কি প্রচণ্ড ঘর্ষণ বলের সম্মুখীন হবে ? পৃথিবী থেকে কত উচ্চতায় এটি আবর্তন করবে তার উপর এই ঘর্ষণ বল নির্ভর করবে।

24-ঘণ্টার উপগ্রহটির আবর্তনের পর্যায়কাল T-এর মান 24-ঘণ্টা। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উপগ্রহটির দূরত্ব r হলে এর বেগ $v = 2\pi r/T$ এবং ত্বরণ $v^2/r = 4\pi^2 r/T^2$ হবে। অন্যদিকে, এই ত্বরণের উৎস হচ্ছে পৃথিবীর আকর্ষণ বল ; সুতরাং $GM/r^2 = gR^2/r^2$। ত্বরণের এই দুই মানের সমতার জন্য আমরা লিখতে পারি।

$$g\frac{R^2}{r^2} = \frac{4\pi^2 r}{T^2} \quad \text{বা,} \quad r^3 = \frac{gR^2T^2}{4\pi^2}$$

বিভিন্ন রাশির আসন্ন পূর্ণমান ধরলে,

$g = 10$ মি/সেকেণ্ড^2, $R = 6 \times 10^6$ মিটার, এবং
$T = 9 \times 10^4$ সেকেণ্ড হয়। সুতরাং
$r^3 = 7 \times 10^{22}$ মি^{3}, অর্থাৎ, $r \approx 4 \times 10^7$ মি
$= 40{,}000$ কিলোমিটার।

এই রকম উচ্চতায় বায়ুর ঘর্ষণ বল নেই এবং আমাদের 24 ঘণ্টার উপগ্রহটির 'গতিহীন কক্ষ পরিক্রমা' মন্দীভূত হবে না।

সমীক্ষাকার্যে g-এর পরিমাপ (Measuring g in the service of prospecting)

সমীক্ষা বলতে এখানে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কথা বোঝানো হচ্ছে। গর্ত না খুঁড়ে বা কোন দণ্ড ভূ-অভ্যন্তরে প্রোথিত না করেও g-এর পরিমাপের সাহায্যে মূল্যবান খনিজ পদার্থের অস্তিত্ব নিরূপণ করা সম্ভব।
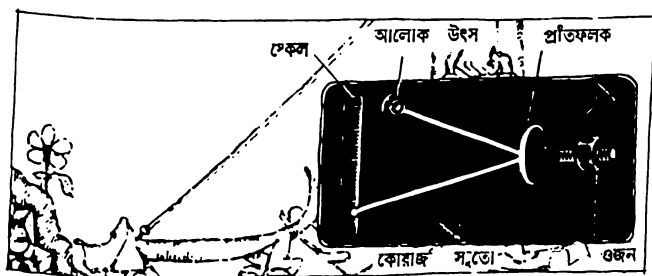
চিত্র 6.2

অবাধ পতনের ত্বরণ খুব নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করার অনেকগুলি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। স্প্রিং তুলাদণ্ডে কোনও নির্দিষ্ট মানের বস্তুর ওজন দেখে সহজেই g-এর মান পাওয়া যায়। ভূতাত্ত্বিক তুলাদণ্ড খুব সুবেদী হওয়া প্রয়োজন—এক গ্রামের দশলক্ষ ভাগের একভাগ পরিমাণ ওজন পরিবর্তনের জন্যও যেন স্প্রিংটির টানের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। কোয়ার্জ নির্মিত ব্যবর্ততুলা এ ব্যাপারে খুব উৎকৃষ্ট ফল দেয়। এ ধরনের তুলার গঠন প্রণালী খুব জটিল নয়। আনুভূমিকভাবে প্রসারিত কোয়ার্জ সুতার সঙ্গে একটি লিভার যুক্ত করা হয় এবং এই লিভারের চাপে সুতাটিতে সামান্য প্যাঁচ পড়ে (চিত্র 6.2)।

একই উদ্দেশ্যে একটি সরল দোলকও ব্যবহার করা হয়। খুব বেশী আগের কথা নয় যখন দোলকের সাহায্যে g নিরূপণই একমাত্র পদ্ধতি ছিল। মাত্র $10-20$ বছর আগে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও সহজ ও নিখুঁত তুলাপদ্ধতি। যাই হোক, $T=2\pi\sqrt{l/g}$ সূত্রে দোলন-কাল T-এর মান দোলকের সাহায্যে বার করে নিলেই g-এর মোটামুটি নির্ভুল মান পাওয়া যেতে পারে।

একই যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন জায়গায় g-এর মান বার করে যে কেউ বিভিন্ন স্থানে g-এর মানের লক্ষভাগের একভাগ পার্থক্যও পরিমাপ করতে পারে।

ভূপৃষ্ঠে কোন জায়গায় g-এর মান নির্ণয়কারী এরকম সিদ্ধান্তে আসতে পারেন: এখানে মানটি ঠিক পাওয়া গেল না, মানটি স্বাভাবিক মানের থেকে অনেক কম বা স্বাভাবিক মানের চেয়ে বেশী।

তাহলে g-এর স্বাভাবিক মানটি কত?

দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেছে এবং ভূপৃষ্ঠে অবাধ পতনের ত্বরণ নিয়ে গবেষণাকারীদেরও জানা আছে যে দুটি স্বাভাবিক কারণে g-এর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

এদের প্রথমটি হল, মেরুবিন্দু থেকে নিরক্ষরেখার দিকে গেলে g কমতে থাকে। বিষয়টি একটু আগেই বলা হয়েছে। এই পরিবর্তন দুটি কারণের জন্য হয়ে থাকে। প্রথমত, পৃথিবী পুরোপুরি গোলকাকৃতি নয় এবং সে কারণে মেরুবিন্দুতে অবস্থিত বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে নিকটতর হয়। দ্বিতীয়ত, বস্তু যত মেরুপ্রদেশ থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তত অপকেন্দ্র বল উল্লেখযোগ্যভাবে অভিকর্ষ বলের বিপরীতে কাজ করতে থাকে।

দ্বিতীয় ধরনের পরিবর্তন হল উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে g-এর মান কম। $g=GM/(R+h)^2$ সূত্র থেকেই বোঝা যায়। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুর দূরত্ব যত বাড়তে থাকবে, g-এর মানও তত কমতে থাকবে! সূত্রের R, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এবং h সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চতা নির্দেশ করছে।

সুতরাং, এক ও অভিন্ন অক্ষাংশে এবং সমুদ্র সমতল থেকে একই উচ্চতায় অবাধ পতনের ত্বরণ অভিন্ন হবে।

নিখুঁত পরিমাপ পদ্ধতির সাহায্যে দেখা যায়, এই নিয়মের ব্যতিক্রম অনেক ক্ষেত্রেই ঘটছে। ভূপৃষ্ঠের যে স্থানে এই ধরনের পরিমাপ করা হয় সেখানে ভূত্বকের উপাদানের বিন্যাসের সামঞ্জস্য না থাকলে এ জাতীয় গোলমাল সম্ভব।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে, বিস্তৃত বস্তুর ক্ষেত্রে মহাকর্ষ বল বস্তুর প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার বলগুলির সমষ্টি হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে। পৃথিবীর প্রতি দোলক যে আকর্ষণ অনুভব করে তা পৃথিবীর অসংখ্য কণার ক্রিয়ার সমষ্টি বলে ধরা যেতে পারে; কিন্তু এটা ঠিক যে, দোলকের নিকটস্থ ভূপৃষ্ঠের কণাগুলিই সর্বাধিক আকর্ষণ বল প্রয়োগ করতে পারে, কারণ এই বল দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত-আনুপাতিক।

পরিমাপ-স্থলে ভারী ভারী বস্তুর সমন্বয় ঘটলে g-এর মান স্বভাবতই ঈপ্সিত মানের বেশী এবং বিপরীতপক্ষে কম হবে।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি কোন পাহাড়ের মাথায় গিয়ে g-এর মান নির্ণয় করি এবং প্লেনে করে সমুদ্রের উপরে একই উচ্চতায় গিয়ে g-এর মান নির্ণয় করি, তাহলে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে g-এর বেশী মান পাওয়া যাবে। যেমন, ইতালীর ইট্‌না পাহাড়ের উপরে g-এর মান ঈপ্সিত স্বাভাবিক মান থেকে 0·292 সেমি/সেকেণ্ড² বেশী পাওয়া যায়। বিচ্ছিন্ন কোন সামুদ্রিক দ্বীপেও একইভাবে g-এর কিছু বেশী মান পাওয়া যায়। দুটি ক্ষেত্রেই পরিমাপের জায়গায় অতিরিক্ত ভরের অবস্থিতির জন্য এটা সম্ভব হয়।

কেবলমাত্র g-এর মান নয়, অভিকর্ষ বলের অভিমুখের বিচ্যুতিও কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়। কোন সূতা থেকে ভারী বস্তু ঝুলিয়ে দিলে সূতাটি সেই স্থানে উল্লম্বরেখা বরাবর অবস্থান করে। এই প্রাপ্ত উল্লম্বরেখাটি সঠিক উল্লম্বরেখা থেকে বিচ্যুত হতে পারে। সঠিক উল্লম্ব-রেখাটি নক্ষত্রের সাহায্যে নির্ধারণ করা সম্ভব, কারণ, পৃথিবীপৃষ্ঠে যে কোনও বিন্দুতে বৎসরের যে কোনও দিনে সঠিক উল্লম্বরেখা আকাশেতে কোন্ স্থানে স্পর্শ করবে তা নিরূপণ করা আছে।

ধরা যাক, কোন এক পর্বতের সানুদেশে ওলন-দড়ি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। ওলন-দড়ির প্রান্তস্থ ভরটিকে পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে, একই সঙ্গে পর্বতও ভরটিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। এই অবস্থায় ওলন-দড়িটি স্বাভাবিক উল্লম্বরেখা থেকে বিচ্যুত হবে (চিত্র 6.3)। পর্বতের ভরের তুলনায় পৃথিবীর ভর অনেক বেশী বলে এক্ষেত্রে বিক্ষেপকোণ কয়েক সেকেণ্ডের বেশী হবে না।

ওলন-দড়ির এই বিক্ষেপ থেকে অনেক সময় অদ্ভুত ফলাফল জানা যায়। উদাহরণ, ফ্লোরেন্সের অ্যাপিনিজ পর্বতশ্রেণী ওলন-দড়িকে আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণ করে। ব্যাখ্যা একটাই ; ঐ পর্বতের অভ্যন্তরে রয়েছে প্রচুর ফাঁকা জায়গা।

মহাদেশে ও সমুদ্রের বুকে অবাধ পতনের ত্বরণ মেপে অনেক বিচিত্র ফলাফল জানা গেছে। সমুদ্রের তুলনায় মহাদেশের ভার বেশী। সুতরাং

চিত্র 6.3
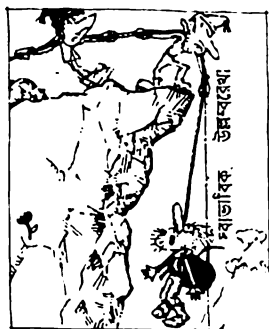
সমুদ্রের উপরে g-এর মানের তুলনায় মহাদেশের উপরে g-এর মান বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, একই অক্ষাংশে মহাদেশের অভ্যন্তরে ও সমুদ্রের উপরে g-এর গড় মানের কোন তারতম্য নেই। এক্ষেত্রেও একমাত্র ব্যাখ্যা হল : মহাদেশ অপেক্ষাকৃত হালকা শিলাভূমির উপর অবস্থান করছে এবং অন্যদিকে সমুদ্রের তলদেশ ভারী শিলাস্তর দিয়ে গঠিত। প্রকৃতপক্ষে, যে সমস্ত স্থানে সরাসরি পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে ভূতত্ত্ববিদেরা স্থিরপ্রত্যয় হয়েছেন যে, সমুদ্রের তলদেশ ভারী ব্যাসল্ট পাথর দিয়ে তৈরী এবং মহাদেশের তলদেশ হালকা গ্র্যানাইট পাথরের স্তূপ মাত্র।

উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রশ্ন এসে পড়ে : মহাদেশীয় ও সামুদ্রিক অঞ্চলে ভারী ও হালকা প্রস্তর স্তরবিন্যাস কেন এভাবে সজ্জিত রয়েছে যাতে g-এর মান সম-অবস্থায় থাকে? এই সমতা নিছক কাকতালীয় নয়, পৃথিবীর গোলকের গঠনের মধ্যেই কারণটি নিহিত আছে।

ভূতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন, পৃথিবী গাত্রের গোলকের বহিস্তরগুলি একরকম প্লাস্টিক জাতীয় (নরম কাদার তালের মত — যাকে সহজে যে কোন আকার দেওয়া যায়) পদার্থের উপর ভাসমান ছিল। প্রায় 100 কিলোমিটার গভীরতায় চাপের পরিমাণ সর্বত্র সমান হওয়া উচিত। ঠিক যেমন কোন জলপাত্রে বিভিন্ন ওজনের কাঠের খণ্ড ভাসতে থাকলেও

পাত্রের তলদেশে চাপের পরিমাণ সর্বত্র সমান থাকে। সুতরাং, এক বর্গমিটার ভূমিসম্পন্ন একটি চোঙ ভূপৃষ্ঠ থেকে একশ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত কল্পনা করে নিলে তার তলদেশে ভরের পরিমাণ, কি সে সমুদ্রে, কি সে মহাদেশে — তা সমানই থাকবে।

চাপের এই সমতার জন্যই একই অক্ষাংশে মহাদেশের ভিতরে আর সমুদ্রের বুকে অবাধ পতনের ত্বরণের মানের উল্লেখযোগ্য তারতম্য ঘটে না।

হাউফের রূপকথার ছোট্ট মুক্কে একটি যাদুদণ্ড মৃত্তিকাপৃষ্ঠে আঘাত করে কোথায় আছে সোনা অথবা রূপা যেমন বুঝিয়ে দিয়েছিল, অভিকর্ষীয় ত্বরণের তারতম্যটি ঠিক তেমনি করে বুঝিয়ে দেয় মৃত্তিকার অভ্যন্তরীণ গঠন।

যে জায়গায় g-এর সর্বাধিক মান পাওয়া যাবে সেখানে অবশ্যই ভারী আকরিকের অস্তিত্ব আশা করা যায়। অপেক্ষাকৃত কম g-এর ক্ষেত্রগুলি হালকা লবণজাতীয় স্তর নির্দেশ করে। 1 সেমি/সেকেণ্ড^2-এর একশ হাজার ভাগের একভাগ ত্বরণও নিখুঁতভাবে বার করা সম্ভব।

পেণ্ডুলাম বা অতি নিখুঁত তুলার সাহায্যে এ-জাতীয় সমীক্ষার ভিত্তি মহাকর্ষ। এর বাস্তব উপযোগিতা অপরিসীম, বিশেষ করে তৈলানুসন্ধানের কাজে। এই মহাকর্ষভিত্তিক সমীক্ষার ফলে ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরস্থ লবণস্তূপের অস্তিত্ব নির্ধারণ করা সত্যিই সহজ হয়েছে। অনেক সময় দেখা গেছে যে, ঐ সমস্ত স্থানে তেলও রয়েছে। অধিকন্তু, তেল থাকে গভীরে, তুলনামূলকভাবে খনিজ লবণ ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি অবস্থান করে। কাজাখ্‌স্তান এবং অন্যান্য স্থানে মহাকর্ষীয় সমীক্ষার সাহায্যেই তেল আবিষ্কার করা হয়।

ভূগর্ভে ওজন (Weight underground)

এবারে অন্য আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ের অবতারণা করা যাক। মাটির গভীরে যেতে থাকলে অভিকর্ষ বল কিভাবে পরিবর্তিত হবে?

বস্তুর ওজন-এ যেন পৃথিবীর প্রতিটি কণার থেকে বস্তুর উপর অদৃশ্য 'দড়ি' বরাবর টানের সমষ্টি। পৃথিবীর কণাসমূহের দ্বারা প্রযুক্ত প্রাথমিক বলগুলির লব্ধিই বস্তুর ওজন। যদিও এই প্রাথমিক বলগুলির অভিমুখ পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন কোণ করে কাজ করে, তা সত্ত্বেও বস্তুটি মোটামুটি 'নীচের দিকে' অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে লব্ধ-টান অনুভব করে।

ভূগর্ভস্থ পরীক্ষাগারে কোন বস্তুর ওজন কি দাঁড়াবে? পৃথিবীর ভিতরে এবং বাইরের স্তরগুলি যুগপৎ বস্তুটিকে আকর্ষণ করবে।

চিত্র 6·4

পৃথিবীর কোন বহিঃস্তর ভূগর্ভের কোন একটি বিন্দুতে যে টান প্রয়োগ করছে তা বিবেচনা করা যাক। আমরা যদি এই স্তরকে কতকগুলি পাতলা খোলকে ভাগ করে নিই এবং এরকম একটা পাতলা খোলকে a_1 বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গাকার ক্ষেত্র অঙ্কন করে নিই এবং তারপরে ঐ ক্ষেত্রটির শীর্ষবিন্দুগুলি থেকে O বিন্দুর (যে বিন্দুতে বস্তুর ওজন জানতে চাই) মধ্য দিয়ে রেখা অঙ্কন করি, তাহলে বিপরীত দিকে খোলকটিতে a_2 বাহুবিশিষ্ট আর একটি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র পাওয়া যাবে (চিত্র 6.4)। O বিন্দুতে এই ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র দুটি কর্তৃক আকর্ষণ বল পরস্পরের বিপরীত এবং মহাকর্ষ সূত্র অনুযায়ী $m_1/r_1{}^2$ এবং $m_2/r_2{}^2$-এর সমানুপাতিক হবে। ক্ষেত্র দুটির ভর m_1 এবং m_2 তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে। সে কারণে, মহাকর্ষীয় বলগুলি $a_1{}^2/r_1{}^2$ এবং $a_2{}^2/r_2{}^2$-এর সমানুপাতিক হবে।

উপরোক্ত অনুপাতদ্বয় যে পরস্পর সমান তা পাঠক সহজেই প্রমাণ করে দেখতে পারেন। অর্থাৎ O বিন্দুতে আলোচ্য ক্ষেত্রদ্বয় কর্তৃক প্রযুক্ত আকর্ষণ বল বিপরীতমুখীন্ এবং তারা পরস্পরকে প্রশমিত করে।

এইভাবে একটি পাতলা খোলককে এইরূপ অসংখ্য যুগ্ম 'বিপরীত' ও সদৃশ বর্গাকার ক্ষেত্রে বিভাজন করে যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি পাওয়া গেল, তা হল ঃ একটি পাতলা সমসত্ত্ব গোল খোলক তার অভ্যন্তরে কোন

বিন্দুতে আকর্ষণ বল প্রয়োগ করে না। ভূগর্ভে আমাদের আলোচ্য বিন্দুর বাইরের দিকে পৃথিবীর যে স্তরগুলি রয়েছে তার ক্ষেত্রেও বিষয়টি সত্যি — অর্থাৎ, বিন্দুটির উপর বাইরের স্তরগুলির লব্ধ আকর্ষণ বল শূন্য।

সে কারণে, বিন্দুটির বাইরের স্তরকে আমাদের গ্রাহ্যের মধ্যে না আনলেও হবে। স্তরের বিভিন্ন অংশগুলি আলোচিত বিন্দুটিতে টান প্রয়োগ করলেও টানগুলি পরস্পরকে প্রশমিত করে বলে মোট টান শূন্য হবে।

অবশ্য, উপরোক্ত যুক্তিপ্রয়োগের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়াই হয়েছে যে, প্রতিটি খোলকে পৃথিবীর উপাদানের ঘনত্ব মোটামুটি একই।

উপরের যুক্তিতে ভূত্বকের H গভীরতায় কোন বিন্দুতে অভিকর্ষজ বল নিরূপণ করার বিষয়টি সহজ হয়ে পড়ল। H গভীরতায় অবস্থিত বিন্দুটির উপর কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ গোলকটির আকর্ষণ বলই কাজ করবে। এখানেও $g=GM/R^2$ সূত্রটি প্রয়োগ করা যাবে, M এবং R যথাক্রমে সমগ্র পৃথিবীর ভর ও ব্যাসার্ধ বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে 'অভ্যন্তরীণ' গোলকটির ভর ও ব্যাসার্ধ।

পৃথিবীর সকল স্তরের ঘনত্ব যদি একই ধরা হয়, তাহলে g-এর সূত্রটি দাঁড়ায়,

$$g=G\ \frac{4/3\pi\rho(R-H)^3}{(R-H)^2}=\tfrac{4}{3}\pi G\rho(R-H)$$

এখানে ρ, পৃথিবীর উপাদানের ঘনত্ব এবং R, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ। দেখা যাচ্ছে, g, $(R-H)$-এর সমানুপাতিক হচ্ছে। সুতরাং, গভীরতা H-এর মান যত বাড়বে, g-এর মান তত কমবে।

বাস্তবক্ষেত্রে, আমরা সমুদ্র সমতল থেকে যে 5 কি. মি. গভীরতা পর্যন্ত g বার করতে পেরেছি, সেখানে g-এর আচরণে উপরোক্ত লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। বরং উল্টোটা দেখা যায়, অর্থাৎ এই সমস্ত স্তর-গুলিতে গভীরতার সঙ্গে g-এর মান বাড়তে দেখা যায়। সূত্রের সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ ফলের এই অসঙ্গতি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, আমাদের হিসাবের মধ্যে গভীরতার সঙ্গে ঘনত্বের যে পরিবর্তন আছে তা বিচার করা হয়নি।

পৃথিবীর ভরকে তার আয়তন দিয়ে ভাগ করে পৃথিবীর গড় ঘনত্ব বার করা যায়। এর মান 5·52 ; অথচ বহিঃস্তরের শিলার ঘনত্ব বেশ কম — প্রায় 2·75। গভীরতার সঙ্গে পৃথিবীর শিলাস্তরের ঘনত্ব বাড়তে

থাকে। এই প্রভাবটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে উপরোক্ত ফর্মূলা মাফিক g-এর হ্রাসের বদলে বরং g-এর বৃদ্ধি লক্ষিত হয়।

মহাকর্ষীয় শক্তি (Gravitational energy)

একটি সহজ উদাহরণের মাধ্যমে আমরা ইতিপূর্বেই মহাকর্ষীয় শক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। ভূপৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায় কোন বস্তুকে তুললে তার মধ্যে সঞ্চিত স্থিতিশক্তির পরিমাণ mgh হয়।

অবশ্য, পৃথিবীর ব্যাসের তুলনায় h-এর মান যখন যথেষ্ট কম থাকে, তখনই কেবলমাত্র এই সূত্র কার্যকরী হয়।

মহাকর্ষীয় শক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাশি এবং সেই হিসাবে ভূপৃষ্ঠ থেকে যে কোন উচ্চতায় কোন বস্তুকে তুললে তার ক্ষেত্রে এই শক্তির পরিমাণ কি হবে এজন্য ফর্মূলা নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরী। সাধারণ-ভাবে মহাকর্ষীয় সূত্র —

$F=G\frac{m_1m_2}{r^2}$ অনুযায়ী যে দুটি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করছে তাদের দরুনও এই মহাকর্ষীয় শক্তির (Gravitational energy) ফর্মূলা বের করা প্রয়োজন।

ধরা যাক, বস্তুগুলি যেন তাদের পারস্পরিক আকর্ষণে পরস্পরের দিকে কিছুটা অগ্রসর হচ্ছে। তাদের প্রাথমিক দূরত্ব ছিল r_1, এখন দূরত্ব দাঁড়িয়েছে r_2 ; কৃতকার্য, $A=F(r_1-r_2)$। বল F-এর গড় মান মধ্যবিন্দুতে নির্ণীত বলের পরিমাণের সমান। সুতরাং,

$$A=G\frac{m_1m_2}{r_{int}^2}(r_1-r_2)$$

r_1 এবং r_2-এর পার্থক্য খুব বেশী না হলে, r_{int}^2-এর বদলে r_1r_2 গুণফলটি ব্যবহার করা যায়। তাহলে,

$$A=G\frac{m_1m_2}{r_2}-G\frac{m_1m_2}{r_1}$$

মহাকর্ষীয় শক্তির বিনিময়ে এই কৃতকার্যটি সম্পন্ন হয়েছে ঃ

$$A=U_1-U_2$$

এখানে, U_1 এবং U_2 মহাকর্ষীয় স্থিতিশক্তির প্রাথমিক এবং চূড়ান্ত মান।

উপরোক্ত সূত্রদ্বয় তুলনা করে আমরা স্থিতিশক্তির যে সম্পর্কটি পাই, তা হল ঃ

$$U = -G \frac{m_1 m_2}{r}$$

এই সূত্রটি মহাকর্ষ সূত্রের অনুরূপ, কেবল ভগ্নাংশের হরে r-এর ঘাত মাত্র এক।

এই সূত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, r-এর বড় বড় মানের ক্ষেত্রে স্থিতিশক্তি $U=0$। এটা স্বাভাবিক, কারণ এত বেশী দূরত্বে আকর্ষণ বল বোঝাই যাবে না। কিন্তু বস্তুদ্বয় পরস্পরের নিকটবর্তী হতে থাকলে স্থিতিশক্তিও কমতে থাকবে — কেননা, এই শক্তির বিনিময়েই কার্য সম্পাদিত হয়।

কিন্তু অভিমুখ কি হলে এই শক্তির মান শূন্য থেকেও কমে যেতে পারে? অবশ্যই অভিমুখটি ঋণাত্মক। সেই জন্যই সূত্রটিতে একটি ঋণাত্মক চিহ্ন রয়েছে। -5 শূন্য থেকে ছোট এবং -10 আবার -5 থেকেও ছোট।

আমরা ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছির বস্তুর চলন সম্বন্ধে আলোচনা করছি বলে, অভিকর্ষ বলের জায়গায় আমরা mg ব্যবহার করতে পারি। আরও সঠিকভাবে লিখলে, $U_1 - U_2 = mgh$।

কিন্তু পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R হলে পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন বস্তুর স্থিতিশক্তি $-GMm/R$। সুতরাং ভূপৃষ্ঠের h উচ্চতায়,

$$U = -G \frac{Mm}{R} + mgh.$$

যখন আমরা স্থিতিশক্তির ক্ষেত্রে $U = mgh$ সূত্রটি বলেছিলাম, তখন ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা এবং শক্তির পরিমাপ করেছিলাম। $U = mgh$ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে $-GMm/R$ স্থির রাশিটি শর্তসাপেক্ষে শূন্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। যেহেতু আমাদের কেবলমাত্র শক্তির পার্থক্যটুকুই দরকার এবং সেটাই আমরা পরিমাপ করে থাকি, সুতরাং স্থিতিশক্তির সূত্রে $-GMm/R$ স্থিরমানের রাশিটির বাস্তবে কোন ভূমিকা থাকছে না।

পৃথিবী কোন বস্তুকে আকর্ষণের যে 'শৃঙ্খল' দিয়ে আটকে রেখেছে সেই শক্তির উৎস মহাকর্ষীয় শক্তি। এই শৃঙ্খল 'বন্ধন' কি ছিন্ন করা সম্ভব? কোন বস্তু উপর দিকে ছুঁড়ে দিলে তা পৃথিবীতে ফিরে আসবে না, এমন অবস্থা তৈরী করা যায় কি? অবশ্য এটা পরিষ্কার বোঝা

যাচ্ছে, এরকম অবস্থা সৃষ্টি করতে হলে বস্তুকে প্রচণ্ড প্রাথমিক বেগ দিতে হবে। কিন্তু এজন্য সর্বনিম্ন কত বেগ দরকার ?

যখন কোন বস্তু (ক্ষেপণাস্ত্র, রকেট) ভূপৃষ্ঠ থেকে ছোড়া হয় তখন ভূপৃষ্ঠ থেকে বস্তুর দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে তার স্থিতিশক্তি বাড়তে থাকে (কিন্তু U-এর চরম মান কমতে থাকে) এবং গতিশক্তি কমতে থাকে। পৃথিবীর আকর্ষণের 'শৃঙ্খল'-এর সীমানা পেরিয়ে যাবার আগেই যদি বস্তুর গতিশক্তি শূন্যমানে পৌঁছায় তাহলে নিক্ষিপ্ত বস্তু আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসবে।

এজন্য বস্তুটির স্থিতিশক্তি যতক্ষণ না অন্তর্হিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বস্তুটির গতিশক্তি থাকা দরকার। নিক্ষেপের পূর্বে বস্তুটির স্থিতিশক্তি ছিল $-GMm/R$ (M এবং R যথাক্রমে পৃথিবীর ভর ও ব্যাসার্ধ)। সুতরাং, বস্তুকে এমন প্রাথমিক গতিসম্পন্ন করা উচিত যাতে তার মোট শক্তি ধনাত্মক হয়। মোট শক্তি ঋণাত্মক হলে (স্থিতিশক্তির মান গতি-শক্তির মানের চেয়ে বেশী হলে) বস্তুটি কখনই অভিকর্ষের সীমানা পার হতে পারবে না।

তাহলে আমরা একটি সহজ শর্তে উপনীত হলাম। m ভরসম্পন্ন কোন বস্তুকে অভিকর্ষের আওতার বাইরে যেতে হলে অবশ্যই মহাকর্ষীয় স্থিতিশক্তি GMm/R-এর বাধাকে অতিক্রম করতে হবে।

এজন্য নিক্ষিপ্ত বস্তুর বেগ বাড়িয়ে মুক্তিবেগ v_2-র সমান করতে হবে ; স্থিতি ও গতিশক্তির সমতা থেকে সহজেই এই v_2-এর মান হিসাব করা যায় ঃ

$$\frac{mv_2^2}{2} = G\frac{Mm}{R} \quad \text{অর্থাৎ,} \quad v_2^2 = 2G\frac{M}{R}$$

যেহেতু, $g = GM/R^2$

$$\therefore \quad v_2^2 = 2gR$$

বায়ুর ঘর্ষণজনিত বাধা হিসেবের মধ্যে না ধরে v_2-এর মান পাওয়া যায় 11 কি. মি./সেকেণ্ড। এই মান ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষীয় বেগ $v_1 = \sqrt{gR}$-এর $\sqrt{2}$ বা 1·41 গুণ বড়। অর্থাৎ, $v_2 = \sqrt{2}v_1$।

চন্দ্রের ভর পৃথিবীর ভরের 81 ভাগের একভাগ মাত্র আর সেই সঙ্গে চন্দ্রের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের এক-চতুর্থাংশ। সুতরাং ভূপৃষ্ঠের তুলনায় চন্দ্রপৃষ্ঠে মহাকর্ষীয় স্থিতিশক্তি 20 ভাগের একভাগ মাত্র এবং চন্দ্রের আকর্ষণ অতিক্রম করার জন্য 2·5 কি.মি./সেকেণ্ড বেগই যথেষ্ট।

কোন গ্রহ থেকে উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে, গতিশক্তি $\frac{mv_2^2}{2}$ মহাকর্ষীয় 'শৃঙ্খল' ভাঙতে খরচ হয়ে যায়। আকর্ষণের সীমানা পার হওয়ার পরেও যদি রকেটের v বেগে চলার দরকার থাকে তাহলে উৎক্ষেপণের সময় অতিরিক্ত $mv^2/2$ শক্তি দিতে হবে। সে কারণে, উৎক্ষেপকালে প্রদত্ত শক্তি $mv_0^2/2 = \frac{mv_2^2}{2} + \frac{mv^2}{2}$ হওয়া দরকার। দেখা যাচ্ছে; উল্লিখিত বেগ তিনটি একটি সহজ সম্পর্কে যুক্ত ঃ

$$v_0^2 = v_2^2 + v^2$$

পৃথিবী ও সূর্যের মহাকর্ষক্ষেত্র থেকে সুদূর নক্ষত্ররাজ্যে যাওয়ার জন্য যে ন্যূনতম বেগ v_3 দরকার। তার মান কত হবে? এই বেগ সৌরজগৎ পেরিয়ে যাবার মুক্তিবেগ, এজন্য একে নতুন সংখ্যা v_3 দ্বারা সূচিত করা হয়েছে।

প্রথমত, কেবলমাত্র সৌর আকর্ষণ অতিক্রম করতে কত বেগের প্রয়োজন তা হিসাব করা যাক।

একটু আগেই দেখা গেছে, ভূপৃষ্ঠের আকর্ষণ থেকে মুক্তি পাবার বেগ পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষীয় বেগের $\sqrt{2}$ গুণ বেশী। এখানেও একই যুক্তি খাটে। অর্থাৎ, সৌর মুক্তিবেগের মান সূর্যকে প্রদক্ষিণরত গ্রহের (যেমন পৃথিবীর) যে কক্ষীয় বেগ তার $\sqrt{2}$ গুণ হবে।

যেহেতু পৃথিবীর কক্ষীয় বেগ 30 কি.মি./সেকেণ্ড, সুতরাং সৌর আকর্ষণ অতিক্রম করতে 42 কি.মি./সেকেণ্ড বেগ দরকার। এই বেগের পরিমাণ বেশ বড়। কিন্তু দূরতম নক্ষত্রে একটি ক্ষেপণ-যন্ত্র (মিসিল) পাঠাতে পৃথিবীর গতির অভিমুখকে কাজে লাগান সুবিধাজনক এবং এজন্য পৃথিবীর বেগের অভিমুখে বস্তুকে উৎক্ষেপ করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের দরকার মাত্র $42 - 30 = 12$ কি.মি./সেকেণ্ড বেগ।

এবার তাহলে আমরা সৌরজগৎ থেকে মুক্তিবেগ হিসাব করতে পারি। এই বেগ এমন হবে যাতে পৃথিবীর অভিকর্ষসীমা ছাড়িয়েও উৎক্ষিপ্ত বস্তুর বেগ অন্তত 12 কি.মি./সেকেণ্ড থাকে। আগের সূত্রটি থেকে সহজেই লেখা যায় ঃ

$$v_3^2 = 11^2 + 12^2$$

অর্থাৎ, $v_3 = 16$ কি.মি./সেকেণ্ড।

দেখা যাচ্ছে, বস্তুর উৎক্ষেপ বেগ 11 কি.মি./সেকেণ্ড হলে বস্তুটি পৃথিবীর অভিকর্ষ পেরিয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সূর্য তাকে ছেড়ে দিচ্ছে না। ফলে বস্তুটি সূর্যের উপগ্রহে রূপান্তরিত হবে।

সৌরজগতে পৃথিবীর চারপাশে কক্ষপথে পরিভ্রমণের জন্য কোন বস্তুর যে উৎক্ষেপবেগ দরকার তাকে মাত্র দেড়গুণ উন্নত করে দিতে পারলেই বস্তুটি আন্তর্নক্ষত্রিক জগতে চলে যেতে পারে।

অবশ্য একথা সত্যি, উৎক্ষিপ্ত মিসিলের প্রাথমিক বেগ খুব সামান্য পরিমাণে বাড়াতে গেলেও অনেক প্রযুক্তিগত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় (৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

গ্রহরা কিভাবে গতিশীল (How planets move)

এ প্রশ্নের জবাবে সংক্ষিপ্ততম উত্তরটি হলঃ মহাকর্ষ সূত্র অনুযায়ী। গ্রহদের উপর একমাত্র প্রযুক্ত বল হল মহাকর্ষ বল।

গ্রহদের ভর সূর্যের ভরের চেয়ে অনেক কম বলে গ্রহদের নিজেদের মধ্যে আকর্ষণ বলের গুরুত্বপূর্ণ কোন ভূমিকা থাকে না। অন্য কোন গ্রহ না থাকলে কোন একটি গ্রহ সূর্যকে যেভাবে প্রদক্ষিণ করত, গ্রহগুলি থাকার ফলে তার তেমন কোন হেরফের হবে না।

সর্বজনীন মহাকর্ষ সূত্র থেকেই গ্রহের গতির নিয়মকানুন পাওয়া যায়।

অবশ্য, ইতিহাস বলে, উপরোক্ত সূত্রের পথ ধরে কিন্তু গ্রহপুঞ্জের গতির রীতি উদ্ভাবিত হয় নি। নিউটনের পূর্বে এবং ফলত মহাকর্ষ সূত্রের প্রয়োগ ব্যতিরেকেই প্রায় কুড়ি বছরের পর্যবেক্ষণের ফলস্বরূপ প্রখ্যাত জার্মান জ্যোতিবিদ জোহানেস কেপলার (Johannes Kepler, 1571-1630) গ্রহের আবর্তনের সূত্রাবলী আবিষ্কার করেন।

সূর্যের চারপাশে কোন গ্রহের পরিক্রমাপথ বা জ্যোতিবিজ্ঞানীদের ভাষায় কক্ষপথ প্রায় বৃত্তাকার।

এখন কক্ষপথের ব্যাসার্ধের সঙ্গে গ্রহের আবর্তনকালের সম্পর্ক কি রকম ?

কোন গ্রহের ক্ষেত্রে সূর্য কর্তৃক প্রযুক্ত মহাকর্ষ বল

$$F=G\frac{Mm}{r^2}$$

এখানে M, সূর্যের ভর ; m, গ্রহটির ভর এবং r, উভয়ের মধ্যে দূরত্ব।

বলবিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান থেকে আমরা জানি যে, F/m হল ত্বরণ এবং বর্তমান ক্ষেত্রে এই ত্বরণ অভিকেন্দ্রিক ত্বরণ ঃ

$$F/m = v^2/r$$

গ্রহের পরিক্রমাপথ $2\pi r$-কে আবর্তনকাল T দিয়ে ভাগ করলে কক্ষীয় বেগ পাওয়া যায়। তাহলে $v = \frac{2\pi r}{T}$ এবং F-এর মান বসিয়ে ত্বরণের রাশিমালা থেকে পাই ঃ

$$\frac{4\pi^2 r}{T^2} = \frac{GM}{r^2}, \text{ অর্থাৎ, } T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$$

r^3-এর সহগটি সূর্যের ভরের উপর নির্ভরশীল যে কোন গ্রহের ক্ষেত্রে এর মান স্থির। সুতরাং, দুটি গ্রহের ক্ষেত্রে নীচের সূত্রটি খাটে ঃ

$$T_1{}^2/T_2{}^2 = r_1{}^3/r_2{}^3$$

সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহের আবর্তনকালের বর্গ গ্রহের কক্ষপথের ব্যাসার্ধের ত্রিঘাতের সমানুপাতিক। কোন প্রাথমিক সূত্র ছাড়াই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কেপলার এই সূত্রটি আবিষ্কার করেন। বিশ্বজনীন মহাকর্ষ সূত্র কেপলারের এই পর্যক্ষেণকে ব্যাখ্যা করে মাত্র।

একটি নভোমণ্ডলীয় বস্তু অপর একটি বস্তুর চারদিকে মহাকর্ষের প্রভাবে নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তন করতে পারে, বৃত্তীয় পথ তাদের একটি। এ ছাড়া অন্য ধরনের কক্ষপথেরও সম্ভাবনা আছে।

মহাকর্ষের প্রভাবে যখন একটি বস্তু অন্য একটি বস্তুর চারদিকে আবর্তন করে তখন পরিক্রমা পথ বিচিত্র প্রকৃতির হতে পারে। যাই হোক, গণনা থেকে দেখা যায় বা যখন গণনা করা হয়নি তখন কেপলার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাতে জানা যায়, সকল নভোমণ্ডলীয় বস্তুর পরিক্রমাপথ একই ধরনের এবং এগুলি উপবৃত্তাকার।
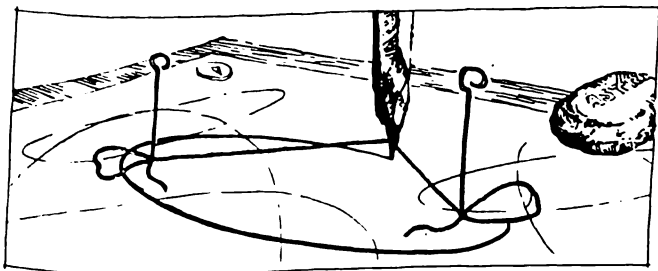
চিত্র 6.5

যদি একটি কাগজের উপর দুটি পিন পুঁতে তাদের একখণ্ড সূতা দিয়ে যুক্ত করা হয় এবং তারপরে একটি পেন্সিলের অগ্রভাগ দিয়ে সূতাটি এমনভাবে টানতে থাকি যাতে সূতাটি সব সময় টানটান অবস্থায় থাকে, তাহলে কাগজের উপর ঐ পেন্সিলের অগ্রভাগটি একটি বদ্ধ বক্ররেখা উৎপন্ন করবে এবং এই লেখাটি হবে উপবৃত্তাকার (চিত্র 6.5)। যে বিন্দু দুটিতে পিন দুটি আটকানো রয়েছে, সে দুটি উপবৃত্তের নাভি (ফোকাস) হবে।

উপবৃত্তের চেহারা নানারকম হতে পারে। পিন দুটির পারস্পরিক দূরত্বের চেয়ে যদি সূতাটির দৈর্ঘ্য অনেক বেশী নেওয়া হয় তাহলে লেখটি বৃত্তের কাছাকাছি হবে। অন্যদিকে, সূতাটির দৈর্ঘ্য যদি পিন দুটির দূরত্বের চেয়ে সামান্যমাত্র বেশী হয়, তাহলে প্রায় একটি কাঠির আকারের লম্বাটে উপবৃত্ত পাওয়া যাবে।

সূর্যকে নাভিদ্বয়ের একটিতে রেখে গ্রহগুলি উপবৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে।

গ্রহগুলি কোন্ ধরনের উপবৃত্তাকার পথ তৈরী করে? দেখা যায়, উপবৃত্তগুলি প্রায় বৃত্তের মতই।

সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধের পরিক্রমা পথ বৃত্ত-অবস্থা থেকে সবচেয়ে বেশী বিচ্যুত। তা সত্ত্বেও, এই ক্ষেত্রে উপবৃত্তটির দীর্ঘতম ব্যাসটি ক্ষুদ্রতম ব্যাসের চেয়ে মাত্র 2% বড়। কৃত্রিম উপগ্রহের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বেশ পৃথক। 6.6 চিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন — মঙ্গলের পরিক্রমাপথকে বৃত্ত ছাড়া অন্য কিছু মনে করা মুস্কিল।

অন্যদিকে, সূর্য যেহেতু উপবৃত্তাকার পথের একটি নাভিতে অবস্থান করছে, একারণে, সূর্য থেকে একটি গ্রহের দূরত্ব ক্রমাগত উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়। উপবৃত্তের নাভি দুটি একটি সরলরেখা দিয়ে যোগ করা যাক। বর্ধিত রেখাটি উপবৃত্তকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে। সূর্যের নিকটতম বিন্দুটিকে অনুসূর (Perihelion) ও দূরতম বিন্দুটিকে অপসূর (Aphelion) বলে। অনুসূরে অবস্থানের সময় বুধ গ্রহটি অপসূরের তুলনায় সূর্যের দেড়গুণ কাছে চলে আসে।

বড় গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে যে উপবৃত্তাকার পরিক্রমাপথ তৈরী করে তা প্রায় বৃত্তের অনুরূপ। এ ছাড়া, সৌরমণ্ডলে অনেক বস্তু সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, অনেকখানি ছুঁচলো বা দীর্ঘাকার উপবৃত্তের পথে। ধূমকেতু এদের অন্যতম। এগুলির কক্ষপথ আদৌ গ্রহগুলির পরিক্রমাপথের সঙ্গে তুলনীয় নয়। উপবৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণশীল বস্তুসমূহ

সম্বন্ধে এটুকু বলা যায় যে, সেগুলি সৌরপরিবারের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য, আমাদের সৌরমণ্ডলে কখনও কখনও আগন্তুকেরও আবির্ভাব ঘটে।
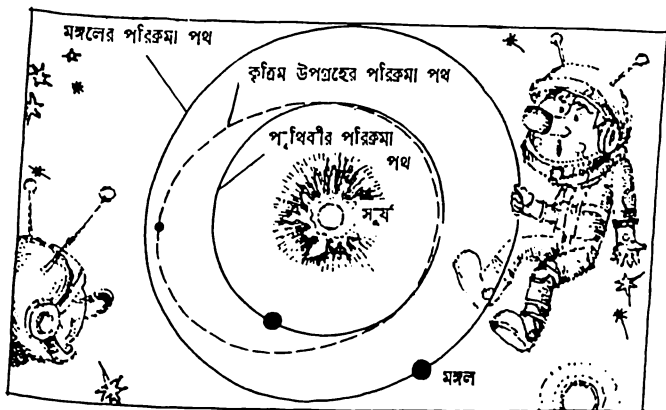
চিত্র 6.6

কোন কোন ধূমকেতুর পরিক্রমাপথ পর্যবেক্ষণ করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তটি করা যেতে পারে : ধূমকেতুটি আর ফিরে আসবে না ; এটি আমাদের সৌরপরিবারের সদস্য নয়। ধূমকেতুর দ্বারা অঙ্কিত মুক্ত লেখগুলি পরাবৃত্তাকার।

সূর্যের কাছাকাছি এলে এইসব ধূমকেতুর বেগ অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। এর কারণ অবশ্য বোঝা যায় : ধূমকেতুটির মোট শক্তি স্থিরমানের এবং সূর্যের কাছাকাছি চলার সময়ে এর স্থিতিশক্তি হ্রাস পায়। ফলে, সে সময় গতিশক্তি সর্বোচ্চ হয়। অবশ্য, আমাদের পৃথিবীসহ সকল গ্রহের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। যাই হোক, অপসুর ও অনুসুরের মধ্যে স্থিতিশক্তির পার্থক্য খুব সামান্য বলে এই ক্রিয়া বেশ কম।

কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণসমূহের সাহায্যে গ্রহের গতির একটি কৌতূহলোদ্দীপক সূত্র পাওয়া যায়।

6.7 চিত্রে একটি গ্রহের দুটি অবস্থান দেখান হয়েছে। সূর্য অর্থাৎ উপগ্রহের নাভি থেকে অবস্থান দুটিতে দুটি দূরক টানা হয়েছে এবং এইভাবে যে ক্ষেত্রটি পাওয়া গেছে তাকে রেখাঙ্কিত করে দেখান হয়েছে। একক সময়ে দূরকটি যে ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে তা বার করতে চাই।

এই ক্ষেত্রকে ত্রিভুজ বলেও ধরা যায় যদি অতিক্রান্ত শীর্ষকোণটি খুব ক্ষুদ্র হয়। ত্রিভুজটির ভূমি হচ্ছে v (একক সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব)
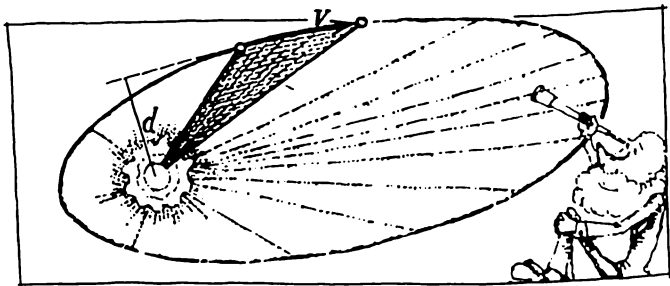
চিত্র 6.7

এবং ত্রিভুজটির উচ্চতা হচ্ছে বেগের লিভারবাহু d। সুতরাং, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল $vd/2$।

কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণ-সূত্র থেকে জানি যে, mvd রাশিটি স্থির থাকবে। mvd স্থির থাকলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল vd-ও স্থির থাকে! অতএব, কোনও নির্দিষ্ট সময়-অবকাশে যে ক্ষেত্রটি পাব তার মান স্থির। গ্রহটির বেগ কম-বেশী হতে পারে, কিন্তু তথাকথিত ক্ষেত্রবেগ অপরিবর্তিত থাকছে।

সমস্ত নক্ষত্রেরই গ্রহমণ্ডল নেই। মহাকাশে কোন কোন জায়গায় যুগ্ম নক্ষত্র অবস্থান করে। দুই অতিকায় মহাজাগতিক বস্তু পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে।

সূর্য যে তার পরিবারের কেন্দ্রে রয়েছে তা তার প্রচণ্ড ভরের জন্যই সম্ভব হয়েছে। যুগ্ম নক্ষত্রের দুজনের ভর প্রায় সদৃশ। এক্ষেত্রে, এদের একজনকে স্থির ধরে এগোতে পারি না। কিন্তু এখানে গতি নির্বাহ হয় কিভাবে? আমরা জানি যে, কোন বদ্ধ বস্তুসংহতির একটি স্থির (বা সমবেগে চলমান) বিন্দু থাকে—বিন্দুটি সংহতির ভরকেন্দ্র। নক্ষত্র দুটি তাদের এই ভরকেন্দ্রের চারদিকে আবর্তন করে। অধিকন্তু, তাদের কক্ষপথ একই ধরনের উপবৃত্ত। ১৪২ পৃষ্ঠায় আলোচিত $m_1/m_2 = r_2/r_1$ শর্ত থেকে তা বোঝা যাচ্ছে। একটি নক্ষত্রের ভর অন্যটির তুলনায় যতগুণ ছোট তার উপবৃত্তটিও অন্যটির

তুলনায় ঠিক ততগুণ বড় (চিত্র 6.8)। সমান ভরের ক্ষেত্রে দুটি নক্ষত্রই ভরকেন্দ্রের চারদিকে সদৃশ পরিক্রমাপথ উৎপন্ন করে।
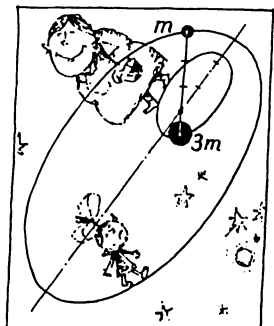
চিত্র 6·8

সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলি আদর্শ অবস্থায় পরিভ্রমণ করে—তাদের কোন ঘর্ষণবাধার সম্মুখীন হতে হয় না।

মানুষের তৈরী মহাকাশযান—উপগ্রহের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কিন্তু এরকম আদর্শ নয়ঃ আপাতদৃষ্টিতে ঘর্ষণ বলের মাত্রা নগণ্য বলে মনে হলেও গতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বাধা উৎপন্ন করে।

গ্রহের মোট শক্তি স্থির। কিন্তু উপগ্রহের প্রতিটি আবর্তনের জন্য মোট শক্তি ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। হঠাৎ মনে হবে, ঘর্ষণ বলের জন্য গতি যেন ক্রমশ মন্দীভূত হচ্ছে। বাস্তবে কিন্তু বিপরীতই ঘটে।

প্রথমত, স্মরণ করা যাক, উপগ্রহের বেগ $\sqrt{gR}$ বা $\sqrt{GM/R}$ যেখানে R, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উপগ্রহটির দূরত্ব এবং M, পৃথিবীর ভর।

উপগ্রহটির মোট শক্তি

$$E=-G\frac{Mm}{R}+\frac{mv^2}{2}$$

বেগের জায়গায় $\sqrt{\frac{GM}{R}}$ বসিয়ে আমরা গতিশক্তি মান পাই $\frac{GMm}{2R}$। দেখা যাচ্ছে, গতিশক্তির মান স্থিতিশক্তির মানের অর্ধেক এবং মোট শক্তি,

$$E=-\frac{G}{2}\ \frac{Mm}{R}$$

ঘর্ষণ বলের জন্য মোট শক্তি হ্রাস পায়, অর্থাৎ (যেহেতু এটি ঋণাত্মক), এর সাংখ্যমান বৃদ্ধি পায় ; R কমতে থাকে ঃ উপগ্রহটি নীচে নামতে থাকে। এক্ষেত্রে শক্তির মানগুলি কেমন হয় ? স্থিতি-শক্তি কমে (সাংখ্যমান বৃদ্ধি পায়), গতিশক্তি বাড়ে।

তা সত্ত্বেও, মোট শক্তি ঋণাত্মক থাকে, কারণ গতিশক্তি যে হারে বাড়ে, স্থিতিশক্তি তার দ্বিগুণ হারে কমতে থাকে। দেখা যাচ্ছে, ঘর্ষণের ফলে উপগ্রহের গতিবেগ কমে না, বরং বেড়ে যায়।

এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কেন একটি বৃহদাকার মহাকাশযান ক্ষুদ্রাকার উপগ্রহকে পিছনে ফেলে বেরিয়ে যায়। বৃহদাকার রকেটের ক্ষেত্রে ঘর্ষণ বল যে বেশী।

আন্তর্গ্রহ ভ্রমণ (Interplanetory travel)

ইতিমধ্যেই আমরা বেশ কয়েকটি চন্দ্রলোকযাত্রা প্রত্যক্ষ করেছি। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রযান এবং মনুষ্যবাহিত যান চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেছে এবং সেখান থেকে ফিরেও এসেছে। বুধ এবং শুক্রগ্রহে মহাকাশ-বীক্ষণ (probe) যান পাঠানো হয়েছে। শীঘ্রই অন্যান্য গ্রহেও যাত্রা শুরু হবে এবং স্বয়ংক্রিয় মহাকাশবীক্ষণ যান এবং মানুষেরা সেখান থেকে ফিরেও আসবে।

আন্তর্গ্রহ যাত্রার মূল বিষয়গুলি, যেমন, রকেট চলাচলের নিয়ম, কোন মহাজাগতিক বস্তুকে প্রদক্ষিণ বা তার অভিকর্ষক্ষেত্র অতিক্রম করার জন্য বিভিন্ন গতিবেগের গণনা আমাদের জানা হয়েছে।

উদাহরণ হিসাবে চন্দ্রযাত্রার কথা বলা যাক। এর জন্য চন্দ্রের কক্ষপথের কোন বিন্দুর দিকে রকেটকে অভিমুখী করতে হবে। যে সময়ে চন্দ্র এই বিন্দুতে আসবে ঠিক সেই মুহূর্তেই রকেটটিকে সেখানে পৌঁছতে হবে। রকেটটি যে কোন পথ ধরে এমনকি সরলরেখাতেও যেতে পারে। এর জন্য দেখতে হবে রকেটটি যেন পৃথিবীর মুক্তিবেগ পায়। জ্বালানী খরচ ত্বরণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন পথে বিভিন্ন পরিমাণ জ্বালানী দরকার হবে। আর একটি বিষয় হল, পরিভ্রমণ-সময় প্রাথমিক বেগের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। সম্ভবপক্ষে ন্যূনতম প্রাথমিক বেগের ক্ষেত্রে পাঁচদিনের মত সময় লাগে, কিন্তু এই বেগ 0·5 কি.মি./সেকেণ্ড বাড়াতে পারলে পরিভ্রমণ সময় 24 ঘণ্টায় এসে দাঁড়াতে পারে।

এটা মনে হতে পারে, চন্দ্রের আকর্ষণ সীমায় রকেটটি শূন্য বেগে পৌঁছতে পারলেই হল। তারপরে তো সেটি চন্দ্রের আকর্ষণে তার

উপর নেমে আসবে। এই ধারণা ভ্রমাত্মক, কারণ, পৃথিবী সাপেক্ষে রকেটটির বেগ যখন শূন্য তখন কিন্তু চন্দ্র সাপেক্ষে তার বেগ চন্দ্রের কক্ষীয় বেগের সমান এবং তা বিপরীত মুখে।

চিত্র 6·9
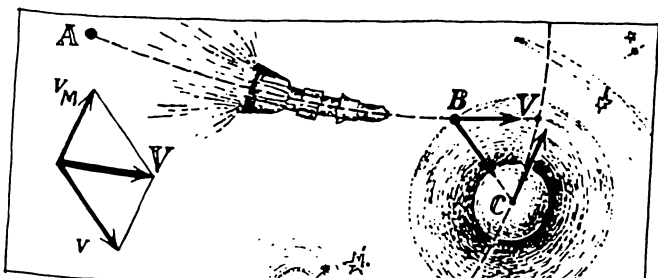
6·9 চিত্রে A বিন্দু থেকে উৎক্ষিপ্ত রকেটের গতিপথ ও চন্দ্রের আবর্তন পথ দেখান হয়েছে। কল্পনা করতে পারি যে, চন্দ্রের আকর্ষণ প্রভাবিত-অঞ্চলটাও একই পথ বরাবর সঞ্চরমান (রকেটের উপর এ সময় একমাত্র চন্দ্রের আকর্ষণ বল ক্রিয়া করছে)। B বিন্দুতে রকেটটি যখন চন্দ্রের আকর্ষণক্ষেত্রে প্রবেশ করছে, চন্দ্র তখন C বিন্দুতে এবং তার বেগ v_M-এর মান 1·02 কি.মি./সেকেণ্ড। যদি B বিন্দুতে পৃথিবী সাপেক্ষে রকেটটির বেগ শূন্য হত, তাহলে চন্দ্র সাপেক্ষে এর মান হত $-v_M$। সেক্ষেত্রে রকেটটি অনিবার্যভাবে চাঁদকে ছুঁতে পারত না।

চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে রকেটটি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যেত যে, রকেটের বেগ v থাকলে তা সঠিক কোণে চন্দ্রে অবতরণ করতে পারত। তাহলে, এক্ষেত্রে রকেটটির সঠিক গতিপথ এবং বেগ কি হওয়া উচিৎ বলে মনে হয়? B বিন্দুতে অবশ্যই রকেটের বেগ শূন্যমানে থাকা ঠিক হবে না, বরং 6.9 চিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে, তার বেগ V হওয়া দরকার। এই মান জানার জন্য চিত্রের বেগ সামান্তরিকটি ব্যবহার করতে হবে।

আরও ব্যাপার রয়েছে। v ভেক্টরটির নিখুঁতভাবে চাঁদের কেন্দ্রমুখী হবার দরকার তেমন নেই। এছাড়া, চাঁদের অভিকর্ষ বল ত্রুটি বাড়িয়ে দেয়।

যাই হোক, গণনা করে দেখান যায় যে, সুযোগসীমা খুবই কম। প্রাথমিক বেগে প্রতি সেকেণ্ডে কয়েক মিটারের বেশী ভুলচুক করার উপায় নেই এবং যে কোণে রকেটটি উৎক্ষেপ করা হবে তার ভুলও যেন এক ডিগ্রীর দশ ভাগের একভাগের মধ্যে থাকে। এর সঙ্গে উৎক্ষেপকাল যেন সঠিক সময়ের কয়েক সেকেণ্ডের বেশী তফাত না হয়।

তাহলে এবার রকেটটি চাঁদের দিকে শূন্য থেকে বেশী বেগে এগোচ্ছে। হিসাব করে দেখা যায় যে, এই বেগ v-এর মান 0·8 কি.মি./সেকেণ্ড। চাঁদের অভিকর্ষের দরুন এই বেগ বেড়ে যায় এবং রকেটটি প্রায় 2·5 কি.মি./সেকেণ্ড বেগে চাঁদকে আঘাত করে। এটা মোটেই কাজের কথা নয়, কারণ, এবম্বিধ সংঘর্ষে রকেটটি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে। ব্রেক-সমন্বিত রকেট ব্যবহার করে অবতরণের গতি মন্দীভূত করে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এই রকম আল্‌তোভাবে নামার জন্য প্রচুর জ্বালানী দরকার। ৮৩-৮৪ পৃষ্ঠার সূত্র থেকে দেখা যায় রকেটটির ওজন কমে যাবে প্রায় 2·7 ভাগ (ওজনটিকে 2·7 দিয়ে ভাগ করলে যে ওজন পাওয়া যাবে)।

রকেটটি পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে চাইলে তখন কিছু জ্বালানী অবশিষ্ট থাকা দরকার। চন্দ্র তুলনামূলকভাবে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি মহাজাগতিক বস্তু মাত্র, এর বিস্তার মোটামুটি 3476 কি.মি. এবং ভর $7{\cdot}43 \times 10^{22}$ কিলোগ্রাম। হিসাব করে দেখা যায়, চন্দ্রের কক্ষীয় বেগ (চন্দ্রের চারপাশে কক্ষপথে কোন উপগ্রহকে গতিশীল রাখার বেগ) 1680 মি/সেকেণ্ড এবং চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে মুক্তিবেগ 2376 মি/সেকেণ্ড মাত্র। এর অর্থ, চন্দ্রপৃষ্ঠ ত্যাগ করার জন্য রকেটের 2·5 কি.মি./সেকেণ্ড-এর ন্যূনতম প্রাথমিক বেগ দরকার। এতে রকেটটি পাঁচদিন পরে পৃথিবীতে ফিরে আসবে এবং তখন সে তার 11 কি.মি./সেকেণ্ড-এর পরিচিত বেগটি লাভ করবে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পুনপ্রবেশের পথে গতির হেরফের খুব সামান্য হওয়া দরকার ; আর রকেটের মধ্যে মহাকাশচারী থাকলে তো ত্বরণ উৎপাদক বলটিকে তার সর্বনিম্ন মানে নামিয়ে আনা দরকার। যাত্রীহীন স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানের ক্ষেত্রেও তাকে মাটিতে নামিয়ে আনার আগে বেশ কয়েকপাক পৃথিবীকে আবর্তন করিয়ে উপবৃত্তের ব্যাসার্ধ হ্রাস করিয়ে নেওয়া উচিত। এতে যানটি খুব বেশী উত্তপ্ত হয় না এবং নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

চন্দ্র অভিযান প্রচণ্ড ব্যয়-বহুল। আমরা যদি ধরে নিই যে ফিরে আসার সময় মনুষ্যবাহী যানটির ওজন ন্যূনপক্ষে 5 টন, তাহলে উৎক্ষেপণের সময় বিভিন্ন ভার সমেত এর ওজন ছিল প্রায় 4·5 হাজার টন। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করছেন যে, আগামী ২০ বছরে কোন অভিযাত্রী চন্দ্র বা অন্য কোন গ্রহে পাঠানো হচ্ছে না। অধিকতর গতি-দায়ক নতুনতর প্রোপেলার পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে। তবে এটা যে করা যাবেই, এমন কোন ভবিষ্যদ্‌বাণী আগেভাগে করা ঠিক হবে না।

যদি চন্দ্র না থাকত (If there were no moon)

চন্দ্রের অবর্তমানে চন্দ্র অনুরাগী আর কবিকুল কি দুঃখ পাবে তা আমরা এখানে আলোচনা করতে যাচ্ছি না। এই অনুচ্ছেদের বিষয়টিকে একেবারে গদ্যময় অর্থে বুঝতে হবে ; চন্দের উপস্থিতি পার্থিব গতি-বিদ্যার উপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে টেবিলের উপর রাখা একটি বই-এর উপরে কি কি বল ক্রিয়া করছে তা জানাতে গিয়ে আমরা নির্দ্বিধায় বলেছি ; পৃথিবীর অভিকর্ষ ও প্রতিক্রিয়া বল। কিন্তু বস্তুত বলা উচিত, টেবিলে রক্ষিত বইটিকে পৃথিবী ছাড়া চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রাদিও আকর্ষণ করছে।

চন্দ্র আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের কথা না তুলে আমরা বরং চন্দ্রের প্রভাবে পৃথিবীতে কোন বস্তুর ওজন কেমন পাল্টায় তা খতিয়ে দেখি।

পৃথিবী এবং চন্দ্র পরস্পরের সাপেক্ষে গতিশীল। চন্দ্র সাপেক্ষে পৃথিবী (এবং এর তাবৎ কণা) Gm/r^2 ত্বরণ নিয়ে ছুটছে, এখানে m, চন্দ্রের ভর এবং r, চন্দ্রের কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর দূরত্ব।

ভূপৃষ্ঠে একটি বস্তুর কথা ধরা যাক। চন্দ্রের প্রভাবে বস্তুটির ওজনের কি রকম পরিবর্তন ঘটে তা জানতে আমরা আগ্রহী। পৃথিবী সাপেক্ষে ত্বরণ থেকে পার্থিব ওজন জানা যায়। সুতরাং বিষয়টি এভাবেও বলা যায়, ভূপৃষ্ঠে কোন বস্তুর পৃথিবী সাপেক্ষে যে ত্বরণ তা চন্দ্রের প্রভাবে কতটা পাল্টে যায় তা জানতেই আমাদের আগ্রহ।

চন্দ্র সাপেক্ষে পৃথিবীর ত্বরণ Gm/r^2, চন্দ্র সাপেক্ষে পৃথিবীস্থিত কোন বস্তুর ত্বরণ তাহলে $Gm/r_1{}^2$, এখানে চন্দ্রের কেন্দ্র থেকে বস্তুটির দূরত্ব r_1 (চিত্র 6.10)।

কিন্তু পৃথিবী সাপেক্ষে বস্তুটির অতিরিক্ত ত্বরণটি জানা উচিত ; এটি সঠিক ত্বরণ দুটির জ্যামিতিক পার্থক্য।

চিত্র 6.10
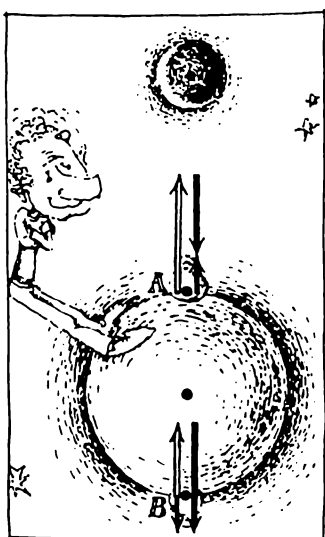
চিত্র 6.11

পৃথিবীর ক্ষেত্রে Gm/r^2 রাশিটি স্থিরমানের, কিন্তু পৃথিবীর উপরে বিভিন্ন জায়গায় $Gm/r_1{}^2$-এর মান বিভিন্ন। সুতরাং আমাদের আলোচ্য জ্যামিতিক পার্থক্যটি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন হবে।

দেখা যাক, চন্দ্রের নিকটতম পার্থিব বিন্দু, দূরতম বিন্দু এবং এ দুয়ের মাঝামাঝি জায়গায় পার্থিব ওজন কত দাঁড়ায়।

পৃথিবীর কেন্দ্র সাপেক্ষে চন্দ্র-প্রভাবিত ত্বরণ অর্থাৎ পার্থিব ত্বরণ g-র সংশোধনটি বার করতে হলে নির্বাচিত বিন্দুগুলিতে $Gm/r_1{}^2$ থেকে Gm/r^2 স্থির রাশিটি বিয়োগ করতে হবে (6.11 চিত্রে হালকা তীরগুলি)। এই সঙ্গে এটাও স্মরণ রাখতে হবে, চন্দ্র সাপেক্ষে পৃথিবীর ত্বরণ, Gm/r^2-এর অভিমুখ উভয় কেন্দ্রের সংযোজক রেখার সমান্তরাল। কোন ভেক্টরের বিয়োগ মানেই বিপরীতমুখী ভেক্টরের যোগ। $-Gm/r^2$ ভেক্টরগুলি ঘন তীরচিহ্নের সাহায্যে দেখান হয়েছে।

চিত্রে প্রদর্শিত ভেক্টরগুলি যোগ করে আমরা ঈপ্সিত রাশিমালা পেতে পারি ঃ চন্দ্রের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে অবাধ পতনের ত্বরণের পরিবর্তন।

চন্দ্রের নিকটতম বিন্দুতে লব্ধ ত্বরণটি দাঁড়ায়

$$G\frac{m}{(r-R)^2} - G\frac{m}{r^2}$$

এবং এর অভিমুখ চন্দ্রের দিকে। পৃথিবীর অভিকর্ষ হ্রাস পাচ্ছে ঃ চন্দ্র না থাকলে যে ওজন হত, A বিন্দুতে বস্তুর ওজন তা থেকে কমে যাচ্ছে।

R যে r-এর তুলনায় অনেক ছোট, একথা মনে রেখে আমরা পূর্বোক্ত রাশিটির সরল রূপ বার করতে পারি। রাশিটি এইভাবে লেখা যায়, $\frac{GmR(2r-R)}{r^2(r-R)^2}$

বন্ধনী দুটির মধ্যে r বা $2r$ থেকে R অনেক ছোট সংখ্যা। অতএব r ও $2r$-এর তুলনায় R-কে উপেক্ষা করলে রাশিটি সরলতম রূপে প্রকাশ করা যায়,

$$\frac{2GmR}{r^3}\text{।}$$

এবার বিপরীত বিন্দুতে যাওয়া যাক। B বিন্দুতে চন্দ্র প্রভাবিত ত্বরণ খুব বেশী নয়, পৃথিবীর মোট ত্বরণের থেকে বেশী নয় কম। কিন্তু আমরা এখন চন্দ্রের দিক থেকে পৃথিবীর দূরতম বিন্দুতে চলে এসেছি। পৃথিবীর এই প্রান্তে চন্দ্রের আকর্ষণের হ্রাস পাওয়া A বিন্দুতে আকর্ষণের বৃদ্ধি পাওয়ার সমতুল্য। অর্থাৎ অবাধ পতনের ত্বরণের হ্রাস ঘটল। অচিন্ত্যনীয় ফলাফল—তাই নয় কি? এখানেও দেখছি, চন্দ্রের আকর্ষণে বস্তুর ওজন কমে যায়। আলোচ্য পার্থক্যটি

$$G\frac{m}{(r+R)^2} - G\frac{m}{r^2} \approx -\frac{2GmR}{r^3}$$ দেখা যাচ্ছে মানের বিচারে A বিন্দুর মানের সমান।

মধ্যবর্তী রেখায় কোন বিন্দুতে ফলাফল অন্যরকম। এখানে ত্বরণ দুটি পরস্পরের সঙ্গে একটি কোণে আনত। সুতরাং চন্দ্র কর্তৃক পৃথিবীর মোট ত্বরণ Gm/r^2 এবং ভূপৃষ্ঠের বস্তুটির উপর চন্দ্রের আকর্ষণজনিত ত্বরণ $Gm/r_1{}^2$-এর বিয়োগ জ্যামিতিক পদ্ধতিতে (চিত্র 6.12) করতে হবে। আমরা যদি বস্তুটি ভূপৃষ্ঠে এমনভাবে সংস্থাপিত করি যাতে r_1 এবং r সমান হয়, তাহলে মধ্যরেখা থেকে

বস্তুটির বাস্তব বিচ্যুতি খুবই সামান্য হবে। এই দুই ত্বরণের ভেক্টর পার্থক্য একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি। 6.12 চিত্রের ত্রিভুজদুটির
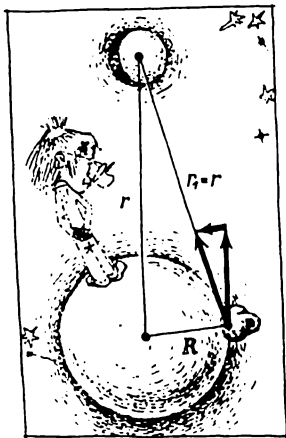
চিত্র 6.12

সাদৃশ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, R, r অপেক্ষা যতগুণ ছোট, নির্ণেয় ত্বরণটি Gm/r^2-এর তুলনায় ঠিক ততগুণ কম। সুতরাং মধ্যমারেখায় g-এর বৃদ্ধি দাঁড়াচ্ছে GmR/r^3, এবং এই মান পূর্বের দুটি প্রান্তবিন্দুতে পৃথিবীর আকর্ষণহ্রাসের অর্ধেক। চিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে, এই ত্বরণের অভিমুখ ভূপৃষ্ঠের উল্লম্ব বরাবর এবং নিম্নমুখী, অর্থাৎ বস্তুটির ওজন বাড়ছে।

সুতরাং পার্থিব গতিবিদ্যার ক্ষেত্রে চন্দ্রের প্রভাব বিচার করে দেখা গেল, ভূপৃষ্ঠে বস্তুর ওজনের তারতম্য ঘটছে। আরও, নিকটতম ও দূরতম বিন্দুদ্বয়ে ওজন হ্রাস পাচ্ছে, কিন্তু মধ্যমারেখায় ওজন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৃদ্ধি উক্ত হ্রাসের অর্ধেক।

বস্তুত, যে কোন গ্রহ, সূর্য বা নক্ষত্রের ক্ষেত্রে একই যুক্তি খাটবে।

হিসাব করে দেখান যায়, যে কোন গ্রহ বা নক্ষত্র চন্দ্রের ত্বরণের সামান্য ভগ্নাংশ পরিমাণও ত্বরণ সৃষ্টি করতে পারে না।

চন্দ্রের ক্রিয়ার সঙ্গে যে কোন নভোমণ্ডলীয় বস্তুর ক্রিয়া সহজেই তুলনা করে দেখা যেতে পারে। ঐ বস্তু কর্তৃক সৃষ্ট অতিরিক্ত ত্বরণকে চন্দ্রের ত্বরণ দিয়ে ভাগ করলে ঃ

$$\frac{GmR}{r^3} \div \frac{Gm_M R}{r_M^3} = \frac{m}{m_M} \cdot \frac{r_M^3}{r^3}.$$

একমাত্র সূর্যের ক্ষেত্রেই এই রাশিটি একের থেকে খুব কম হবে না। চন্দ্রের তুলনায় সূর্যের দূরত্ব অনেক বেশী, কিন্তু চন্দ্রের ভর সূর্যের তুলনায় কয়েক কোটি গুণ কম।

উপরোক্ত রাশিমালায় সংখ্যামান বসিয়ে দেখা যায়, পার্থিব বস্তুর ওজনের হেরফের ঘটানয় সূর্যের তুলনায় চন্দ্রের প্রভাব 2·17 গুণ বেশী।

এখন দেখা যাক, চন্দ্রকে যদি তার কক্ষপথ থেকে সরিয়ে নেওয়া যেত তাহলে পার্থিব বস্তুর ওজন কতটা পরিবর্তিত হত। $2GmR/r^3$-এ বিভিন্ন রাশির মান বসিয়ে দেখা যায়, চন্দ্রের সৃষ্ট ত্বরণ 0·0001 সে.মি./সেকেণ্ড^2-এর মতো—g-এর এককোটি ভাগের একভাগ মাত্র।

মনে হচ্ছে, প্রায় কিছুই না। এরকম একটা অতি সামান্য মান বার করার জন্য এতক্ষণ ধরে কঠিন মনোযোগ সহকারে হিসাবপত্রের পরিশ্রম দরকার ছিল কি? তাড়াহুড়ো করে এ জাতীয় সিদ্ধান্তে না আসাই ভাল। এই 'অতি নগণ্য' প্রভাবেই প্রবল জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি। প্রতিদিন এর ফলে 10^{15} জুল গতিশক্তি উৎপন্ন হয় যা প্রচুর জলরাশিকে গতিশীল করে। এই শক্তি পৃথিবীর সমস্ত নদী যে পরিমাণ গতিশক্তি উৎপন্ন করে তার সমান।

বস্তুত, আমরা যে মান বার করেছি শতকরা হিসেবে তা সামান্য ঠিকই। যে বস্তুর ওজন এই 'অতি নগণ্য' পরিমাণে হ্রাস পায়, সেই বস্তুটি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে খুব সামান্য দূরত্বে সরে যেতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর ব্যাস 6370000 মিটার এবং অতি সামান্য বিচ্যুতির পরিমাণ দাঁড়াবে কয়েক সেণ্টিমিটার।

কল্পনা করা যাক, পৃথিবী সাপেক্ষে চন্দ্র তার গতি থামিয়ে যেন সমুদ্রের উপরে কোন এক জায়গায় অবস্থান করছে। হিসাব করে দেখান যায়, সেই জায়গায় সমুদ্রের জলরাশি 54 সে.মি. উঁচুতে উঠবে। ভূপৃষ্ঠে বিপরীত বিন্দুতে জলের ঠিক তেমনি লম্ফন ঘটবে। এই দুই প্রান্ত বিন্দুর মধ্যবর্তী স্থানে জলতল 27 সে.মি. নীচে নেমে যাবে।

পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্য সমুদ্রে জলতলের ওঠা-নামার 'জায়গাগুলি' সব সময়ে ঘুরছে। এই ওঠা-নামাকে জোয়ার-ভাঁটা বলে। প্রায় ছ' ঘণ্টা ধরে জলতল উপরে উঠে থাকে এবং তীরভূমি প্লাবিত হয়—একে জোয়ার বলে। তারপর শুরু হয় ভাটা—এরও স্থায়িত্ব ঠিক ছ' ঘণ্টার মত। প্রতি চান্দ্র দিনে দু-বার জোয়ার আর দুবার ভাটা হয়। জলকণার ঘর্ষণ, সমুদ্রের তলদেশের গঠন এবং তটরেখার প্রকৃতির ফলে জোয়ার-ভাটার চেহারাটি আরও জটিল হয়ে পড়ে।

যেমন, সমুদ্রের তলদেশ সর্বত্র একইভাবে প্রভাবিত হয় বলে ক্যাস্পিয়ান সাগরে কোন জোয়ার-ভাটা ঘটা সম্ভব হয় না।

দেশের অভ্যন্তরে যে সব সাগর-উপসাগর সমুদ্রের সঙ্গে সংকীর্ণ এবং দীর্ঘ প্রণালী দ্বারা যুক্ত তাদের ক্ষেত্রেও জোয়ার-ভাটা হয় না বললেই চলে — যেমন, কৃষ্ণ সাগর ও বাল্‌টিক সাগর।

অপ্রশস্ত উপসাগরে জোয়ার হয় খুব বড়; মহাসাগরের দিক থেকে অগ্রসরমান জোয়ার এই অঞ্চলে এসে বেশ খাড়া হয়ে ওঠে। যেমন, ওখোস্টক সাগরের প্রবেশপথে গিজিগিনস্কায়াতে জলতল কয়েক মিটার পর্যন্ত উঠে যায়!

যেখানে সমুদ্রের তটভাগ বেশ সমতল (যেমন, ফ্রান্সে) সেখানে জোয়ারের সময় সমুদ্র ও স্থলভাগের সীমারেখা অনেক কিলোমিটার পর্যন্ত সরে যেতে পারে।

জোয়ার-ভাটা পৃথিবীর আবর্তনকে বাধা দেয় — কারণ, জোয়ার-ভাটা ঘর্ষণের অনুরূপ ফলাফল ঘটায়। এই ঘর্ষণ অতিক্রম করার জন্য শক্তি খরচ হয় — তাকে বলে টাইডাল শক্তি। এজন্য পৃথিবীর ঘূর্ণন-শক্তি তথা ঘূর্ণন হ্রাস পায়!

এই ঘটনায় দিনের স্থিতিকাল বৃদ্ধি পায়, 8 পৃষ্ঠায় এই বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

কেন চন্দ্রের একটিমাত্র পিঠই সব সময় পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকে তা আমরা জোয়ার-ভাটার ঘর্ষণ থেকে বুঝতে পারি।

সম্ভবত চন্দ্রের এক সময় তরল অবস্থা ছিল। পৃথিবীর চারদিকে আবর্তন করার সময় এই তরল গোলকের উপর জোয়ার-ভাটার ঘর্ষণ বল প্রচণ্ড ছিল। এতে চন্দ্রের গতি মন্দীভূত হতে থাকে। পরিশেষে, পৃথিবী সাপেক্ষে চন্দ্রের আবর্তন স্তব্ধ হয়, জোয়ার-ভাটা অন্তর্হিত হয় এবং চন্দ্র তার একপিঠ আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে ফেলে।

7. চাপ

হাইড্রলিক প্রেস (Hydraulic press)

হাইড্রলিক প্রেস একটি প্রাচীন যন্ত্র, কিন্তু আজো এর গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কমেনি।
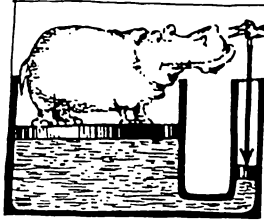
চিত্র 7·1

7·1 চিত্রে একটি হাইড্রলিক প্রেস দেখান হয়েছে। একমাত্র জলের মধ্যে ছোট এবং বড় দুটি পিস্টন চলাচল করতে পারে। চিত্র-অনুযায়ী, হাত দিয়ে একটি পিস্টনকে চাপ দিলে, চাপ অন্য পিস্টনে সঞ্চালিত হয়, ফলে, দ্বিতীয় পিস্টনটি উঠতে থাকে। প্রথম পিস্টন যতটা পরিমাণ জল নীচের দিকে ঠেলে দেয়, দ্বিতীয় পিস্টনের ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই জল তার প্রাথমিক অবস্থান থেকে উপরে উঠে আসে।

যদি প্রথম ও দ্বিতীয় পিস্টনের প্রস্থচ্ছেদ যথাক্রমে S_1 ও S_2 এবং তাদের সরণ যথাক্রমে l_1 এবং l_2 হয়, তবে জলের পরিমাণের সমতা থেকে বলা যায়,

$$S_1 l_1 = S_2 l_2, \text{ অথবা, } \frac{l_1}{l_2} = \frac{S_2}{S_1}$$

এ থেকে পিস্টনদ্বয়ের সাম্য অবস্থার শর্ত আমরা খুঁজে পেতে পারি।

সাম্য অবস্থায় বলগুলির মোট কৃতকার্যের পরিমাণ শূন্য—এই সহজ সত্য থেকে সাম্যের শর্ত বার করা আদৌ কঠিন হবে না। পিস্টনগুলির সরণের সময়কালে, পিস্টনগুলির উপর প্রযুক্ত বল দ্বারা কৃতকার্য পরস্পর সমান হওয়া উচিত (বিপরীত চিহ্ন সহ)।

$$\text{সুতরাং, } F_1 l_1 = F_2 l_2, \text{ অথবা, } \frac{F_2}{F_1} = \frac{l_1}{l_2}$$

'/213-01010

আগের সমীকরণের সঙ্গে তুলনা করলে দেখতে পাই,

$$\frac{F_2}{F_1}=\frac{S_2}{S_1}\text{ ।}$$

এই সমীকরণের মধ্যে প্রচণ্ড বলবৃদ্ধির সম্ভাবনা নিহিত আছে। যে পিস্টনে চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে, তার প্রস্থচ্ছেদ একশ বা হাজার গুণ ছোট করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ছোট পিস্টনে প্রযুক্ত বলের তুলনায় বড় পিস্টনে ঠিক ততগুণ বেশী বল কাজ করবে।

হাইড্রলিক প্রেসের সাহায্যে যে কেউ ধাতুকে পিণ্ট করতে বা ধাতুর উপর চাপ দিতে পারে ; আঙুর ইত্যাদি ফলের রস নিঙরে বার করতে পারে, দরকার মত ওজন তোলার কাজও করতে পারে।

অবশ্য, এই বলবৃদ্ধি নিরঙ্কুশ নয় ; সরণ সমভাবে হ্রাস পায়। এই রকম প্রেসের সাহায্যে একটি বস্তুকে চাপ দিয়ে মাত্র 1 সে.মি. পরিমাণ পাতলা করতে (সরণ সমান 1 সে.মি.) হলে F_2 এবং F_1 বলের যা হার সেই হিসেবে একজনের হাতকে অনেক বেশী পথ ধরে কাজ করতে হবে।

F/S, অর্থাৎ, বল ও ক্ষেত্রফলের অনুপাতকে পদার্থবিদেরা 'চাপ' নামে অভিহিত করেন এবং এই চাপকে p দ্বারা সূচিত করা হয়। 1 কিলোগ্রাম বল 1 বর্গ সে.মি. ক্ষেত্রের উপর কাজ করে—'বলার চেয়ে আমরা সংক্ষেপে এইভাবে বলতে পারি, "চাপ $p=1$ kgf/cm²"। এই চাপকে প্রায়োগিক চাপ বলে ($1\ \mathrm{kgf/cm^2}=1\ \mathrm{at}$)।

$F_2/F_1=S_2/S_1$ সম্পর্কটিকে এভাবে লেখা যায়

$$\frac{F_2}{S_2}=\frac{F_1}{S_1},\ \text{অর্থাৎ}\ p_1=p_2$$

দেখা যাচ্ছে, উভয় পিস্টনের উপর চাপের পরিমাণ সমান।

পিস্টন দুটি কোথায় অবস্থান করছে বা তাদের তলগুলি আনুভূমিক অথবা আনত, এইসব তথ্য আমাদের চাপের আলোচনায় দরকার পড়ে নি। সাধারণ কথায়, পিস্টনেরও নিজস্ব গুরুত্ব নেই। জলাধারের গাত্রে যে কোন দুটি অংশ খুশিমত নির্বাচন করে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, দুই অংশেই চাপ সমান। তাহলে, দাঁড়াচ্ছে যে, তরলের মধ্যস্থিত যে কোন বিন্দুতে প্রযুক্ত চাপ সর্বদিকে সমানভাবে কাজ করছে। অন্য ভাবে বললে, গাত্র তলের একই পরিমাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রসমূহে বল সমান, ক্ষুদ্র অংশগুলির নিজস্ব দিক্স্থিতি বা দিক্‌বিন্যাস যাই হোক না কেন। এই ঘটনাকে প্যাস্কালের সূত্র বলে।

উদস্থৈতিক চাপ (Hydrostatic pressure)

তরল ও গ্যাস, উভয়েরই ক্ষেত্রে প্যাস্কালের সূত্র প্রযোজ্য। কিন্তু এই সূত্র ওজনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে হিসাবের মধ্যে ধরে
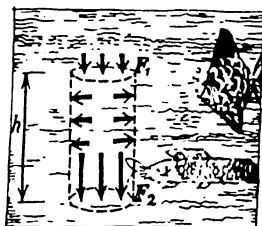
চিত্র 7·2

নি। পার্থিব প্রেক্ষাপটে ওজনের বিষয়টি বিস্মৃত হলে চলবে না। এমন কি, জলেরও ওজন রয়েছে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, জলের মধ্যে ভিন্ন গভীরতায় দুটি ক্ষুদ্র ক্ষেত্রফলের উপর চাপের মান পৃথক হবে। কিন্তু এই পার্থক্য কার সঙ্গে সমান ? আসুন, আমরা জলের মধ্যে আনুভূমিক তলসম্পন্ন একটি বেলন কল্পনা করি। এর ভিতরের জল তার চারপাশের জলে চাপ দিচ্ছে। এই চাপের লব্ধি বেলনের মধ্যস্থিত জলের ভার mg-র সঙ্গে সমান (চিত্র 7.2)। এই বল বেলনের ভূমিদ্বয় ও পার্শ্বতলের উপর ক্রিয়ারত বলসমূহের লব্ধি। কিন্তু পার্শ্বতল সমূহের উপর ক্রিয়াশীল বলগুলি সমান ও বিপরীত হওয়ায় পরস্পরকে প্রশমিত করে। সুতরাং, বেলনের মধ্যস্থিত জলের ভার mg, F_2 এবং F_1 বল দুটির পার্থক্যের সমান। বেলনটির উচ্চতা h, ভূমির ক্ষেত্রফল S এবং তরলের ঘনত্ব ρ হলে, mg-র স্থলে আমরা ρghS-ও লিখতে পারি। তাহলে, বলদ্বয়ের পার্থক্য এর সঙ্গে সমান হবে। চাপের পার্থক্য পেতে এই ওজনকে ক্ষেত্রফল S দিয়ে ভাগ করতে হবে। তাহলে ρgh হল তল দুটির ক্ষেত্রে চাপ-পার্থক্যের সমান।

প্যাস্কালের সূত্র অনুযায়ী, একই গভীরতায় বিভিন্ন দিকে বিন্যস্ত ক্ষেত্রাংশসমূহে চাপের পরিমাণ সমান। সুতরাং, তরলমধ্যস্থিত একটি বিন্দু এবং এর থেকে h উচ্চতায় অবস্থিত অপর একটি বিন্দুর মধ্যে চাপের পার্থক্য, h উচ্চতাসম্পন্ন ও একক ক্ষেত্রফলযুক্ত জলস্তম্ভের ভরের সমান।

$$p_2 - p_1 = \rho gh$$

ভরের কারণে উদ্ভূত জল কর্তৃক প্রযুক্ত চাপকে উদস্থৈতিক চাপ বলে।

পার্থিব ক্ষেত্রে বাতাস তরলের মুক্ততলের উপর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চাপ প্রদান করে। বাতাসের এই চাপকে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলে। তরলের যে কোন গভীরতায় চাপ উদস্থৈতিক ও বায়ুমণ্ডলের চাপের সমষ্টি।

উদস্থৈতিক চাপের জন্য প্রযুক্ত বল হিসাব করতে হলে কতটা ক্ষেত্রফলের উপর চাপ প্রযুক্ত হচ্ছে এবং তার উপর তরলস্তম্ভের উচ্চতা কত—এই দুটি বিষয় জানলেই হবে। প্যাস্কালের সূত্র থেকে বোঝা-যাচ্ছে, অন্য কোন বিষয়ের ভূমিকা এখানে নেই।

চিত্র 7·3

নিম্নোক্ত ঘটনাটি আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে। 7.3 চিত্রে দুটি বিভিন্ন পাত্রের সমান আয়তনের তলদেশের উপর কি একই পরিমাণ বল প্রযুক্ত হচ্ছে? বস্তুত, বামদিকের পাত্রে অনেক বেশী পরিমাণ জল রয়েছে। এ সত্ত্বেও, দুটি ক্ষেত্রেই তলদেশের উপর প্রযুক্ত বল $\rho g h s$-এর সমান। ডানদিকের পাত্রে রক্ষিত জলের ওজনের তুলনায় এই মান বেশী, পক্ষান্তরে বামদিকের পাত্রের জলের ওজনের তুলনায় এই মান কম। বামদিকের পাত্রের ঢালু পার্শ্বতল এই 'অতিরিক্ত' জলের ভারকে ধরে রেখেছে, পক্ষান্তরে, ডানদিকের পাত্রের ঢালু তলের প্রতিক্রিয়া বল জলের ওজনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই মজার ঘটনাকে কখনও কখনও উদস্থৈতিক কূট বলা হয়।

দুটি অসম আকৃতির পাত্রের জলতল যদি একই উচ্চতায় থাকে এবং তাদের যদি একটি নলের সাহায্যে যুক্ত করা হয় তবে একটি পাত্র থেকে অন্য পাত্রে জলের প্রবাহ ঘটবে না। পাত্র দুটিতে জলের চাপের

পার্থক্য থাকলে এই প্রবাহ ঘটতো। এখানে চাপ-পার্থক্য নেই, পাত্র দুটির আকার যাই হোক না কেন, পরস্পরযুক্ত অবস্থায় দুই পাত্রের জলের তল সর্বদা সমান এবং একই উচ্চতায় অবস্থান করবে।

বিপরীতপক্ষে, যুক্ত পাত্রদ্বয়ে জলতলের উচ্চতায় পার্থক্য থাকলে জলের প্রবাহ ঘটবে এবং যতক্ষণ না তল দুটি একই উচ্চতায় আসে, ততক্ষণ এই প্রবাহ চলবে।

বায়ু অপেক্ষা জলের চাপ অনেক বেশী। 10 মিটার গভীরতায় জলের চাপ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের দ্বিগুণ, 1 কিলোমিটারে গভীরতায় চাপ 100 গুণের মত।

সমুদ্রের কোন কোন অংশে জলের গভীরতা 10 কিলোমিটারের বেশী। এরূপ গভীরতায় জলের চাপের জন্য অসম্ভব রকম উচ্চ বলের উদ্ভব হয়। 5 কিলোমিটার গভীরতায় কাঠের কোন টুকরা নিয়ে গেলে প্রচণ্ড চাপের ফলে তা এতই পিষ্ট হয়ে পড়ে যে, এই রকম বিশেষ অভিজ্ঞতার পর একে একটি পিপের জলে ছেড়ে দিলে ইটের টুকরার মত টুক করে ডুবে যাবে।

সামুদ্রিক জীবনের অনুসন্ধানকারীরা এই প্রচণ্ড চাপের জন্য অনেক অসুবিধা ভোগ করে। গভীর সমুদ্রে অবতরণের কাজে ইস্পাতের গোলকের সাহায্য নেওয়া হয়। এগুলিকে 'ব্যাথিস্ফিয়ার' বা 'ব্যাথিস্কেপ' বলে। এগুলি 1000 বায়ুমণ্ডলীয় চাপেরও বেশী সহ্য করতে পারে।

অন্যদিকে, সাবমেরিনের অবতরণের সীমা 100 থেকে 200 মিটার গভীরতা পর্যন্ত।

বায়ুমণ্ডলীয় চাপ (Atmospheric pressure)

বায়ুসমুদ্রের তলদেশে আমরা বাস করি—একে বায়ুমণ্ডল বলা হয়। প্রতিটি বস্তু, প্রত্যেকটি ধূলিকণা, পৃথিবীর উপরিস্থিত যে কোন বস্তুই এই চাপের আওতায় রয়েছে।

বায়ুমণ্ডলের চাপ নেহাৎ কম নয়। যে কোন বস্তুর প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটার জায়গায় প্রায় এক kgf বল কাজ করে;

বায়ুমণ্ডলীয় চাপের কারণ সহজেই বোধগম্য। জলের মত বায়ুরও যেহেতু ওজন আছে, যেহেতু কোন বস্তুর উপর তদুপরিস্থ বায়ুস্তম্ভের ওজনের সমান চাপ কাজ করে (ঠিক জলের মত)। পাহাড়ে আরোহণ করলে উপরের বায়ুর পরিমাণ কমতে থাকে, ফলে বায়ুর চাপও কম হতে থাকে।

বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে বা দৈনন্দিন প্রয়োজনে এই চাপ মাপার পদ্ধতি জানার দরকার হয়। এই উদ্দেশ্যে ব্যারোমিটার নামে বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।
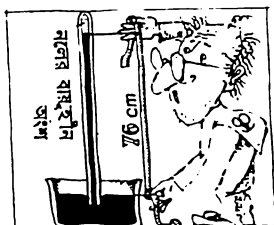
চিত্র 7.4

ব্যারোমিটার নির্মাণ কঠিন নয়। এক মুখ বন্ধ একটি নলে পারদ ঢেলে দেওয়া হয়। খোলা মুখটি আঙুলে চেপে ধরে নলটি উল্টিয়ে একটি পারদের পাত্রে খোলা মুখটি ডুবিয়ে রাখা হয়। এর ফলে, নলের পারদ নীচে নেমে আসবে। কিন্তু সবটা পারদ পড়ে যাবে না। নলের মধ্যে পারদের উপরের জায়গাটুকু নিঃসন্দেহে বায়ুহীন। বাইরের বায়ুর চাপ নলের পারদ এই উচ্চতায় দাঁড়িয়ে থাকে (চিত্র 7.4)।

নীচের পারদপাত্রের আকার এবং নলের ব্যাস যাই হোক না কেন, নলের মধ্যে পারদ সদা সর্বদাই 76 সেণ্টিমিটারের মতো উচ্চতায় অবস্থান করে।

আমরা যদি 76 সে.মি.-এর কম দৈর্ঘ্যের নল নিই, তবে সেটা পারদে সম্পূর্ণ ভর্তি থাকবে এবং আমরা কোন শূন্যস্থান দেখতে পাব না। বায়ুমণ্ডল যে চাপ দেয়, একটা 76 সে.মি.-এর পারদস্তম্ভও আধারের উপরে সেই চাপ দেয়। এই পারদস্তম্ভের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল 1 বর্গ সে.মি. হলে, এই বল 1·033 কিলোগ্রাম-ভারের (kgf) সমান। 1 × 76 ঘন সে.মি. পারদের আয়তনকে এর ঘনত্ব ও অবাধ অবতরণের অভিকর্ষজ ত্বরণ দিয়ে গুণ করলে এই সংখ্যা পাওয়া যায়।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছেন, পৃথিবীস্থিত প্রতিটি বস্তুর উপর গড় বায়ুমণ্ডলীয় চাপ (সাধারণত প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলা হয়)। এক কিলোগ্রাম-ভার এক বর্গ সে.মি. ক্ষেত্রের উপর যে চাপ দেয় তার খুব কাছাকাছি।

চাপ মাপার জন্য বিভিন্ন একক ব্যবহার করা হয়। পারদস্তম্ভের উচ্চতা মিলিমিটারে নির্দেশ করে খুব সহজেই এই চাপ প্রকাশ করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা এরকম বলে থাকি, আজকের চাপ স্বাভাবিকের উপরে, এর পরিমাণ 768 মিলিমিটার পারদের (অর্থাৎ পারদস্তম্ভের) সমান।

760 মিলিমিটার পারদস্তম্ভের চাপকে কোন কোন সময় **প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ** বলে। এক বর্গ সে.মি.-তে এক কিলোগ্রাম চাপকে **প্রায়োগিক চাপ** বলে। যেহেতু প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও প্রায়োগিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের মধ্যে পার্থক্য খুবই সামান্য, সেকারণে এখন থেকে আমরা ওদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলে ধরব না।

পদার্থ বিজ্ঞানীরা প্রায়শ চাপের অন্য একটি একক ব্যবহার করে থাকেন। এটি হল **'বার'**, 1 বার $= 10^6$ ডাইন/সে.মি.^{2}। যেহেতু, $1gf = 981$ ডাইন/সে.মি.^{2}, একবার প্রায় এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান। আরও সঠিকভাবে বললে, প্রমাণ (স্বাভাবিক) বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রায় 1013 মিলিবারের সমান।

SI পদ্ধতিতে চাপের একক **প্যাস্কাল** (Pa), এটা এক বর্গমিটার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত এক নিউটন বলের সমান। এটা খুবই ক্ষুদ্র চাপ, কারণ, সহজেই বোঝা যায় যে, $1\ Pa = 1\ N/m^2 = 10\ dyn/cm^2 = 10^{-5}$ বার।

$4\pi R^2$ সূত্রের সাহায্যে পৃথিবীর উপরিতলের ক্ষেত্রফল বার করে আমরা দেখতে পারি যে, সম্পূর্ণ বায়ুমণ্ডলের ওজন দাঁড়ায় 5×10^{18} kgf পরিমাণ একটি বিরাট সংখ্যা।

ব্যারোমিটার নলের আকৃতি নানা ধরনের হতে পারে। তবে একটা জরুরী জিনিস অবশ্যই দেখতে হবে যে, নলের একটা প্রান্ত এমনভাবে বন্ধ করা থাকবে যাতে নলের মধ্যে পারদের উপরদেশে কোন বায়ু প্রবেশ করতে না পারে। পারদের অন্য তলে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কাজ করবে।

পারদ ব্যারোমিটারের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ খুবই নির্ভুলভাবে মাপা যায়। অবশ্য এর জন্য কেবলমাত্র পারদ ব্যবহার করতে হবে, তা নয় ; অন্য যে কোন তরলও ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু পারদ সবচেয়ে ভারী তরল বলে প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে এর উচ্চতা সর্বনিম্ন হবে। পারদ ব্যারোমিটার বিশেষভাবে সর্বসুবিধাদায়ক যন্ত্র নয় ; পারদতল উন্মুক্ত রাখা ঠিক নয় (পারদবাষ্প বিষাক্ত) ; উপরন্তু, এই যন্ত্র বহনের উপযোগী নয়।

অ্যানিরয়েড (অর্থাৎ বায়ুহীন) ব্যারোমিটার এই সমস্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত। প্রত্যেকেই এই ধরনের ব্যারোমিটারের সঙ্গে পরিচিত। এটি

একটি ছোট গোলাকার ধাতব বাক্স — এতে স্কেল ও সূচক লাগান থাকে। স্কেলের গায়ে পারদস্তম্ভের হিসাবে সেণ্টিমিটারে মাপ লেখা আছে।

ধাতব বাক্স থেকে সমস্ত বাতাস বার করে নেওয়া হয়। একটি দৃঢ় স্প্রিং-এর সাহায্যে বাক্সের আবরণটি যথাস্থানে ধরে রাখা হয়। নতুবা বায়ুমণ্ডলের চাপে এটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। বায়ুমণ্ডলের চাপের তারতম্যে আবরণটি হয় বেঁকে যায় বা সোজা হয়। সূচকটি আবরণের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত করা থাকে যাতে আবরণটি যখন বেঁকে যায় তখন সূচকটি ডান দিকে সরে যায়।

একটি পারদ ব্যারোমিটারের পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে এই ব্যারোমিটারের অংশাঙ্কন করা হয়। আপনি যদি এর সাহায্যে চাপ জানতে চান, তবে আঙুল দিয়ে ব্যারোমিটারে টোকা দিতে ভুলবেন না। ডায়ালের সূচকটি যথেষ্ট পরিমাণ ঘর্ষণ বলের বিরুদ্ধে কাজ করে এবং প্রায়ই দেখা যায় সূচকটি 'গতকালের আবহাওয়া'-তেই আটকে আছে।

আর একটি সরল যান্ত্রিক ব্যবস্থা—সাইফন—বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ভিত্তিতে কাজ করে।

এক মোটর-চালক তার বন্ধুকে সাহায্য করতে চায়। বন্ধুটির গ্যাস ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু তার নিজের গাড়ীর ট্যাংক থেকে কিভাবে বন্ধুকে গ্যাসোলিন ঢেলে দেবে? চায়ের কেটলীর মতো ট্যাংকটিকে তো আর কাত করা যাবে না।
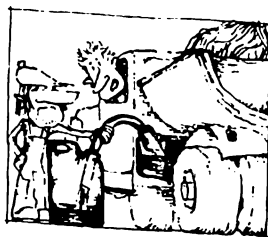
চিত্র 7·5

একটা রবারের নল তখন তার কাজে লাগতে পারে। এই নলের এক প্রান্ত সে তার গ্যাস-ট্যাংকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে আর অন্য প্রান্তে মুখ লাগিয়ে নলের ভেতরের বায়ু টানবে। তারপর চকিত গতিতে খোলামুখ আঙুল দিয়ে চেপে ধরে ট্যাংকের তুলনায় নিম্নতর উচ্চতায়

নিয়ে এসে আঙুল খুলে দেবে—হোস-নল দিয়ে গ্যাসোলিন বেরিয়ে আসবে (চিত্র 7.5)।

একটা সাইফন বলতে যা বোঝায় এই বাঁকানো নলটা ঠিক তাই। একটা সোজা আনত নলে যে কারণে তরল প্রবাহ ঘটে, এ ক্ষেত্রেও তাই। মোট ফলাফল বিচার করে বলা যায়, দুটি ক্ষেত্রেই তরল প্রবাহ নীচের দিকে ঘটছে।

সাইফনের কার্যকারিতার জন্য বায়ুচাপের দরকার। বায়ুর চাপই তরলকে ধরে রাখছে, প্রবাহে কোথাও ফাঁক ঘটতে দিচ্ছে না। বায়ুর চাপ না থাকলে ঢালার মুখে তরলস্তম্ভ ভেঙে যেত এবং তরল পদার্থ দুটো পাত্রেই গড়িয়ে পড়ত। নলের ডান দিকের অংশটি অর্থাৎ যেখান থেকে তরল নির্গত হচ্ছে (Gasoline tank) তার মধ্যে তরলের লেভেল যখন নলের বামদিকের অংশের তরলের (যেটা টেনে আনা হচ্ছে) লেভেলের নীচে আসবে, তখন সাইফনটি কাজ করা বন্ধ করবে। অর্থাৎ যে পাত্রে তরল টেনে নেওয়া হচ্ছে সেই পাত্রে তরলের লেভেল Tank-এর লেভেলের সমান হলে পর সাইফনের কাজ বন্ধ হবে।

কিভাবে বায়ুমণ্ডলের চাপ আবিষ্কৃত হল (How atmospheric pressure was discovered)

প্রাচীন সভ্যতায় শোষক পাম্পের প্রচলন ছিল। এর সাহায্যে যথেষ্ট উচ্চতায় জল তোলা যেত। একান্ত বাধ্যের মত জল পাম্পের পিস্টনকে অনুসরণ করত।

প্রাচীন দার্শনিকগণ এর কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করতেন এবং এ বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত অভিমত এরূপ ছিল ঃ

জল পিস্টনের অনুগামী হয়, কারণ, প্রকৃতি শূন্যস্থানকে অপছন্দ করে। সে কারণে, জল ও পিস্টনের মধ্যে কোন ফাঁকা জায়গা রাখতে চায় না।

কথিত আছে, ফ্লোরেন্স দেশের টাসকানীর ডিউকের জন্য এক দক্ষ যন্ত্রবিদ্ একটি শোষক পাম্প নির্মাণ করেছিলেন যেটি দিয়ে 10 মিটারেরও বেশী উচ্চতায় জল তোলা যাবে আশা করেছিলেন। কিন্তু যেভাবেই তারা জলকে টেনে তুলবার চেষ্টা করলেন না কেন, এর থেকে শেষমেষ কোন জলই উঠল না। পিস্টনের সাহায্যে 10 মিটার উচ্চতায় জল উঠল। কিন্তু তারপরে যখন পিস্টনটি জলকে ফেলে

এগিয়ে গেল তখন প্রকৃতি যে শূন্যতাকে ভয় করে, সেই শূন্যতাই সেখানে এসে হাজির হল।

গ্যালিলিওকে যখন এই ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করতে বলা হল, তিনি উত্তর দিলেন, প্রকৃতি সত্য সত্যই শূন্যস্থানকে অপছন্দ করে ; কিন্তু তা নির্দিষ্ট একটা সীমা পর্যন্ত। গ্যালিলিও-এর শিষ্য, ইভানজেলিস্টা টরিসেলি (1608 1647) স্পষ্টতঃ এই বিষয়টির অজুহাতেই 1643 সালে তাঁর বিখ্যাত পারদভর্তি নলের পরীক্ষাটি সম্পন্ন করেন। আমরা একটু আগেই পরীক্ষাটি সম্বন্ধে বলেছি—একটা পারদ ব্যারোমিটারের নির্মাণ কার্যই বস্তুতপক্ষে টরিসেলীর পরীক্ষা মাত্র।

76 সে.মি.-র অধিক উচ্চতার একটি নল নিয়ে টরিসেলী পারদের উপরে একটা শূন্যস্থানের সৃষ্টি করেছিলেন (একে প্রায়শ তাঁর সম্মানে টরিসেলীর শূন্যস্থান বলা হয়) এবং এভাবে বায়ুমণ্ডলের চাপের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

এই পরীক্ষার সাহায্যে টরিসেলী টাসকানীর ডিউকের যন্ত্রবিদের ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটালেন। বাস্তবিক, শোষক পাম্পের পিস্টনকে জল কত মিটার পর্যন্ত নির্দ্বিধায় অনুসরণ করবে তা কষে দেখা খুব সহজ। এক বর্গ সে.মি. ক্ষেত্রফলের একটা জলস্তম্ভ যতক্ষণ না এক কিলোগ্রাম ওজন পাচ্ছে, ততক্ষণ মাত্র জলস্তম্ভ উঠে আসবে। এই রকম একটা জলস্তম্ভে উচ্চতা হবে 10 মিটার। এই কারণেই, প্রকৃতি শূন্যস্থানকে ভয় করে.... অবশ্য মাত্র 10 মিটার পর্যন্ত।

টরিসেলীর আবিষ্কারের 11 বছর পরে, 1654 সালে, ম্যাগডেবার্গের ডাচ মেয়র, অটো ভন গেরিক (1602—1686) সুস্পষ্টভাবে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করেন। পরীক্ষাটির বৈজ্ঞানিক সারবত্তার কারণে যত না হোক, ঘটনাটির নাটকীয়ত্ব ও চমৎকারিত্বে গেরিক বিখ্যাত হয়ে উঠলেন।

দুটি তামার অর্ধগোলক বলয়াকৃতি বায়ুনিরোধক পদার্থ দিয়ে আটকান হল। একটি অর্ধগোলকের সঙ্গে সংযুক্ত নল দিয়ে গোলকটির মধ্য থেকে পাম্পের সাহায্যে বায়ু বার করে নেওয়া হল। এর পরে অর্ধগোলক দুটি বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব হল। গেরিকের পরীক্ষাটির একটি বিশদ বর্ণনা সযত্নে রাখা আছে। অর্ধগোলকের উপর প্রযুক্ত বায়ুর চাপ এখন হিসাব করা যেতে পারে : 37 সে.মি. ব্যাসের গোলকের ক্ষেত্রে এর মান প্রায় 1000 কিলোগ্রাম-ভারের (kgf) সমান। অর্ধগোলক দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন করতে আট ঘোড়ার দুটি দলকে

লাগান হল। অর্ধগোলকের সঙ্গে সংযুক্ত আংটায় দড়ি বেঁধে দুদিকে ঘোড়ার দলের লাগামের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। ম্যাগডেবার্গ অর্ধগোলক দুটি খোলার ব্যাপারে ঘোড়ার দল ব্যর্থ হল।

ম্যাগডেবার্গ অর্ধগোলক খুলতে আটটি ঘোড়ার (ঠিক আটটি, ষোলটি না, কারণ, এক দিকের ঘোড়ার দলের বদলে দেওয়ালে পেরেক এঁটে দড়ি আটকান সম্ভব হত; এতে অর্ধগোলক দুটির উপর প্রযুক্ত বলের কোন তারতম্য হত না) প্রযুক্ত বল যথেষ্ট ছিল না।

পরস্পর যুক্ত দুটি বস্তুর মধ্যে যদি বায়ুহীন ফাঁক রাখা হয় তবে বস্তুদ্বয় বায়ুমণ্ডলীয় চাপের কারণে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।

বায়ুমণ্ডলের চাপ ও আবহাওয়া (Atmospheric pressure and weather)

আবহাওয়ার কারণে চাপের ওঠানামা খুবই অনিয়মিত। আগে লোকে ভাবত, একমাত্র চাপই আবহাওয়া নির্ধারণ করে। এ কারণে, আজকের দিনে পর্যন্ত ব্যারোমিটারের গায়ে উৎকীর্ণ করা থাকে: পরিষ্কার, শুষ্ক, বৃষ্টিপাত, ঝড়। এমন কি, 'ভূমিকম্প' কথাটিও আপনি উৎকীর্ণ দেখতে পারেন।

আবহাওয়া পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চাপের পরিবর্তনের বাস্তবিকই এক বিরাট ভূমিকা আছে। কিন্তু এই ভূমিকা একান্ত ভূমিকা নয়। সমুদ্র-সমতলে গড় বা প্রমাণ চাপ 1013 মিলিবারের সমান। চাপের তারতম্য তুলনামূলকভাবে কম। খুব কম ক্ষেত্রেই চাপ 935—940 মিলিবারের নীচে নামে বা 1055-1060-এর উপরে ওঠে।

18ই আগস্ট, 1927, দক্ষিণ চীন সাগরে সর্বনিম্ন চাপ দেখা যায় 885 মিলিবার। 23শে জানুয়ারী, 1900 সালে সাইবেরিয়ার বার্নল স্টেশনে সর্বোচ্চ চাপ দেখা গেছে প্রায় 1080 মিলিবার (উল্লিখিত চাপ সমুদ্র-সমতলের হিসাবে)।

আবহাওয়া বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে আবহাওয়াবিদদের ব্যবহৃত একটি মানচিত্র 7.6 চিত্রে দেখান হয়েছে। মানচিত্রে অংকিত রেখাগুলি সমপ্রেষরেখা। এই রকম একটি রেখা বরাবর চাপ সর্বত্র সমান (প্রত্যেক ক্ষেত্রে চাপের এই মান উল্লেখ করা আছে)। সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ চাপের অঞ্চলগুলি লক্ষ্য করে দেখুন, এগুলিকে চাপের 'চূড়া' ও 'পকেট' বলে।

বায়ুমণ্ডলীয় চাপবিন্যাসের সঙ্গে বায়ুপ্রবাহের দিক ও শক্তি সম্পর্কযুক্ত।

চিত্র 7.6

ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র চাপ সদৃশ নয় এবং উচ্চ চাপ বায়ুকে 'নিষ্পীড়ন' করে নিম্নচাপের অঞ্চলে ঠেলে দেয়। এটা মনে হতে পারে, সমপ্রেষ-রেখাগুলির লম্ব বরাবর বায়ুপ্রবাহ ঘটা উচিত, কারণ লম্ব বরাবর চাপ অতি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু, বায়ুপ্রবাহের মানচিত্রগুলির চিত্র অন্যরকম।

বায়ুচাপের সঙ্গে করিওলী বলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং এই কারণে খুব উল্লেখযোগ্য সংশোধনের দরকার হয়। আমরা জানি, উত্তর গোলার্ধে করিওলী বল গতিশীল বস্তুর উপর গতির দক্ষিণাবর্তে ক্রিয়া করে। বায়ুকণাগুলিও এই বলের জন্য 'সংস্পৃষ্ট' হয়। উচ্চ-চাপের অঞ্চল থেকে 'তাড়া' খেয়ে নিম্নচাপের অঞ্চলে যাবার সময় বায়ুকণাগুলির সমপ্রেষরেখার আড়াআড়ি যাওয়ার কথা, কিন্তু করিওলী বল তাদেরকে ডানদিকে বিচ্যুত করে, ফলে বায়ুপ্রবাহের দিক সমপ্রেষরেখার সাথে প্রায় 45°-র মত কোণ করে।

এই রকম একটা ক্ষুদ্র বলের উল্লেখযোগ্যভাবে প্রচণ্ড ক্রিয়াশীলতা! একে এরকমভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, করিওলী বলের বিরুদ্ধে কাজ করে বায়ুস্তরগুলির যে পারস্পরিক ঘর্ষণ তাও খুব নগণ্য মাত্র।

চাপের 'চূড়া' ও 'পকেট' অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহের উপর করিওলী বলের প্রভাব আরও চমকপ্রদ। চাপের 'চূড়া' থেকে নির্গত বায়ু ব্যাসার্ধ বরাবর সবদিকে প্রবাহিত হতে পারে না, করিওলী বলের কারণে, কেবলমাত্র ঘুরে ঘুরে বক্রপথে প্রবাহিত হয়। উচ্চচাপ অঞ্চলে এই সমস্ত বায়ুপ্রবাহ সর্বদা একই দিকে ঘুরতে থাকায় একটা চক্রাকারে আবর্তিত বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি হয় যার ধাক্কায় বায়ুরাশি ঘড়ির কাঁটার আবর্তন অনুরূপে অপসারিত হতে থাকে। একটি স্থিরমানের বিক্ষেপকারী বলের প্রভাবে কিভাবে একটি ব্যাসার্ধমুখী গতি শখিল গতিতে পর্যবসিত হতে পারে তা 2.16 চিত্রে সুস্পষ্টভাবে দেখান হয়েছে।

নিম্নচাপের অঞ্চলে একই জিনিস ঘটে। করিওলী বল না থাকলে এই অঞ্চলের দিকে বায়ু ব্যাসার্ধ বরাবর ছুটে যেত। কিন্তু এই বলের কারণে, বায়ুভর পথিমধ্যে ডানদিকে বিক্ষিপ্ত হয়। প্রদত্ত চিত্রদৃষ্টে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, এক্ষেত্রে চক্রাকারে আবর্তিত বায়ুমণ্ডলের ধাক্কায় বাতাস ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে চলে যাচ্ছে।

নিম্নচাপ অঞ্চলে বায়ুর ঝড়কে **সাইক্লোন** এবং উচ্চচাপ অঞ্চলে **অ্যান্টিসাইক্লোন** বলে।

আমাদের ভেবে নেওয়া উচিত হবে না যে, প্রতিটি সাইক্লোনই হারিকেন বা বিপজ্জনক ঝড়। সত্যি বলতে কি, যেসব শহরে আমরা বাস করি তার উপর দিয়ে সাইক্লোন বা অ্যান্টিসাইক্লোন বয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা, এর ফলটা বেশীরভাগ সময়েই আবহাওয়ার পরিবর্তন মাত্র নির্দেশ করে। অনেক ক্ষেত্রে, সাইক্লোনের আগমন খারাপ আবহাওয়া এবং অ্যান্টিসাইক্লোনের আগমন ভাল আবহাওয়া সূচিত

করে। কার্যগতিকে আবহাওয়ার পূর্বাভাষকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চাইছি না।

উচ্চতার সঙ্গে চাপের পরিবর্তন (Change of pressure with altitude)

উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে চাপের হ্রাস ঘটে। ব্লেইজ প্যাস্কালের নির্দেশে ফরাসী বিজ্ঞানী ফ্লোরিন পেরিয়ার 1648 সালে বিষয়টি পরীক্ষা করে বুঝিয়ে দেন। পেরিয়ার যেখানে বাস করতেন তার কাছেই মাউণ্ট পাই ডি ডোম-এর উচ্চতা 975 মিটার। এই পাহাড়ে আরোহণের পরে দেখা গেল, টরিসেলীর নলে পারদস্তম্ভ 8 মিলিমিটার নেমে গেছে।

উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে বায়ুচাপের হ্রাস খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ, সেক্ষেত্রে যন্ত্রের উপর চাপ প্রদানকারী বায়ুস্তরের উচ্চতা তুলনামূলক-ভাবে কম।

যদি কখনও এরোপ্লেনে চেপে থাকেন তাহলে আপনি জানেন যে, এরোপ্লেনের উচ্চতা-নির্দেশক একটি যন্ত্র কেবিনের সামনের দেওয়ালে টাঙানো থাকে এবং এই যন্ত্রে দশ বিশ মিটারের মধ্যে উচ্চতার সঠিক মাপ ধরা পড়ে। এই যন্ত্রকে আল্‌টিমিটার বলে। এটি একটি সাধারণ ব্যারোমিটার মাত্র, কিন্তু সমুদ্র-সমতল থেকে উচ্চতা নির্দেশের জন্য সেভাবে অংশাঙ্কিত করা থাকে।

উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে চাপ হ্রাস পায় — কি হারে, সেজন্য একটি সূত্র খুঁজে বার করা যেতে পারে। h_1 এবং h_2 উচ্চতার মধ্যে এক বর্গ সে.মি. ক্ষেত্রফলযুক্ত একটা বাতাসের স্তর আলাদা করে ভাবা যাক। স্তরটি খুব পুরু না হলে উচ্চতার সঙ্গে ঘনত্বের পার্থক্য এরকম স্তরে প্রায় ধরাই পড়বে না। সুতরাং, বায়ুর যে অংশটুকু আমরা বিচ্ছিন্ন করে ভাবছি (এটি $h_2 - h_1$ উচ্চতার একটি ক্ষুদ্র চোঙ এবং এর ক্ষেত্রফল 1 সে.মি.^{2}), তার ভার $mg = \rho(h_2 - h_1)g$।

এই ওজনের পরিমাণটা h_1, উচ্চতা থেকে h_2 উচ্চতায় উঠতে চাপের যে হ্রাস ঘটে, তার সমান। সুতরাং,

$$\frac{p_1 - p_2}{\rho} = g(h_2 - h_1)$$

কিন্তু বয়েলের সূত্র (যেটি পাঠক জানেন, যদি না জানেন তবে দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য) অনুযায়ী গ্যাসের ঘনত্ব তার চাপের সমানুপাতিক।

সুতরাং $\frac{p_1 - p_2}{p} \propto h_2 - h_1$

উচ্চতা h_2 থেকে h_1-এ নামলে যে ভগ্নাংশ পরিমাণ চাপ বৃদ্ধি পায় সেটাই বাঁদিকে রয়েছে। সুতরাং, $h_2 - h_1$ পরিমাণ উচ্চতা হ্রাসের জন্য সর্বদা একই ভগ্নাংশ পরিমাণ চাপ বাড়বে।

গণনা ও পরিমাপের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটিয়ে দেখা যায় যে, সমুদ্র সমতল থেকে প্রতি কিলোমিটার উপরে চাপের 0·1 ভগ্নাংশ হ্রাস পায়। সমুদ্র সমতলের নীচে নামলেও হিসাব একই থাকে — এক কিলোমিটার নীচে নামলে চাপ 0·1 অংশ বৃদ্ধি পায়।

আমরা মূল চাপের 0·1 অংশ পরিমাণে চাপ হ্রাসের কথা আলোচনা করছি। এর অর্থ হল, 1 কিলোমিটার আরোহণের সময় চাপ সমুদ্র সমতলের চাপের 0·9 অংশ হয়। আরও 1 কিলোমিটার উঠলে এই চাপ হবে সমুদ্র সমতলের চাপের 0·9-এর 0·9 অংশ ; 3 কিলোমিটার উচ্চতায় এই চাপ সমুদ্র-সমতলের চাপের 0·9-এর 0·9-এর 0·9 অংশ, অর্থাৎ $0{\cdot}9^3$ অংশ। এইভাবে যুক্তিটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর নয়।

সমুদ্র সমতলে চাপ p_0 দ্বারা সূচিত করলে, h কিলোমিটার উচ্চতায় চাপ দাঁড়াবে, $p = p_0(0{\cdot}87)^h = p_0 \times 10^{-0{\cdot}06h}$

বন্ধনীর মধ্যে 0·9-এর পরিবর্তে সঠিকতর মান 0·87 বসান হয়েছে। এই সূত্রের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, সব উচ্চতায় তাপমাত্রা একই আছে। বাস্তবিকক্ষেত্রে উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রারও পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তনও একটি জটিল সূত্র মেনে চলে। যাই হোক না কেন, উপরের সূত্রটির উপযোগিতা যথেষ্ট এবং কয়েকশ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত এই সূত্র প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এই সূত্রের সাহায্যে 5·6 কি.মি. উচ্চ এলব্রুশের চূড়ায় চাপের পরিমাণ বার করা কঠিন নয়। দেখা যাবে, সেখানে চাপ প্রায় অর্ধেকে কমে যাবে। অন্য দিকে 22 কি.মি. উচ্চতায় (স্ট্রাটোস্ফিয়ারের যে রেকর্ড উচ্চতায় মানুষ বেলুন পাঠাতে পেরেছে) চাপ কমে প্রায় 50 মি.মি. পারদস্তম্ভের সমান হবে।

আমরা যখন 760 মি.মি. পারদস্তম্ভের চাপকে প্রমাণ চাপ বলি তখন অবশ্যই যেন 'সমুদ্র-সমতলে' কথাটি বিস্মৃত না হই। 5·6 কি.মি. উচ্চতায় প্রমাণ চাপ হবে 380 মি.মি., 760 মি.মি. নয়।

একই সূত্র অনুযায়ী, চাপের মতো বায়ুর ঘনত্বও উচ্চতার সঙ্গে হ্রাস পায়। 160 কি.মি. উচ্চতায় বাতাসের পরিমাণ খুব একটা বেশী থাকে না। বস্তুত, $(0{\cdot}87)^{160} = 10^{-10}$

পৃথিবী-পৃষ্ঠে বাতাসের ঘনত্ব প্রায় $1000\ g/m^3$-এর থেকে বলা যায়, 160 কি.মি. উচ্চতায় এক ঘনমিটার জায়গায় বাতাসের পরিমাণ $10^{-7}g$। রকেটের সাহায্যে সত্যিকারের মাপজোখ করে দেখা গেছে, ঐ উচ্চতায় বাতাসের ঘনত্ব এর প্রায় দশগুণ বেশী।

কয়েকশ কিলোমিটার উচ্চতায় আমাদের সূত্র নির্ধারিত সংখ্যাটি খুব বেশী পরিমাণে কম বলে ধরা পড়ে। উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রার পরিবর্তন এবং আরও একটি বিশেষ ঘটনা:—সৌরকিরণের জন্য বাতাসের অণুর ক্ষয়—এই সমস্ত কারণে অধিক উচ্চতায় সূত্রটি অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। এখানে আমরা ঐ সমস্ত জটিল বিষয়ের মধ্যে যাব না।

আর্কিমিডিসের সূত্র (Archimedes' Principle)

স্প্রিং তুলায় একটি ভার ঝোলান যাক। স্প্রিংটি প্রসারিত হয়ে বস্তুটির ওজন কত তা নির্দেশ করবে। স্প্রিং তুলা থেকে বস্তুটি না সরিয়ে তাকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হল। স্প্রিং তুলার পাঠের কি কোন পরিবর্তন ঘটবে? হ্যাঁ, বস্তুটির ওজন কমে গেছে বলে মনে হবে। একটি লোহার কিলোগ্র্যাম বাটখারাকে নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে সেটি প্রায় 140 গ্রাম ওজন 'হারিয়েছে'।

কিন্তু ব্যাপারটি কি? অন্তত, এটা পরিষ্কার যে বস্তুটির ভর বা পৃথিবী কর্তৃক এর উপর আকর্ষণ বল — কোনটিরই পরিবর্তন হয় নি। এই ওজন হ্রাসের একটাই মাত্র কারণ থাকতে পারে—$140\ gf$ বল নিমজ্জিত বস্তুটির উপর উর্ধ্বমুখে চাপ দিচ্ছে। মহান্ প্রাচীন বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস কর্তৃক আবিষ্কৃত এই প্লবতা কোথা থেকে আসে? জলের মধ্যে কোন কঠিন বস্তু বিচার-বিবেচনা করার আগে, আসুন, আমরা 'জলের মধ্যে জল'-কে আলোচনা করি। আমরা খুশিমত জলের একটি অংশ বিচ্ছিন্ন করে ভাবি। এই অংশের ওজন আছে, কিন্তু অংশটি তলদেশে পড়ে যাচ্ছে না। কেন? স্পষ্টতই, উত্তরটি এই যে, চারপাশের জলের চাপ এই পতনকে রোধ করছে। এর অর্থ হল। এই অংশে চারপাশের চাপের নীট ফল এই অংশের ওজনের সঙ্গে সমান এবং তা উল্লম্বরেখায় উর্ধ্বদিকে কাজ করছে।

এখন এই আয়তন যদি একটি কঠিন বস্তু অধিকার করে তবে এটা ঠিক যে পূর্বোক্ত চাপ একই থাকবে।

সুতরাং, উদস্থৈতিক চাপের ফলে তরলে বা বায়বীয় মাধ্যমে নিমজ্জিত বস্তুর উপর একটা বল কাজ করে। এই বল উল্লম্ব রেখা-

বরাবর উর্ধ্বদিকে কাজ করে এবং এর পরিমাণ বস্তু কর্তৃক অপসারিত তরল বা বায়বীয় পদার্থের ওজনের সমান। ইহাই আকিমিডিসের সূত্র।

কথিত আছে, আকিমিডিস একটা স্নানগাহে শুয়ে একটি সোনার মুকুটে কোন রূপা আছে কি না আছে তা বার করার উপায় ভাবছিলেন। পরিপূর্ণ স্নান করার কালে যে কেউ প্লবতাজনিত উর্ধ্বাঘাত অনুভব করে থাকেন। হঠাৎ, সূত্রটি যেন আশ্চর্য সারল্য নিয়ে আকিমিডিসের কাছে নিজেকে প্রকাশ করল! 'ইউরেকা!' (যার অর্থ, 'আমি খুঁজে পেয়েছি') বলে চীৎকার করে আকিমিডিস স্নানপাত্র থেকে লাফিয়ে বাইরে এলেন এবং মহামূল্যবান মুকুটের ওজনহ্রাস তখনই বার করে দেখবার জন্য মুকুটটি যে ঘরে ছিল সেই ঘরের ভেতর ছুটলেন।

জলের মধ্যে কোন বস্তুর ওজনহ্রাস বস্তু কর্তৃক অপসারিত জলের ওজনের সমান হবে। জলের ওজন জেনে আমরা তৎক্ষণাৎ তার আয়তন হিসাব করতে পারি এবং এই আয়তন মুকুটটির আয়তনের সমান হবে। মুকুটের ওজন বার করে পরমুহূর্তে যে পদার্থ দিয়ে মুকুটটি তৈরী তার ঘনত্ব বার করতে পারি, এবং সোনা ও রূপার ঘনত্ব জেনে নিয়ে মুকুটের কতখানি অংশ রূপার তা বার করতে পারি।

যে কোন তরল বা বায়বীয় পদার্থের ক্ষেত্রে আকিমিডিসের সূত্রটি খাটে। V আয়তনের কোন বস্তুকে ρ ঘনত্বের কোন তরলে নিমজ্জিত করলে অপসারিত তরলের ওজন—যেটা প্লবতা বলের সমান—তার পরিমাণ হবে $\rho g V$।
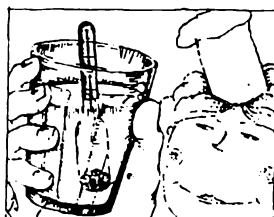
চিত্র 7·7

তরল বা গ্যাসীয় উৎপন্ন দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণে যে সমস্ত সরল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তাদের কার্যনীতি আকিমিডিসের সূত্রের উপর নির্ভর করে। যদি অ্যালকোহল বা দুধে জল মিশিয়ে পাতলা করা হয়, তবে ঘনত্ব কমে যাবে। কিন্তু ঘনত্ব থেকে এর উপাদান ঘটিত গঠন জানা

সম্ভব হয়। এরোমিটার (areometer) (চিত্র 7·7)-এর সাহায্যে এরকম পরিমাণ বেশ সহজে বার করা সম্ভব। একটি এরোমিটার তরলে ডোবালে তার ঘনত্বের উপর নির্ভর করে যে বেশী বা কম গভীরতা পর্যন্ত ডুববে। নিমজ্জিত অবস্থায় যেখানে এরোমিটারের ওজন প্লবতা বলের সমকক্ষ হয় সেইখানে এরোমিটার শান্ত ও স্থির থাকে।

এরোমিটারের গায়ে দাগ কাটা আছে, আর এই দাগ দেখে কোন তরলের ঘনত্ব সহজে নির্ধারণ করা যায়। অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এরোমিটারকে অ্যালকোহলোমিটার বলে, দুধের ক্ষেত্রে এই যন্ত্রকে বলে ল্যাক্‌টোমিটার।

যে কোন ব্যক্তির শরীরের গড় ঘনত্ব একের থেকে কিছু বেশী। যে ব্যক্তি সাঁতার জানে না, পরিষ্কার জলে সে ডুবে যাবে। লবণজলের ঘনত্ব একের থেকে বেশী। বেশীর ভাগ সমুদ্রজলের লবণাক্ততা খুব সামান্য এবং এর ঘনত্ব যদিও একের থেকে বেশী, কিন্তু মানুষের শরীরের গড় ঘনত্ব থেকে কম। ক্যাস্পিয়ান সাগরের কারা-বোগাজ-গোল উপসাগরের জলের ঘনত্ব 1·18 ; এই মান মানুষের শরীরের গড় ঘনত্ব থেকে বেশী। এই উপসাগরে ডুবে যাওয়া কার্যত অসম্ভব। যে কেউ এর জলে শুয়ে বইপত্র পড়তে পারে।

বরফ জলের উপর ভাসে। বস্তুত, 'উপর' কথাটির সঠিক প্রয়োগ হল না। বরফের ঘনত্ব জলের ঘনত্বের চেয়ে প্রায় 10% কম, সে কারণে আর্কিমিডিসের সূত্র অনুযায়ী বলা যায় যে, একখণ্ড বরফের দশ ভাগের নয় ভাগই জলে ডুবে থাকবে। ঠিক এই কারণেই মহাসমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজের হিমশৈলের সামনে পড়া প্রচণ্ড বিপজ্জনক।

যদি একটা তুলাপাত্র বায়ুতে সাম্য-অবস্থায় থাকে, তার অর্থ এই নয় যে সেটা শূন্যের মধ্যেও সাম্যাবস্থায় থাকবে। জলের মতো ঠিক একই মাত্রায় বাতাসের ক্ষেত্রেও আর্কিমিডিসের সূত্র কাজ করে। বাতাসের মধ্যে একটা বস্তুর উপর বস্তু কর্তৃক অপসারিত বাতাসের ওজনের সমান পরিমাণ প্লবতা কাজ করে। বায়ুশূন্যস্থানে একটি বস্তুর ওজন যা হত বাতাসে তার 'ওজন' কম। বস্তুর আয়তন যত বেশী হবে, বস্তুর ওজন হ্রাসও তত বেশী হবে। এক টন সীসা অপেক্ষা একটন কাঠ বেশী ওজন হারায়। কোন্ বস্তুটি বেশী হালকা—এ রকম মজার প্রশ্নের উত্তর হবে একই ধরনের : বায়ুতে ওজন করলে প্রকৃত এক টন সীসা প্রকৃত এক টন কাঠের থেকে বেশী ভারী দেখা যাবে।

ক্ষুদ্র বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে ওজন হ্রাস খুব সামান্যই হবে। একটা ঘরের আকারের একটা খণ্ড ওজন করলে কয়েকটি দশ কিলোগ্রাম ওজন আমরা 'হারাব'। বৃহৎ বস্তু খণ্ডের ক্ষেত্রে বাতাসের প্লবতা ঘটিত ওজন হ্রাস জেনে নিয়ে অনুরূপ সংশোধন করে প্রকৃত ওজন বার করা উচিত।

বাতাসের প্লবতার কারণে আমরা বেলুন, এরোস্টাট ও বিভিন্ন ধরনের উড্ডীয়মান বস্তু নির্মাণের সুবিধা পেয়েছি। এর জন্য বাতাসের থেকে হালকা গ্যাস প্রয়োজন।

এক ঘনমিটার আয়তনের একটি বেলুন হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে ভর্তি করলে, যেখানে 1 ঘনমিটার হাইড্রোজেনের ওজন 0·09 kgf, বাতাসের প্লাবতা ও গ্যাসের ওজনের পার্থক্য হবে

$$1{\cdot}29\ \text{kgf} - 0{\cdot}09\ \text{kgf} = 1{\cdot}20\ \text{kgf}$$

$1{\cdot}29\ \text{kg/m}^3$ হল বাতাসের ঘনত্ব।

দেখা যাচ্ছে, প্রায় এক কিলোগ্রাম ওজনের একটি বোঝা বেলুনে ঝুলিয়ে দেওয়া যায়। তাতেও কিন্তু বেলুনটি মেঘের কোলে উড়ে যেতে বাধা পাবে না।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, মোটামুটিভাবে কয়েকশ ঘনমিটারের মত ছোট আয়তনের হাইড্রোজেন বেলুনও যথেষ্ট পরিমাণ ওজন বাতাসে তুলে নিতে পারে।

হাইড্রোজেন-এরোস্টাটের একটা সাংঘাতিক ত্রুটি হল, গ্যাসটি সহজ-দাহ্য। বাতাসের সঙ্গে মিশে হাইড্রোজেন একটি বিস্ফোরক মিশ্রণ তৈরী করে। মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এরোস্টাটের ইতিহাসকে চিহ্নিত করে রেখেছে।

এ কারণে, হিলিয়াম আবিষ্কারের পরে লোকে হিলিয়াম দিয়ে বেলুন ভর্তি করেছে। হিলিয়াম হাইড্রোজেনের দ্বিগুণ ভারী এবং এ দিয়ে বেলুনের উত্তোলন ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এই পার্থক্য কি খুব ধর্তব্যের? এক ঘন মিটার হিলিয়াম ভর্তি বেলুনের উত্তোলক বল = $1{\cdot}29\ \text{kgf} - 0{\cdot}18\ \text{kgf} = 1{\cdot}11\ \text{kgf}$ উত্তোলক বল মাত্র 8% কমেছে। পক্ষান্তরে, হিলিয়াম ব্যবহারের সুবিধা স্পষ্ট।

মানুষ প্রথমে এরোস্টাটের সাহায্যে বাতাসে উড়েছিল। বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর স্তরসমূহে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে আজকের দিনেও এরোস্টাটের সঙ্গে যুক্ত বায়ুনিরুদ্ধ গাড়ী ব্যবহার করা হয়। এদের স্ট্রাটোস্ফিয়ার বেলুন বলে। এগুলি 20 কিলোমিটারেরও বেশী উচ্চতায় আরোহণ করতে পারে।

নানা মাপজোখের যন্ত্রপাতি সজ্জিত বেলুন তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল রেডিও সাহায্যে প্রেরণ করতে পারে। এ রকম বেলুন বর্তমান
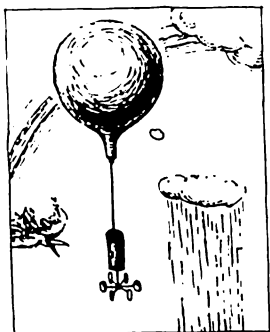
চিত্র 7·8

কালে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে (চিত্র 7.8)। বায়ুমণ্ডলের অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এই সমস্ত বেলুনে থাকে ব্যাটারিচালিত ক্ষুদ্রাকৃতি রেডিও প্রেরকযন্ত্র। এই প্রেরকযন্ত্র নির্দিষ্ট সংকেতের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতা থেকে আর্দ্রতা, তাপমাত্রা এবং বায়ুচাপের তথ্য প্রেরণ করে থাকে।

এখন যে কেউ লম্বা পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশ্যে চালকবিহীন এরোস্টাট পাঠাতে পারে এবং সেই সঙ্গে প্রায় নির্ভুলভাবে কোথায় এটা অবতরণ করবে তা হিসাব করতে পারে। এর জন্য এরোস্টাটটিকে অনেক উচ্চতায়, প্রায় 20—30 কিলোমিটার মত উঁচুতে তোলার দরকার পড়ে। এই সব উচ্চতায় বায়ুপ্রবাহ অত্যন্ত সুস্থিত এবং এ কারণে এরোস্টাটের পরিক্রমাপথ আগে থেকে হিসাব করে নেওয়া যায়। প্রয়োজন পড়লে কিছু গ্যাস বার করে দিয়ে বা ব্যালাস্ট ফেলে দিয়ে এরোস্টাটের উত্তোলন আপনা থেকেই পরিবর্তন করা যায়।

আগে প্রোপেলারসহ মোটর লাগান এরোস্টাট উড্ডয়নের কাজে ব্যবহার করা হত। এইসব বায়ুজাহাজ স্ট্রীমলাইনড্ বা বায়ু অনুসারী করা থাকত। এরোপ্লেনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বায়ুজাহাজ পিছিয়ে পড়ল—এমন কি 30 বছর আগেকার প্লেনের সঙ্গে তুলনাতেও এই সব বায়ুজাহাজ জবরজং, নিয়ন্ত্রণের পক্ষে অসুবিধাজনক, ধীরগতি এবং সর্বোপরি এর নীচু ছাদ। মালপত্র পরিবহণের ক্ষেত্রে বায়ুজাহাজ সুবিধাজনক বলে অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে মনে করা হয়।

অত্যন্ত নিম্নচাপ : শূন্য (Extremely low pressures : Vacuum)

যান্ত্রিকভাবে যে পাত্রকে খালি ধরে নেওয়া হয়, তাতেও অসংখ্য অণু বিদ্যমান।

ভৌত পরীক্ষার বহু যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে গ্যাসের অণু বেশ বাধার সৃষ্টি করে। রেডিও টিউব, এক্স-রে টিউব, প্রাথমিক কণার ত্বরণ যন্ত্র—ইত্যাদি যন্ত্রসমূহে শূন্যের প্রয়োজন হয়। শূন্য বলতে গ্যাস-অণু বর্জিত স্থান বোঝায়। একটা সাধারণ ইলেকট্রিক বাল্বেও শূন্যের প্রয়োজন পড়ে। বাতির মধ্যে বাতাস ঢুকলে জারণ ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাতিটি পুড়ে ছাই হয়।

বায়ুশূন্য করার সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে 10^{-9} মি.মি. পারদস্তম্ভের চাপ তৈরী করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এই চাপ সম্পূর্ণই নগণ্য, এত ক্ষুদ্র পরিমাণ চাপের তারতম্যে ম্যানোমিটারে পারদস্তম্ভের উচ্চতার পরিবর্তন ঘটবে এক মিলিমিটারের দশ লক্ষভাগের একশো ভাগ মাত্র। তা সত্ত্বেও, এই অতি ক্ষুদ্র চাপে এক ঘন সেণ্টিমিটার আয়তনে কয়েক হাজার লক্ষ অণু থাকবে।

আন্তর্নাক্ষত্রিক মহাশূন্যের সঙ্গে এই শূন্যস্থানকে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ঐ মহাশূন্যে কয়েক ঘন সে.মি. খুঁজলে তবে গড়ে একটা প্রাথমিক কণা পাওয়া যেতে পারে।

শূন্যস্থান তৈরী করতে বিশেষ পাম্পের সাহায্য নেওয়া হয়। একটি সাধারণ পাম্পে পিস্টনের গতির সাহায্যে খুব বেশী 0·01 মি.মি. পারদ চাপের মত শূন্যতা তৈরী করা যায়। আরও ভাল বা বলা যেতে পারে। আরও উচ্চমানের শূন্যতা তৈরী করতে হলে তথাকথিত ব্যাপন পাম্পের (Diffusion pump) (পারদ বা তেল চালিত) দরকার পড়ে। সেখানে গ্যাস অণুগুলি পারদ বা তেলের বাষ্পপ্রবাহে ধরা পড়ে।

পারদ-পাম্পের উদ্ভাবক বিজ্ঞানী ল্যাঙ্গমুর। প্রাথমিক চাপ প্রায় 0·1 মি.মি. পারদের সমান হলে পর এই ধরনের পাম্প কাজ শুরু করে। এই প্রাথমিক তনুভবনকে প্রাক্-শূন্যতা বলে।

পাম্পটি এইভাবে কাজ করে। একটি ক্ষুদ্র কাচপাত্রকে একটি পারদের আধার, একটি শূন্য পরিসর ও প্রাথমিক পাম্পের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। পারদকে উত্তপ্ত করা হলে প্রাথমিক পাম্পটি পারদ-বাষ্প বের করে নিয়ে আসে। পারদ-বাষ্প পথিমধ্যে গ্যাস-অণুকে বন্দী করে প্রাথমিক পাম্পে নিয়ে আসে। পারদ-বাষ্প এরপর ঘনীভূত হয় (প্রবহমান

জলের দ্বারা শীতল করার ব্যবস্থা থাকে) এবং পারদের আধারে বিন্দু বিন্দু করে ফিরে আসে। সেখান থেকে আবার আগের পথে পারদের যাত্রা শুরু হয়।

এইমাত্র ল্যাবরেটরী ব্যবস্থায় যে শূন্যস্থান সৃষ্টি করার ব্যবস্থা বর্ণনা করা হল তা সঠিক অর্থে চরম শূন্য বলতে যা বোঝায় তা থেকে এখনও অনেক দূরে। একটি শূন্যস্থান বলতে আসলে অত্যন্ত তনীভূত গ্যাসকে বোঝাচ্ছে। সাধারণ গ্যাস থেকে এই রকম গ্যাসের ধর্মাবলীর মূলগত পার্থক্য থাকতে পারে।

গ্যাসপাত্রের আকার থেকে গ্যাস অণুর গড় মুক্তপথ যখন বড় হয়ে পড়ে তখন শূন্যস্থানে যে সকল অণু রয়ে যায় তাদের বেগ ধর্মের পরিবর্তন ঘটে। সেক্ষেত্রে অণুগুলির পারস্পরিক সংঘর্ষের ঘটনাটি বিরল হয়ে পড়ে এবং সোজাসুজি পাত্রের এক দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে আবার অন্য দেওয়ালে ধাক্কা খায়। এই বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডে অণুর গতিবেগ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। পাঠকের জানা আছে, বায়ুমণ্ডলীয় চাপে গ্যাস অণুর গড় মুক্তপথের মান 5×10^{-6} সে.মি.। এটা 10^7 গুণ বৃদ্ধি করলে দাঁড়ায় 50 সে.মি., যেটা স্পষ্টতই সাধারণ মাপের একটা পাত্রের আকার থেকে বড়। যেহেতু গড় মুক্তপথ ঘনত্ব তথা চাপের ব্যস্ত-আনুপাতিক, সে কারণে চাপের মান হতে হবে 10^{-7} বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বা 10^{-4} মি.মি. পারদের সমান।

গ্রহগুলির মধ্যবর্তী স্থানগুলিকে ঠিক শূন্য বলা যায় না। কিন্তু সেখানে বস্তু ঘনত্বের মান প্রায় 5×10^{-24} গ্রাম/সে.মি.^{3}। এই সমস্ত বস্তুর মূল উপাদানই হল পারমাণবিক হাইড্রোজেন। বর্তমান কালে এরকম ধারণা করা হচ্ছে, মহাজাগতিক পরিসরের প্রতি ঘন সে.মি.-এ বেশ কয়েকটি হাইড্রোজেন পরমাণু উপস্থিত রয়েছে। একটা হাইড্রোজেন অণুকে একটি মটরদানার মত বড় করে যদি মস্কোতে রাখা হত তবে তার নিকটতম 'মহাজাগতিক প্রতিবেশী' থাকত টুলাতে।

লক্ষ লক্ষ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ (Pressures of millions of Atmospheres)

প্রত্যহই আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের উপর উচ্চচাপের ঘটনার সম্মুখীন হই। উদাহরণস্বরূপ, একটি সূচীমুখে কতটা চাপ পড়ে তা হিসাব করে বার করা যাক। ধরা যাক, একটি সূচ কিংবা পেরেকের অগ্রভাগের মাত্রা 0·1 মি.মি., তাহলে ঐ অংশের ক্ষেত্রফল দাঁড়ায় 0·0001

বর্গ সে.মি.। 10 kgf মানের একটি সাধারণ বল যদি এই রকম পেরেকে প্রয়োগ করা হয় তবে পেরেকের অগ্রভাগে চাপ দাঁড়াবে 100000 বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান। এ জাতীয় সূক্ষ্ম বস্তু যে কোন ঘনবস্তুর মধ্যে সহজে ঢুকে পড়বে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

উপরের উদাহরণটি থেকে বোঝা যায়, ক্ষুদ্র তলের উপর বৃহৎ চাপ সৃষ্টি একটি সাধারণ ঘটনামাত্র। বড় ক্ষেত্রফলের উপর উচ্চচাপ সৃষ্টি করার কথা উঠলে কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে।
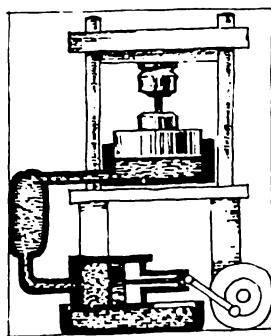
চিত্র 7.9

পরীক্ষাগারে উচ্চচাপ সৃষ্টি করতে হলে কোন শক্তিশালী চাপযন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে ; উদাহরণ, হাইড্রলিক প্রেস (চিত্র 7.9)। এই প্রেসে প্রযুক্ত চাপ একটি ক্ষুদ্র ক্ষেত্রফলের পিস্টনে সঞ্চালিত করা হয় এবং যে পাত্রের মধ্যে আমরা উচ্চ চাপ সৃষ্টি করতে চাই তার মধ্যে এই পিস্টনটি চাপের প্রভাবে ঢুকে পড়ে।

বিশেষ কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হয়েও এই পদ্ধতিতে কয়েক হাজার বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব। অতি উচ্চচাপ তৈরী করতে হলে আমাদের পরীক্ষাব্যবস্থা জটিলতর হয়ে পড়বে। কারণ, পাত্রের উপাদানটি এই চাপ সহ্য করতে সক্ষম হবে না।

এক্ষেত্রে প্রকৃতি আমাদের অর্ধেক সুবিধা করে দিয়েছে। ব্যাপারটি হল, 20.000 বায়ুমণ্ডলের মতো চাপে ধাতু বেশ শক্ত হয়ে ওঠে। এ কারণে, অতি উচ্চচাপ সৃষ্টি করার যন্ত্রপাতি কোনও তরলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে তার উপর 30.000 বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে, যে কেউ কয়েকশ হাজার বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সৃষ্টি করতে পারে (কিন্তু আবার সেই পিস্টনের সাহায্য নিয়ে)। মার্কিন বিজ্ঞানী পার্সি উইলিয়ামস্ ব্রিজম্যান্ সর্বোচ্চ 400.000 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সৃষ্টি

করেছিলেন। কেবলমাত্র অলস কৌতূহলের বশে, কিন্তু এই অতি উচ্চ চাপ সৃষ্টি করা হয় না। অন্য কোন উপায়ে যে সমস্ত ঘটনা ঘটানো অসম্ভব, তা এই রকম চাপে ঘটতে পারে। 1955 সালে কৃত্রিম হীরক উৎপন্ন করা হয়। এর জন্য 100,000 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও 2000°K তাপমাত্রা দরকার হয়েছিল। নাইট্রো-গ্লিসারিন, ট্রোটাইল ইত্যাদি কঠিন বা তরল পদার্থের বিস্ফোরকের বিস্ফোরণ কালে বৃহৎ ক্ষেত্রফলের উপর 300,000 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এর কাছাকাছি চাপের সৃষ্টি হয়। পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের সময় অতুলনীয় উচ্চচাপ সৃষ্টি হয় — এর মান 10^{18} বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান। বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত এই চাপ অতি অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী। সৌরজগতের বস্তুরাজির অভ্যন্তরে সতত উচ্চ চাপ বিদ্যমান — বলা বাহুল্য, আমাদের পৃথিবীও এর মধ্যে পড়ে। পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে এই চাপের পরিমাণ প্রায় 30 লক্ষ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান।

সকলের জন্য পদার্থবিদ্যা